ভারত ইতিহাসে নারী

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

ভারত-ইতিহাসে নারী
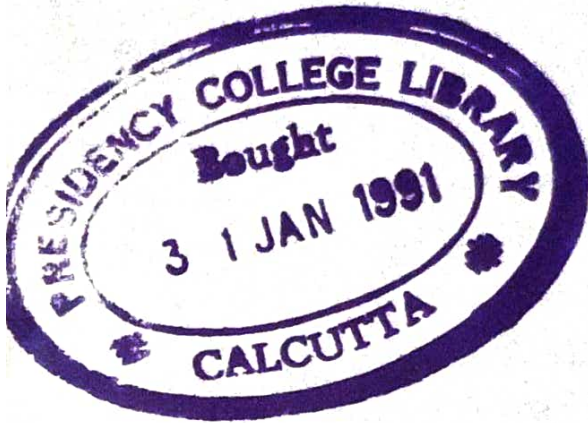
সম্পাদনা
রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়
গৌতম নিয়োগী

কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা • নিউ দিল্লী
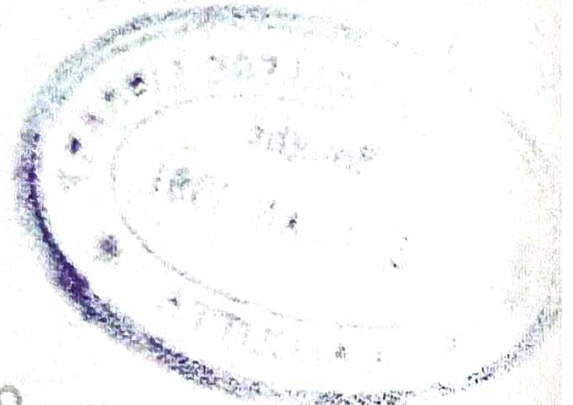
মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে "ভারতের ইতিহাসে মেয়েদের স্থান ঃ অতীতে ও বর্তমানে" শীর্ষক এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮৮-র ৩রা এপ্রিল, রবিবার। দিনব্যাপী ঐ সভায় ইতিহাসের অনুরাগী মানুষজন, ইতিহাস সংসদের সদস্য-সদস্যা প্রভৃত পরিমাণে উপস্থিত ছিলেন—বিশেষত মহিলা এবং ছাত্রীদের সংখ্যা স্বাভাবিক-ভাবেই ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের পর উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। 'ভারতের ইতিহাসে নারী' শিরোনামের এই গ্রন্থটি ঐ আলোচনা সভার ফসল বলা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের কার্যনির্বাহক সমিতি গ্রন্থটি সম্পাদনের ভার বর্তমান সম্পাদকদ্বয়ের উপর অর্পণ করেন এবং সেই সাগ্রহ অভীপ্সানুসারে বক্তৃতার প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত রূপ পেল, এটি অবশ্যই আনন্দ-সংবাদ।

বিগত দু' দশকের কিছু ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণা বাদ দিলে ভারত ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ও কাল-সীমায় নারীর প্রকৃত স্থান নির্ণয়ের জরুরী ও প্রয়োজনীয় কর্তব্যটির প্রতি ইতিহাসবিদদের উপযুক্ত দৃষ্টি পড়ে নি, এ-কথা দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি। বস্তুত, এতাবৎকালের ভারত-ইতিহাস-চর্চায় পুরুষশাসিত বা পিতৃ-তান্ত্রিক সমাজের মতাদর্শগত প্রাধান্য ও পুরুষপ্রধান নানা ধর্মীয় নেতৃবর্গের দ্বারা রচিত শাস্ত্রীয় বক্তব্যের ধ্বনির অনুরণন লক্ষণীয়। অপরপক্ষে ভারতের নারী বিষয়ে অনৈতিহাসিক এবং তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয়, এমন কিছু এলো-মেলো আলোচনা কখনো অচেতনভাবে কখনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অবশ্যই হয়েছে, তবে তা সমাজে নারীর স্থান ও অধিকার বিষয়ে প্রকৃত চিত্রের ও সত্যের অপলাপ ঘটিয়ে এক ধরনের ক্ষতিকারক 'মিথ' বা অতিকথনের জন্ম দিয়েছে। যেমন 'প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীর স্থান খুবই উঁচুতে ছিল' বা 'প্রাচীন ভারতীয় নারীর আদর্শ সীতা-সাবিত্রী' বা 'অহল্যা-দ্রোপদী-কুন্তী-তারা-মন্দোদরী, পঞ্চকন্যা স্মরণেই পাপনাশ' ইত্যাদি। অথচ, বিস্তৃত ও প্রামাণিক আলোচনার পর আধুনিক এক পণ্ডিতের প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য ঃ

> বৈদিক ভারতবর্ষে নারীর মর্যাদা ছিল না, মানুষ বলে তার কোনো স্বীকৃতিই ছিল না। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাতেও ছিল না, তবে

তাদের উত্তর পুরুষেরা এখন স্বীকার করে সে-কথা ; বলে, নারী এই শতাব্দীতেই প্রথম অধিকার সচেতন হয়েছে, আগে সে অত্যাচারিত বন্দিনীই ছিল। শুধু আমরাই বলবার চেষ্টা করি যে বৈদিক যুগে নারী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এতে শুধু যে সত্যের অপলাপ হয় তা নয়, অতীতকে যথার্থভাবে না দেখতে পাওয়ার জন্যে অতীতের যে বিষ বর্তমান সমাজদেহে সঞ্চারিত, তাকে চিনতে, তার প্রতিরোধ করতে এবং সুস্থ এক ভবিষ্যতের প্রস্তুতি বিধান করতে অনাবশ্যক দেরি হয়ে যায়।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষিতা খনা, লীলাবতী যেমন আপামর নারীসমাজের প্রতিভূ আদৌ নয়, তেমনি মধ্যযুগের ভারতে মুঘল শাসকশ্রেণীর নারী, যেমন বাবরের শিক্ষিতা কন্যা গুলবদন বেগম, নূরজাহান বা জাহান-আরা আপামর অবলাকুলের প্রতিনিধি নন। আবহমানকাল থেকে বন্দিনী মেয়েদের মুক্তির প্রথম প্রয়াস শুরু হয় ঊনিশ শতকে ; সেই সংগ্রামের আজও শেষ হয় নি। বলাবাহুল্য যে, নির্মোহ এবং গোঁড়ামিমুক্ত, উদার ও অসাম্প্রদায়িক, তথ্যাশ্রয়ী অথচ বিশ্লেষণাত্মক আধুনিক ইতিহাসচর্চার যে ধারাটি বিজ্ঞানসম্মত বলে স্বীকৃত, সেই ধারায় ভারতীয় ইতিহাসে নারীর স্থান নিয়ে বহু পূর্ণাঙ্গ আলোচনাই এখনো অসমাপ্ত। অতীতে ও বর্তমানে ভারতের নারী-সমাজের অবস্থান নিয়ে আলোচনার সেই অসম্পূর্ণতা ও ফাঁক কিছু পরিমাণ দূর হবে বর্তমান সংকলন-গ্রন্থটি থেকে, এই আশা আমরা করতে পারি। ইতিহাস সংসদের ঘোষিত উদ্দেশ্য লক্ষ্য রেখেই এই আলোচনা মাতৃভাষায়। 'ভারতের ইতিহাসে' কথাটি শিরোনামে থাকলেও, রচনাগুলিতে ঝোঁক স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ও বাঙালি সমাজের দিকেই বেশি।

৩রা এপ্রিল ১৯৮৮-র আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ ভাস্করানন্দ রায়চৌধুরী। মধ্যাহ্নভোজের আগে-পরে, আলোচনাসভার দুই পর্বে, সভার কাজ-পরিচালনা করেছিলেন যথাক্রমে ইতিহাস সংসদের সভাপতি অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও নারী আন্দোলনের সুপরিচিতা নেত্রী শ্রীমতী বিদ্যা মুন্সী। তাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। আলোচনা সভায় প্রবন্ধ পেশ করেছিলেন : সুকুমারী ভট্টাচার্য, রীণা ভাদুড়ী, ভারতী রায়, মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, মালিনী ভট্টাচার্য, যশোধরা বাগচী ও বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা প্রবন্ধের মার্জিত ও সংশোধিত রূপ নির্দিষ্ট সময়ে জমা দিয়ে সানুগ্রহ সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। পশ্চিমবঙ্গ

ইতিহাস সংসদের কার্যনির্বাহক সমিতির এবং প্রকাশনা উপ-সমিতির বন্ধুরা সাহায্য না করলে সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ কঠিনতর হত। সুখ্যাত প্রকাশ-গৃহ কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী সংসদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশে এগিয়ে এসেছেন এবং কালান্তর প্রেসের কর্মিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব করেছেন। তাদেরও আমাদের সাধুবাদ প্রাপ্য। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীঅমিয় রায়কে, শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মুদ্রণ পরিপাট্যে সুচারুরূপে সাহায্য করার জন্য। অলমতিবিস্তারেন।

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
২, পাম প্লেস
কলকাতা-৭০০ ০১৯

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়
গৌতম নিয়োগী

সূচীপত্র

প্রাচীন ভারতে নারী : বেদ থেকে মহাকাব্য যুগ

সুকুমারী ভট্টাচার্য

পণ্ডিতেরা বলেন, আর্যদের যে ধারাটি ঋগ্বেদের অংশবিশেষ সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তাদের এদেশে আসার কাল সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতক এবং মহাকাব্য রচনার শেষ পর্যায় সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক। অর্থাৎ ষোল বা সতের শতকের মধ্যে সমাজে নারীর অবস্থান এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। স্বভাবতই এ দীর্ঘ সময়ে সমাজে নারীর স্থানের বহু বিবর্তন ঘটে এবং তার মুখ্য হেতু সমাজের বিবর্তন, উৎপাদন ব্যবস্থার ও উৎপাদনগত সম্পর্কের বিবর্তন। দুঃখের বিষয়, এই যুগের বস্তুগত জীবনের চিত্রটি স্পষ্ট নয়, তথ্যের অভাবে আমরা উৎপাদন ব্যবস্থা সম্বন্ধে খুব দৃঢ়ভাবে কিছু বলতে পারিনে ; তবু কতকগুলি তথ্য অবিসংবাদিত। যেমন আর্যরা প্রথম যখন এ দেশে আসে তখন তারা পশুচারী যাযাবর ছিল এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে দীর্ঘ যুদ্ধে প্রাগার্য সিন্ধুসভ্যতার যে জনগোষ্ঠীকে পরাজিত করে এখানে বসতি স্থাপন করে, তারা ক্রমে কৃষিজীবী ও স্থিতিশীল সমাজে বাস করতে শুরু করে। বিজয়ী এবং বিজিতের সামাজিক মূল্যবোধে স্বভাবতই সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল। প্রাগার্য সিন্ধুসভ্যতার লিখিত তথ্য পাওয়া যায় নি, সামান্য যা মুদ্রালেখ পাওয়া যায়, তা-ও অপঠিত ; তবে পঠিত হলেও বিশেষ কিছু জানা যাবে এমন আশা নেই, কারণ খুবসম্ভব বাণিজ্য সম্বন্ধে যৎসামান্য তথ্য ও কিছু বণিকের নামই পাব মুদ্রা ও সীলগুলি থেকে। তবে পরাজিতের মূল্যবোধ নিশ্চয়ই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল বিজয়ীর সমাজচিন্তায়। আর্য মূল্যবোধের বিবর্তনে দুটি কারণ ছিল : প্রথমটি, তাদের জীবনধারার পরিবর্তনের ফল, দ্বিতীয়টি, প্রাগার্যদের সঙ্গে বিবাহের ফলে ধীরে ধীরে আর্য জীবনবোধে প্রাগার্য মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ।

আর্যরা ভারতবর্ষে যখন আসে তখন প্রাগার্য সভ্যতা ব্রঞ্জ যুগে ছিল, লোহার ব্যবহার তারা জানত না, ঘোড়ারও নয়, হাতিই ছিল তাদের বাহন।

আর্যরা ঘোড়া ও লোহা আনে কিন্তু ঘোড়া তখন রথ টানত এবং লোহার ব্যবহার সম্ভবত সীমাবদ্ধ ছিল কিছু অস্ত্রের ফলাতেই।

পশুচারী যাযাবর গোষ্ঠীবদ্ধ আর্য সমাজে নারীর অবরোধের প্রশ্নই ওঠে না ; তাই ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ ঋগ্বেদের "পারিবার মণ্ডল"-(২য় থেকে ৭ম)গুলিতে নারীর মুক্ত জীবনের চিত্র পাই। সরাসরি নারীর কথা কমই আছে, দেবীস্তুতি থেকে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-চারটি উক্তি ও উপমা থেকে এ চিত্র সংকলন করতে হয়।

দেবী ঊষা, কখনো কুমারী, কখনো সূর্যের বধূ। বধূ হিসেবে কিন্তু সূর্যের পশ্চাতে তার স্থান নয়, সে চলে সূর্যের আগে। [ঊষো যাতি স্বসরস্য পত্নী ১।১১৫।২] সে নিজের অনাবৃত বক্ষোদেশ পৃথিবীর সামনে উন্মোচিত করে যেমন স্মিতমুখী প্রেমিকা বধূ তার স্বামীর সামনে করে। [ঋগ্বেদ ১।১২৪।৭] নারীর রূপ ও সজ্জা নিয়ে কোন সংকোচ নেই তখনঃ "রক্তবসনে সজ্জিতা ঊষাকে দেখাচ্ছে যেন মায়ের নিজের হাতে সাজানো কন্যাটি।" [ঋগ্বেদ ১।১২৩।১১] এমনকি ঊষাকে নির্লজ্জ নারীও বলা হয়েছে। [ঋঃ ১।৪৬।৪] নারীর যৌনতা নিয়ে অসংকোচ উক্তি পাই, অগ্নিকে উপাসক বলছে, "বর যেমন বধূকে স্পর্শ করে উত্তেজিত করে আমাদের স্তব তোমাকে তেমন করে স্পর্শ করুক, হে অগ্নিদেব।" [ঋঃ ১।৬২।১] নারী স্বামীর কাছে মর্যাদা পেত তখনঃ "অগ্নি তেমনই শুচি যেমন শুচি স্বামীর দ্বারা সম্মানিতা বধূ।" [ঋঃ ১।৭৩।৩]। লক্ষ্যণীয়, এখানে দেবতার শুচিত্ব উপমিত হচ্ছে মর্ত্যনারীর শুচিত্বের সঙ্গে এবং তার উৎস স্বামীর দ্বারা অর্পিত সম্মান। পরে এটি ক্রমেই বিরল হয়ে আসে বলে এই স্তরে এমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রায়ই শোনা যায় উপাসক দেবতার কাছে আসেন যেমন করে প্রেমিক প্রেমিকা নারীর পশ্চাতে ধাবিত হয়। [মর্যো ন যোষাম্ অভ্যাতি পশ্চাৎ, ঋঃ ১।১১৫।২, ৮।৮০।২] সূর্য ঊষার অবৈধ প্রণয়ী, মনে রাখতে হবে দুজনেই দেবতা কাজেই 'জারো ন', জারের মত বলে এঁদের অসম্মান করা হচ্ছে না, অর্থাৎ অবৈধ প্রণয় নিয়ে কুণ্ঠিত মনোভাব দেখা দেয়নি তখনো। নাভানেদিষ্ট সূক্তে [ঋঃ ১০।৬১।৫, ৭] পিতাপুত্রীর (পরে প্রজাপতি ও ঊষারও) এবং যমযমী সূক্তে ভাইবোনের [ঋঃ ১০।১০] অবৈধ প্রণয় এবং অন্যত্র পূষার সঙ্গে তার জননীর সম্বন্ধ [৬।৫৫।৫] চিত্রিত। "যেমন করে অবৈধ প্রণয়ী প্রণয়িনীর কাছে যায় তেমন করেই সোম যাচ্ছে যজ্ঞপাত্রের কাছে।" [ঋঃ ৯।৯৬।২২, ২৩ ; ১০।১।৪] "চুম্বনে উদ্যত প্রণয়ীর দিকে নারী যেমন মুখ তোলে তেমনই করে নদীরা বিশ্বামিত্রের অভিমুখে যাচ্ছে।" [ঋঃ ৩।৪৫।১] "প্রিয়া বধূ যেমন তার

স্বামীতে নন্দিত হয়, হে ভগ, তুমিও আমার মধ্যে তেমনই আনন্দ পেয়ো।" [তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৪।৬।৫৬] এখানেও উপাসক ও দেবতার উপমান মর্ত্য নরনারীর প্রেম। "সুসজ্জিতা তরুণী বধূ যেমন স্বামীর কাছে যায় তেমনই ঘৃতধারা সোমের উদ্দেশে যাচ্ছে।" [ঋঃ ৪।৫৮।৯] "সোম, বসতীকরীতে তেমনই আনন্দিত হয় যেমন উত্তম নারীর সান্নিধ্যে পুরুষ আনন্দিত হয়।" [ঋঃ ১।১১৬।১]

নারীর গৃহকর্মের সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন তথ্য পাই না বেদে। ঋগ্বেদ শুধু বলে নারী জল আনত ও ফসলক্ষেতে পাহারা দিত। [৪।৫।৫] নিশ্চয়ই সংসারের অন্যান্য কাজ ও সন্তান পালনও সে করত ; পরবর্তী সাহিত্য সেকথা বলে কিন্তু ঋগ্বেদে তার উল্লেখ নেই। অনেক পরের শতপথব্রাহ্মণ বলে নারী পশমের কাজ করত। [তদ্বা এত্য স্ত্রীণাং কর্ম যদূর্ণাসূত্রম [১২।৭।২।১৭] ঋগ্বেদে যোদ্ধী নারীর উল্লেখ আছে ; মুদ্‌গলিনী [নামের আক্ষরিক অর্থ যিনি মুগুর ব্যবহার করেন] যুদ্ধ জয় করেন [১০।১০২।২] ; বিশ্‌পলার একটি পা যুদ্ধে কাটা যায় ; বধ্রিমতীর হাত কাটা যায় ; [১।১১৬।১৩] শশিয়সী বীরাঙ্গনা বলে উল্লিখিত। অনেক পরে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ সালে কার্টিয়াস নামে রোমান লেখক মেসেগা অবরোধের সময়ে যুদ্ধরত ভারতীয় নারীর উল্লেখ করেছেন ; তবে সম্ভবত এটি ব্যতিক্রমী, অথবা সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের নারীর কথা, প্রয়োজন মত সমাজ যাদের সর্বদাই ব্যবহার করেছে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি অস্ত্রধারিনী 'শক্তিকী'র উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ ব্যতিক্রমরূপে সমাজে বীরাঙ্গনা মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়েছে।

শিক্ষায় নারীর অধিকারকে শাস্ত্র স্বীকার করেনি। আর্য প্রাগার্য সংমিশ্রণের যুগে প্রাগার্য নারী বিবাহসূত্রে আর্যসমাজে প্রবেশ করবার পরই সম্ভবত উপনয়নে নারীর অধিকার চলে যায়। উপনয়নই বেদপাঠের দ্বার-স্বরূপ, এবং বেদই ছিল তৎকালীন আর্যের শিক্ষণীয় শাস্ত্র ; ঐ শাস্ত্রে অধিকার আর্যসমাজ বহিরাগত নারী বা পুরুষকে দিতে চায়নি। [যেমন কেল্‌টিক ড্রুইড্‌রা তাদের বংশানুক্রমে হস্তান্তরিত শাস্ত্রবিদ্যায় আগন্তুককে কোন অধিকার দিত না] এর ফলে নারী ক্রমে ক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অধিকার হারাল। সদয় পিতা, সহানুভূতিশীল ভ্রাতা বা সহৃদয় স্বামী নিশ্চয়ই খুব মধ্যে মধ্যে সমাজপতিদের নির্দেশ লঙ্ঘন করতেন, তাই পরবর্তী কালে পাণিনি সূত্র করে 'আচার্যা', 'উপাধ্যায়া' [স্বয়মাচার্যা, স্বয়মুপাধ্যায়া অর্থে] পদ সিদ্ধ করেন। তাই বিশ্ববারা ঋগ্বেদ ৫।২৮ সূক্তটির রচয়িতা তাই গোধা, শাশ্বতী, ঘোরা, অপালা ইত্যাদি 'ঋষিকা' অর্থাৎ নারী ঋষির নাম

পাই। বিখ্যাত 'সোহহম্' তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্। [ঋঃ ১০।১২৫] দেবতাদের জলদান অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হত গার্গী বাচক্নবী, বড়বা আত্রেয়ী ও সুলভা মৈত্রেয়ীর। [শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র ৪।১০।৩ ; আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র ৩।৪।৪ ; কৌষীতকি গৃহ্যসূত্র ১।২৮।২২]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে পণ্ডিত কন্যা লাভের জন্যে প্রক্রিয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যাজ্ঞবল্ক্য। [৬।৪।১৩] বধূ মৈত্রেয়ীর সনির্বন্ধ অনুরোধ যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেছেন। অথচ এই যাজ্ঞবল্ক্যই গার্গীর সূচগ্র-সূক্ষ্ম প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে বলেছিলেন, আর প্রশ্ন কোরোনা গার্গী, তোমার মাথা খসে পড়বে; এ ধরনের কথা তিনি কোন পুরুষ ব্রহ্মবাদীকে কখনো বলেন নি। জনকরাজা ঋষিকা সুলভাকে সন্দিগ্ধভাবে অহেতুক অপমান করেন। অর্থাৎ নারী যে শিক্ষা পেত সমাজ সেটা কখনো প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। তথাপি মেধা ও জিজ্ঞাসা নিয়ে বেশ কিছু নারী শিক্ষা আদায় করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালের পাণিনি ব্যাকরণের উপরে রচিত 'কাশিকা' টীকায় উল্লেখ পাই কাশকৃৎস্না আপিশলার, মীমাংসা ও ব্যাকরণে পণ্ডিত বলে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বিষাক্ত উক্তি আছে ঃ 'শিক্ষিত নারী পুরুষই' [প্রিয়ঃ সতীঃ তা উ যে পুংস আহুঃ। ১।১১।৪]

বেদ থেকে মহাকাব্যের যুগে নারী প্রধানত বধূরূপেই চিত্রিত। অবিবাহিতা নারীর কিছু উল্লেখ তবু ঋগ্বেদে পাই নানা নামে ঃ কুলপা, অমাজু, অমাজুরা, জরৎ-কুমারী, বৃদ্ধকুমারী ইত্যাদি। [ঋঃ ১।১১৭।৭ ; ১০।৩৯।৩ ; ৪০।৫ ইত্যাদি] পরে কিন্তু বিবাহ নারীর পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। উল্লেখ করা উচিত, যে পরবর্তী কালে পুরুষের পক্ষেও বিবাহ আবশ্যিক বিবেচিত হত ঃ মহাভারতে জরৎকারুর উপাখ্যানে দেখি ঐ ঋষি বিবাহ করেননি বলে পিণ্ডনাশের আশঙ্কায় তার পূর্বপুরুষেরা বৃক্ষশাখায় প্রলম্বিত। তাঁরা জরৎকারুকে অনুরোধ করলে ঋষি বিবাহ করেন। এটা অবশ্য ব্যতিক্রম, কারণ বহু মুণিঋষি অকৃত-দার থেকে তপস্যা করেছেন এমন কথা শাস্ত্রে বলে, মধ্যে মধ্যে অপ্সরা সংসর্গে পদস্খলন ঘটেছে এঁদের, কিন্তু সমাজ এঁদের গৃহী হতে বাধ্য করেনি, যেমন করেছে নারীকে। প্রৌঢ়া তপস্বিনী কুণিগর্গের কন্যাকে বলা হয় যে বিবাহ না করে তিনি স্বর্গে যেতে পারবেন না, দীর্ঘকালের সব তপস্যা ব্যর্থ হবে তাঁর ; ফলে একরাত্রের জন্যে তাঁকে বিবাহ করতে বাধ্য করে ; সমাজের নির্দেশ পালন করে তবে তিনি স্বর্গে যান। [মহাভারত ৯।৫২।৯ থেকে]

বেদ থেকে মহাকাব্যযুগ পর্যন্ত সাহিত্যে নারীকে বধূ ও জননী ছাড়া অন্য কোন ভূমিকায় দেখা হয়নি। কন্যা, ভগিনী ও সখী পরিচয়ে সে

অনুপস্থিত। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সাহিত্যের উপাদান, কিন্তু কোন দেবীকেই মুকুলিকা বালিকাবয়সী রূপে সাহিত্য চিত্রিত করেনি। শুধু পুরুষের সঙ্গে সংস্পর্শেই নারীর আলেখ্য পাই এই বৃহৎ সাহিত্যে।

বধূ ভূমিকার প্রবেশদ্বারে বিবাহ। আমাদের আলোচ্য যুগের শেষদিকের এক রচনা মনুসংহিতা, সেখানে এক জায়গায় বলা হয়েছে : 'নারীর পক্ষে বিবাহই হল উপনয়ন, পতিসেবা বেদাধ্যয়ন এবং পতিগৃহে বাসই গুরুগৃহে বাস'। [২।৬৭] অর্থাৎ নারীর পক্ষে বিবাহ এবং স্বামী সন্তান ও শ্বশুরালয়ে সকলের পরিচর্যাই বিদ্যাশিক্ষার বিকল্প, অতএব সত্যকার বিদ্যাশিক্ষা থেকে সে বঞ্চিত, একথাই প্রতিষ্ঠিত হল। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অধিকার তার গেছে, উপনয়নে অধিকার যাবার সঙ্গে সঙ্গেই। শিক্ষার অধিকার ছিল শুধু গণিকার ; রাষ্ট্র নিজ ব্যয়ে তাকে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষিত করে তুলত ; চতুঃষষ্টি কলায় তার অধিকার ছিল।

সাধারণ কুলকন্যার শিক্ষায় কোন অধিকার ছিল না। হয়ত সঙ্গীত, বাদ্য ও নৃত্যে সে কিছু শিক্ষা পেত বিবাহের পূর্বে, যেমন গৃহকর্মেও শিক্ষা পেত। শিক্ষার অধিকার না থাকায় স্বাধীন কোন বৃত্তির অধিকারও তার ছিল না, ফলে কোন না কোন পুরুষের উপরে একান্ত নির্ভরশীল থাকতে সে বাধ্য হত। তাই বৈদিক ধর্মসূত্র থেকে শুরু করে মহাভারতে পুরাণে একটি শ্লোক বারবার শোনা যায়, 'পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রমর্হতি।' [বৌধায়ন ধর্মসূত্র ২।২।৩ ; ৪৪-৪৫, বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র ৫।১-২ এবং অন্যত্র বহুস্থানে] কৌমারে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্ররা তাকে রক্ষা করবে ; নারী স্বাধীনতার 'যোগ্য নয়'। অতএব সে 'ভার্যা' অর্থাৎ ভরণীয়া, স্বামী ভর্তা অর্থাৎ ভরণকারী। লক্ষ্যণীয় ঐ ভৃ-ধাতু থেকে ঐ অর্থেই নিষ্পন্ন হয়েছে ভৃত্য শব্দটি। [স্বামী-স্ত্রীর এই ভর্তা-ভরণীয়া সম্পর্কের অর্থ পাশ্চাত্য সাহিত্যেও দেখি যখন ষোড়শ-সপ্তদশ শতক পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীকে 'লর্ড' বলে উল্লেখ করত, ভৃত্যও তাই করত। লর্ড শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল : half-ward অর্থাৎ রুটির জন্য যার অধীন সে।]

বিবাহে প্রথম বৈদিক যুগে নারী নিজের সঙ্গী নির্বাচন করত। [ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎ সুপেশাঃ। স্বয়ং সা মিত্রং বুনতে জনে চিৎ॥ ঋগ্বেদ ১০।২৭।১২] কিন্তু এ স্বাধীনতা তার বেশিদিন থাকেনি, পরে বিবাহে পিতা কন্যা-সম্প্রদান করতেন, এবং এ দান শুধু বরকে নয়, তার পরিবারকেও : 'শ্বশুরকুলে কন্যাকে দান করা হয়' [কুলায় হি স্ত্রী প্রদীয়তে, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র

২।১০।২৭।৩] বিবাহকালে বধূটির হয়ে প্রার্থনা করা হত : 'শ্বশুর, শাশুড়ি, দেবর ননদের কাছে সাম্রাজ্ঞী হ'য়ো'। [ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৪৬] বলা বাহুল্য, এটি প্রার্থনাই, বাস্তবের আলেখ্য নয়। কিছু কিছু শ্বশুরবাড়ি হয়ত ভদ্র, সহৃদয় আচরণ করত নববধূর সঙ্গে, কিন্তু বাস্তবে যে অন্যচোখে দেখা হত তাকে তার বিস্তর নিদর্শন আছে। অথর্ববেদে পড়ি : "সূর্যোদয়ে প্রেত যেমন করে ছুটে পালায় যেমন করে শ্বশুরের সামনে থেকে পুত্রবধূ ছুটে পালায়।" [৮।৬।২৪] এ আর যাই হোক, সাম্রাজ্ঞীর চিত্র নয়।

গৃহকর্মই বিবাহিতা নারীর একান্ত করণীয়, বাইরের জগতে তার চলাফেরা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছিল। বৈদিক যুগে রাষ্ট্রের যে দুটি প্রতিনিধিমূলক সংস্থা ছিল, সভা ও সমিতি, নারী তাতে অংশগ্রহণ করতে পারত না। [মৈত্রায়ণীসংহিতা ৪।৭।৪] বিবাহে বা অন্য কোন ধর্মানুষ্ঠানে নারী মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারত না, তার সম্বন্ধে ধর্মকৃত্যগুলি অমন্ত্রক। নারীর কর্তব্য হল পুরুষের অনুবর্তিনী হওয়া। [শতপথব্রাহ্মণ ১৩।২।২।৪]; নারী পুরুষের পশ্চাতে থাকবে [বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৯।২।১৪] বিবাহকালে বর বলে, 'ওম্ মম ব্রতে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্ত মনু চিত্তং তে', অর্থাৎ (দেবতা) আমার ব্রতে তোমার চিত্তকে ধারণ করুন, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুবর্তিনী হোক্। নারীটির যে নিজস্ব চিত্ত, মত, সুখ, ইচ্ছা কিছু থাকতে পারে এর কোন বোধই যেন ছিল না। হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে একটি প্রার্থনা আছে, বিবাহের অব্যবহিত পরেই স্বামী স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলবে, "এস, আমরা মিলিত হই যেন পুত্রসন্তানের জন্ম দিই, যে সন্তানেরা সমৃদ্ধির বৃদ্ধি ঘটাবে; যেন লাভ করি পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য, শিষ্য, বস্ত্র, কম্বল, ধাতু, বহু ভার্যা, রাজা, খাদ্য এবং নিরাপত্তা।" [১।৬।২২।১৪] এই প্রার্থনাটি সদ্যোবিবাহিত বধূর সঙ্গে করাতে হত এবং বর বহু ভার্যার প্রার্থনা করছে এখানে।

বস্তুত, বহু ভার্যাগ্রহণে পুরুষের অধিকার আছে, একথা শাস্ত্র বারেবারেই বলেছে। "যেহেতু (যজ্ঞে) একটি দণ্ডকে দুটি বস্ত্রখণ্ড বেষ্টন করে কিন্তু তার বিপরীতটি হয় না, সেইহেতু একটি পুরুষ দুই স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু এক নারী বহু পতি গ্রহণ করতে পারে না।" [তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬।৬।৪৩ ; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১৩।১০।৫৮] রাজার চারটি বৈধ পত্নী থাকত : মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তি (বা পরিবৃত্তী) ও পালাগলী। এ ছাড়াও রাজা বহু নারীকে বিবাহ ক'রে এবং না ক'রেও অন্তঃপুরে সম্ভোগের জন্য উপপত্নী বা ভোগ্যনারীরূপে রাখতে পারতেন। ঋগ্বেদেই পুরুষের বহু বিবাহের উল্লেখ আছে [৭।২৬।৩] পরবর্তীকালে শতপথব্রাহ্মণ বলেছে, 'একটি পুরুষের বহু স্ত্রী থাকে।

[৯।৪।১।৬] মৈত্রায়নী সংহিতায় মনুর দশ স্ত্রী'র কথা পাড় [৩।৬।৩]; তৈত্তিরীয় সংহিতা বলে চন্দ্র সাতাশটি স্ত্রীর প্রতি সমদৃষ্টি রাখতে পারেন নি, রোহিণীর প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে তাঁর যক্ষ্মারোগ হয়। [২।৩।৫।১৩] তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলেছে "পুরুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা দ্বিতীয় স্ত্রীকে ভোগ করে, সেজন্য প্রত্যেক পুরুষ দুটি স্ত্রীকে ভোগ করে।" [১।৩।১০।৫৮] কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে বিধান সম্পূর্ণ অন্যরকম ; "যদিও একজন পুরুষের বহু স্ত্রী থাকে তথাপি একটি নারীর পক্ষে একজন পুরুষই যথেষ্ট।" [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৫।৩।৪৭] অন্যত্র শুনি "সে-ই হল সমৃদ্ধি, যখন একজন পুরুষের পশুপালের তুলনায় স্ত্রী সংখ্যায় কম থাকে।" [তদ্বৈ সমৃদ্ধং যস্য কনীয়াংস্যা ভার্যা আসন্ ভূয়াংসঃ পশবঃ। শতপথব্রাহ্মণ ২।৩।২।৮ ; ৫।৩।২।৮] লক্ষ্যণীয় এখানে স্ত্রী ও পশু একনিঃশ্বাসে উচ্চারিত ; কারণ উভয়েই পুরুষের সম্পত্তি। আর এক জায়গায় দেখি "স্ত্রী সম্ভোগই দেয়।" [তস্মাদু জায়া ভোগমেব হারয়ন্তে, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ২।৩।৯।২] "তাই পুরুষ যতদিন না জায়া লাভ করে ততদিন পুত্র জন্মায় না।" [শতপথব্রাহ্মণ ৫।২।১।১০]

এমন শাস্ত্রবাক্যও আছে যা পড়ে সহসা মনে হয় বধূ বুঝি বরের প্রায় সমকক্ষ : "যজ্ঞের পূর্বার্ধ পতি, জঘনার্ধ হল পত্নী" [শতপথব্রাহ্মণ ১।৯।২।৩ ; ৩।৪।২।২ ; ৫।২।১।১০] সেজন্যে যজ্ঞে স্ত্রীর উপস্থিতি প্রয়োজন ; কিন্তু স্ত্রী যজ্ঞে হোম বা মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে না। [ন স্ত্রী জুহুয়াৎ। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২।৭।১৫।৭ বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র বলে "নারী যদি কলহ-পরায়ণা, অশুচি, গৃহত্যাগিনী, ধর্ষিতা বা দস্যুগৃহীতাও হয় তবু স্বামী তাকে ত্যাগ করতে পারে না।" [২৮।২-৩] "ধর্ষিতা নারীও প্রায়শ্চিত্তে শুচি হয়" [ঐ ২১৮-১০] আপস্তম্ব ধর্মসূত্র বলে, "স্ত্রী পরিত্যাগী স্বামী কঠোরভাবে দণ্ডনীয়, কিন্তু পতি পরিত্যাগিনী স্ত্রী প্রায়শ্চিত্তে শুচি হয়।" [১।১০।১৯, ২৮] "যে স্বামী স্ত্রীকে কটুবাক্য বলে তাকে উপবাস করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।" [বৌধায়নগৃহ্য সূত্র ২।২।৬৩, ৬৪] এতসব ভাল কথা থাকা সত্ত্বেও মহাকাব্য ও পুরাণগুলিতে কোন একটিও উল্লেখ নেই যেখানে ধর্ষিতা, স্বামী পরিত্যাগিনী এমনকি স্বামীর অহেতু সন্দেহভাজন স্ত্রীও ক্ষমা পেয়েছে কিম্বা কোন কটুভাষী বা স্ত্রী পরিত্যাগী পুরুষ সামান্যতম কোন প্রায়শ্চিত্ত করেছে। রাম, গৌতম, জমদগ্নি এঁরা ধর্ষিতা স্ত্রীকে এমনকি অধর্ষিতাকেও শুধুমাত্র সন্দেহবশেই ত্যাগ করেছেন, কোন প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নই ওঠেনি কখনো। [ধর্ষিতা নারীকে পরের মাস থেকেই শুচি বলে জ্ঞান করতে হবে এমন কথাও আছে পরবর্তী-কালের শাস্ত্রে। দেবলসংহিতা ৪৮-৪৯ অত্রিসংহিতা ১৯।৮]

বরুণ প্রয়াস যাগে প্রতিপ্রস্থাতা পুরোহিত যজমানপত্নীকে সর্বজনসমক্ষে প্রশ্ন করতেন "কার সঙ্গে ব্যাভিচারিনী হয়েছ বল। এটা বরুণের কাছে অপরাধ যে একজন পুরুষের স্ত্রী অন্যের সঙ্গে সঙ্গত হয়।" [শতপথব্রাহ্মণ ২।৫।২।১০, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ১।৬।৫।৩৫] লক্ষ্যণীয় অনুরূপ কোন প্রশ্ন যজমানকে করা হত না। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র বলে, "নারীকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা করতে হবে, কারণ জনকই পিতৃতর্পণের অধিকারী, স্বামী নয়।" [২।৭।৫]

কন্যাহরণের কথা ঋগ্বেদেই আছে, নারীর ইচ্ছাক্রমে বা অনিচ্ছায় তা নিশ্চিতভাবে জানার উপায় নেই। বিমদ পুরুমিত্রের কন্যা হরণ করেছিলেন। [১।১১২।৭; ১।১১৬।১] অন্যত্র পড়ি প্রেমিক "নারীহরণে যাবে প্রার্থনা করছে, রাত্রি যেন অন্ধকার হয়, মেয়েটির আত্মীয়স্বজন জেগে না ওঠে, কুকুরগুলি ডেকে না ওঠে" [৭।৫৫।৫-৮] পরে অবশ্য নারীহরণ করা আট রকম বিবাহের অন্তর্ভুক্ত হয়। কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে পণ দিত এ ধরনের সরাসরি কোন উল্লেখ নেই, তবে এক জায়গায় পড়ি "ইন্দ্র আর অগ্নি ধন দেন তেমন করে যেমন করে অবাঞ্ছিত জামাতা শ্বশুরবাড়ির লোকদের প্রীতিভাজন হয়।" [১।১০৯।২] এখানে কন্যাশুল্কের কথাই আছে। কন্যার শরীরে কোন ত্রুটি থাকলেও তার পিতাকে বরপণ দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হত।

প্রথম যুগে বিধবার দ্বিতীয় বিবাহ হত। ঋগ্বেদে একটি সূক্তে পড়ি সদ্যোবিধবাকে বলা হচ্ছে মৃত স্বামীর পাশ থেকে উঠে এসে জীবলোকে প্রবেশ করতে। উদীর্ষ নার্যভি জীবলোকম্' ঋগ্বেদ [১০।১৮।৮] ভাষ্যকার এখানে দেবরের সঙ্গে তার দ্বিতীয় বিবাহের উল্লেখ করেছেন। পরে বিধবার সহমরণের দুটি উল্লেখ অথর্ববেদে আছে ঃ 'একটি জীবিত নারীকে মৃতের বধূ হতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে'; আর 'এই নারী তার স্বামীর লোকে যাচ্ছে এ একটি প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করছে'। [অথর্ববেদ ১৮।৩।৩,১] কত প্রাচীন এ প্রথা? প্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এর উল্লেখ নেই। অনুমান হয়, আর্যরা প্রাগার্যদের মধ্যে এটির প্রচলন লক্ষ্য করে। বেদে অন্যত্র এবং তার পরের সাহিত্যেও সতীদাহের কোন নজির নেই; বিধবা বেঁচে থাকত এবং বহুকাল পর্যন্ত নির্যাতন হত না। মনুতে পর্যন্ত সহমরণ নেই। কিন্তু হয়ত সমাজে তার সম্বন্ধে কোন তাচ্ছিল্য বা অনুকম্পার ভাব ছিল, বিপত্নীককে কখনও যেভাবের সম্মুখীন হতে হত না; তাই প্রার্থনা আছে 'যেন ইন্দ্রানীর মত অবিধবা হই' [তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ৩।৭।৫।৫১]; পুরুষকে কখনও অনুরূপ প্রার্থনা করতে শোনা যায়নি।

ঋগ্বেদের সময় থেকেই গণিকাবৃত্তির উল্লেখ পাই নানা নামে : হস্রা, অগ্রু [৪।১৬।১৯, ৯, ৩০], সাধারণী, সামান্যা [১।১৬৭।৪ ; ২।১৩।১২,১৫] ; বাজসনেয়ী সংহিতা ৩০।১২ ; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩।৪৭ পুংশ্চলী [অথর্ববেদ ১৫।১।৩৬ ; ২০।১৩৬।৫, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ১।২৭।২] রর্জায়িত্রী [বাজসনেয়ী সংহিতা ৩০।১, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ৩।৪।৭।১] অক্তিস্কদ্বরী অপস্কদ্বরী তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ ৩।৪।১১।১] ক্রমে নাম বৃদ্ধি পায় এবং এ বৃত্তির অধিকার, দায়িত্ব, সামাজিক অবস্থিতির সংজ্ঞা নিরূপণ হতে থাকে। [দ্রঃ রচয়িত্রীর প্রবন্ধ, "প্রস্টিট্যুশন ইন্ এনশ্যেণ্ট্ ইণ্ডিয়া," সোশ্যাল সায়েণ্টিস্ট, ১৬৫ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭] সমাজ পুরুষের যৌন চরিতার্থতার জন্য গৌণ পথটি খোলা রেখেছিল বহু প্রাচীন কাল থেকে, যার কোনও বিকল্প নারীর জন্য কখনই ছিল না।

নারীর বহুপতিত্ব হয়ত আঞ্চলিকভাবে ও কোন কোন যুগে প্রচলিত ছিল! তবে যখন থেকে ইতিহাস পাই সাহিত্যে এ চিত্র বড় একটা দেখা যায়নি। প্রথম উল্লেখ অথর্ববেদে। লক্ষ্যণীয় সতীদাহ বহুপতিত্ব ইত্যাদি সমাজে অপ্রচলিত কিছু কিছু রীতি অথর্ববেদেই পাওয়া যায়। একটা কারণ সম্ভবত এই যে অথর্ববেদ সংকলিত হয় আর্য-প্রাগার্য সংমিশ্রণের শেষ পর্বে, যজুর্বেদ রচনা এর প্রথম পর্বে। তাই প্রাগার্য কিছু রীতি আর্যসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হবার চিহ্ন বেশি আছে এতে, যে রীতি আর্যরা প্রথমে নেয়নি, যেমন সহমরণ, তাও প্রতিবেশী সমাজে লক্ষ্য করে উল্লেখ করেছে অথর্ববেদ। বহুপতিত্ব সম্বন্ধে অন্যত্র উল্লেখ প্রায় নেই ; অথর্ববেদে দুবার আছে। 'যার পূর্বে স্বামী ছিল সে-নারী যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে, তবে সে পঞ্চৌদন অজ (পাঁচটি অন্ন-নৈবেদ্য ও একটি ছাগ) উৎসর্গ করুক' [৯।৫।২৭] ; 'যে নারীর দশটি স্বামী ছিল সে যখন ব্রাহ্মণ স্বামী গ্রহণ করে তখন সেই ব্রাহ্মণই তার যথার্থ স্বামী ; রাজন্য বা বৈশ্য স্বামীরা নয়।' [৫।১৭।৮,৯৫। এ দুটিকেই ক্লিষ্ট ব্যাখ্যায় বিধবা বিবাহের সমর্থক শাস্ত্ররূপেও গ্রহণ করা চলে : কিন্তু বহু-পতিত্বের সমর্থক হওয়াই বেশি সম্ভব বলে মনে হয়। বহুপতিত্বের উল্লেখ আবার সেই মহাভারতে, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিত্ব নিয়ে, যেখানে বিতর্ক হয়। তখন শুনি জটিলা নামে এক নারীর পুরাকালে সপ্তপতিকা ছিল [মহাভারত পুণা সংশোধিত সংস্করণ ১।১৮৮।১৪ ; অন্য সংস্করণে বার্ক্ষী নামে আরও একটি বহুপতিকার উল্লেখ পাই।] অর্থাৎ কোথাও কোথাও কখনো কখনো এ রকম হত ; কিন্তু ব্রাহ্মণসাহিত্য থেকে নারীর একপতিত্ব বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। [তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬।৬।৪৩ ; তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ৩।৫।৩।৪৭ ; ১৩।১০।৫৮]

তাহলে দেখতে পাচ্ছি নারীর পক্ষে বিবাহ আবশ্যিক, একপতিত্বও আবশ্যিক। এই বিবাহে তার চিত্তের স্বীকৃতি নেই, তার সুখ, স্বাস্থ্য বা পরমায়ুর জন্যে কোন প্রার্থনা উচ্চারিত হত না; সে পতিগৃহে আসত একটি বস্তুর মত। পিতৃগৃহে ফিরে বেশিদিন থাকা গর্হিত বলে গণ্য হত, তাতে লোকনিন্দার সম্ভাবনা ছিল [তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ১।৫।২-৩; ভরদ্বাজ গৃহ্যসূত্র ১।১২, আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র ১।৩।৩] পূর্বেই দেখেছি শ্বশুরবাড়িতে কন্যা প্রদান করা হত, সকলের পরিচর্যার জন্য। বিবাহে কন্যার পাঁচটি জিনিস প্রয়োজনীয়ঃ ধন, রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও বংশ [মানব গৃহ্যসূত্র ১।৭৬, বরাহ গৃহ্যসূত্র ১০।৫]; এর মধ্যে প্রথমের থেকে দ্বিতীয়, এই ক্রমে মূল্য। এখানে বিদ্যা বলতে গৃহকর্মে নৈপুণ্যই বুঝতে হবে, কারণ প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার অধিকার নারী পূর্বেই হারিয়েছে। বুদ্ধির চেয়ে বংশের মর্যাদা বেশি। বিবাহের পরে তার কাছে প্রত্যাশিত কী? "সে অন্তঃপুরে বাস করবে নতুবা তার শক্তি ক্ষয় হবে।" [শতপথব্রাহ্মণ ১৪।১।৩১] এ কোন শক্তি যা অন্তঃপুরে না থাকলে ক্ষয় হয়? উত্তম নারীর সংজ্ঞা হল ঃ "যে স্বামীকে প্রসন্ন করে, পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় ও স্বামীর কথার প্রতিবাদ করে না।" [অথর্ববেদ ১১।৫।১৮] "স্ত্রীর সামনে স্বামী আহার করবে না" [শতপথব্রাহ্মণ ১।৯।২।২; ৩।৪।২২; ৫।২।১-১০; ১০।৫।২।৯] আর স্ত্রী? "স্বামী আহার করে উচ্ছিষ্টটা স্ত্রীকে দেবে" [ভুক্তা উচ্ছিষ্টং বধ্বৈ দদ্যাৎ, খাদিরসূত্র ১।৪।১১] অন্যদিকে শুনি, "বধূ স্বামীর অর্ধাংশ," সহসা মনে হয় মানবিক মর্যাদা পাচ্ছে নারী, কিন্তু ঐ শাস্ত্রবচনে এ কথার অব্যবহিত পরেই আছে, "সেইজন্যে যতক্ষণ না পুরুষ ভার্যাসংগ্রহ করছে ততক্ষণ সন্তান পায় না"। [শতপথব্রাহ্মণ ৫।২।১।১০] কাজেই এ হল পুত্রার্থে ভার্যা স্বতন্ত্র কোন মানবিক মূল্য নেই নারীর। "পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়াই নারীর প্রধান কর্তব্য" [আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১।১০।৫১-৫৩] এই মর্মে বহু শাস্ত্র বচন আছে "নারীর প্রকৃষ্ট কর্তব্য হল পুত্রোৎপাদন করা" [মৈত্রায়নী সংহিতা ১।১০।১১; ৪।৬।৪; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬।৫।৮।২ ইত্যাদি] যজ্ঞে পত্নীর কোন সক্রিয় ভূমিকা না থাকলেও যজ্ঞে তার উপস্থিতি অপরিহার্য ছিল; "যার ভার্যা নেই সে যজ্ঞে অনধিকারী।" [তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ২।২।২।১৩]

পুরুষের বৈধ পত্নী, উপপত্নী ছাড়াও গণিকালয়ের পথ সর্বদাই খোলা ছিল, এর কোন বিকল্প নারীর ছিল না, বরং নারীর অবৈধ প্রেমিককে ধ্বংস করার জন্য নানা অভিচারক্রিয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়। [বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৬।৪।১২-১৩] অল্প দু-একটি শাস্ত্রবচনে স্ত্রীকে প্রতারণা করে অন্য নারীতে আসক্ত হওয়ার জন্যে শাস্তির নির্দেশ আছে ঃ "তাকে গর্দভচর্মে দেহ আবৃত করে

ভিক্ষা করতে নিজের পাপ ঘোষণা করতে হবে"; [আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১।১০।২৮।১৯] কিন্তু সুবৃহৎ সাহিত্যে কোন পুরুষের এমন কোন প্রায়শ্চিত্ত করার উল্লেখ নেই। অন্যদিকে নারীর ব্যাভিচারের শাস্তি যেমন গর্হিত তেমনই নৃশংস। [হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র ১।৪।১৪।২ ; আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১৩।৪] নারীর এক অপরাধ হল সে নাকি "রাত্রে স্বামীকে ভুলিয়ে নিজের ইষ্টসিদ্ধি করে নেয়।" [কাঠক সংহিতা ১।১০।১১, ৩৬।৩] এই সংহিতাটি বেশ প্রাচীন, খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের কাছাকাছি সময়ের রচনা, তখনই নারীকে প্রলোভিকা ভূমিকায় দেখবার চেষ্টা সুস্পষ্ট। এই বোধ থেকেই স্বর্বেশ্যারূপে অপ্সরার কল্পনা, যার প্রতিরূপে মর্তের গণিকা ও ভোগ্যনারী।

সংসারের কাজ ছাড়া নারীর প্রধান কর্তব্য পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়া। এইখানে যে-নারী ব্যর্থ, সমাজের অনুমোদনেই তাকে স্বামী পরিত্যাগ করতে পারে। "বন্ধ্যা নারীকে দশ বছর পরে ত্যাগ করা যায়, মৃতবশ ও কেবল কন্যার জননীকে বারো বছর পরে ত্যাগ করা যায়, কলহপরায়ণাকে তৎক্ষণাৎ।" [আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২।৫।১১ ; ১২-১৪] পুত্রসন্তানের জন্ম না দিতে পারলে স্বামী অনায়াসেই স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারত। [শতপথব্রাহ্মণ ৫।২।৩।১৩] আবার উল্টোদিকে শুনি, "কলহপরায়ণা, অশুচি, ধর্ষিতা, দস্যুপরিগৃহীতা স্ত্রীকেও ত্যাগ করা যায় না।" [বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র ২৮।২৩] অথবা, "স্ত্রী পরিত্যাগীর কঠোর দণ্ড, কিন্তু স্বামী পরিত্যাগিনী প্রায়শ্চিত্তে শুচি হয়।" [আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১।১০।১৯,২৮] কার্যত এর ব্যতিক্রমই ছিল রীতি। তাছাড়া কালভেদে বা অঞ্চলভেদেই হোক, দুটি শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধও ত আছে ; একটিতে কলহ-পরায়ণাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা যায়, অন্যটিতে সে অত্যাজ্যা। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, যে কলহপরায়ণ স্বামীর জন্যে কোন দণ্ডের বিধান নেই।

নারীর অধিকার দিনে দিনে সংকুচিত হচ্ছিল, তাই শুনি "স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী" [শতপথব্রাহ্মণ ১৩।১।৭।৬] ; "স্বামীর পদানুসারিণী হতে হবে তাকে" [ঐ ১৩।২।২৪] ; "স্ত্রীর স্থান স্বামীর নিচে" [ঐ ১।৯।২।১৪] অগ্নি পত্নীবৎ বলে একটি যজ্ঞের অংশ ছিল, তাতে লাঠি দিয়ে যজ্ঞীয় ঘৃতকে প্রহার করতে হত, সে প্রসঙ্গে পড়ি, "এইভাবে স্ত্রীকে মারতে হবে যাতে তার নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপরে কোন অধিকার না থাকে।" [ঐ ৪।৪।২।১৩] খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের কাছাকাছি রচনা মৈত্রায়নী সংহিতায় আছে 'সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার থাকবে না।" [১।১০।১১] কাছাকাছি সময়ে রচিত তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও একথা পাই [৬।৫।৮।২] অর্থাৎ সমাজে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্পষ্ট রূপ-পরিগ্রহ করছে, তখন প্রথম থেকেই সম্পত্তির মালিক পুরুষ, উচ্চ তিন

বর্গের পুরুষ, কারণ অন্যান্য শাস্ত্রবাক্য বলে সম্পত্তিতে শূদ্রের কোন অধিকার নেই। সব শাস্ত্রেই বারবার নারী ও শূদ্রকে একই বন্ধনীতে রেখে উল্লেখ করা হয়েছে তারা উভয়েই সম্পত্তি তাই তাদের সম্পত্তিতে কোন অধিকার নেই। "স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোন অধিকার নেই।" [মৈত্রায়নী সংহিতা ১।১০।১১ ; ৩।৬।৩ ; ৪।৫।৭,৮]

শুধু সম্পত্তি নয়, নিজের দেহের উপরেও নারীর অধিকার ছিল না। 'সম্ভোগে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে প্রথমে মিষ্টি কথা বলতে হবে, তাতেও সম্মত না হলে বস্ত্রালঙ্কার দিয়ে তাকে 'কিনে ফেলার' চেষ্টা করতে হবে, [যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে তার আক্ষরিক অর্থই এই ঃ অবক্রীনীয়াৎ] তাতেও সম্মত না হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে তাকে প্রহার করতে হবে'। একথা শুনি, উপনিষদের প্রখ্যাত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে। [বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬।৪।৭]

প্রশ্ন আসে, সমাজে নারীর এই অবনমনের হেতু কী ? ঋগ্বেদের আদি পর্যায়ে যখন পর্যন্ত বৈদিক আর্যদের সমাজবোধ নিয়ন্ত্রিত ছিল যাযাবর পশুচারী সভ্যতার মূল্যবোধ দিয়ে তখন নারীর কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল। ছিল বলেই পরবর্তী সাহিত্যকে উচ্চারণ করে বলতে হয়েছে নারী স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নয়, পূর্ব থেকেই পরতন্ত্র বা পুরুষের অধীন থাকলে একথা বলার প্রয়োজন হত না। ঐ যাযাবর মূল্যবোধে নারীপুরুষের আপেক্ষিক সমতা অন্তর্হিত হল যখন আর্যরা প্রাগার্যদের কাছে কৃষিবিদ্যা শিখল, তাঁবুর বদলে পোড়া ইঁটের পাকা বাড়িতে বাস করতে শিখল। যখন ক্ষেতে ফসল বুনে বসে থাকতে হত একই জায়গায় সে ফসল পেকে গোলায় ওঠা পর্যন্ত। অর্থাৎ, যাযাবর জীবনযাত্রার বদলে কৃষিনির্ভর স্থিতিশীল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হল আর্যরা। কৃষি থেকে তারা শিখল, বীজ যার ফসল তার। জমির ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার আরও পরে এসেছিল, প্রথমে জমি ছিল গোষ্ঠীর, পরে কৌমের সম্পত্তি। তারও পরে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনধারা যখন শিথিল থেকে শিথিলতর হচ্ছিল, তখন 'কুল' বা পরিবার হল সমাজের একক। ইতোমধ্যে আরও একটা ব্যাপার ঘটেছে, খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের কাছাকাছি লোহার লাঙলের ফলার প্রচলন হবার শ'খানেক বছরের মধ্যে কৃষি অনেক সহজসাধ্য হল, পূর্বদিকে অঙ্গ মগধ ও বঙ্গে খনিজ সম্পত্তির সন্ধান পেয়ে আর্যরা সেদিকে এগোচ্ছিল। আর্য আগমনে প্রাগার্য সিন্ধুসভ্যতার মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যে নৌবাণিজ্য ছিল তা, প্রথমে নষ্ট হয়ে যায়, এই সময়ে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের কাছাকাছি তা আবার প্রবর্তিত হয়, ফলে, লোহার লাঙলের ফলার কল্যাণে অল্প পরিশ্রমে বেশি জমিতে চাষ হতে পারল, ফলে কৃষিজাত সম্পদের উদ্বৃত্ত

জমা হতে লাগল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। তেমনি বহির্বাণিজ্যেও উদ্বৃত্ত সম্পদ সঞ্চিত হল কিছু ধনী বণিকের হাতে। অর্থাৎ সমাজে অসম ধন বিভাজন হবার ফলে শ্রেণীবিন্যাস দেখা দিল, ধনী ও নির্ধন দুটি শ্রেণীতে। নির্ধন সমাজে স্থান পেল কায়িক শ্রমের অধিকারে, তার শরীরই তার মূলধন। এই নিরিখে নারী ও শূদ্র একই পর্যায়ভুক্ত হল। ধনের ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারের সঙ্গে ও কৌমবিবাহ ভেঙে কুলগত বিবাহ প্রবর্তিত হওয়াতে নারী একটি পরিবারে কায়িক শ্রম ও একটি পুরুষকে তার দেহসম্ভোগের অধিকার সমর্পণ করতে বাধ্য হল। শিক্ষা ও বৃত্তির অভাবে ভৃত্যের মতই সে ভরণীয়া, তাই ভার্যা।

প্রাগার্যদের পরাজিত করে আর্যরা যে দাসদের সমাজে আনল তারা কায়িক শ্রমে নিযুক্ত হল। ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা গৌণ ও ক্রমে অবান্তর হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, এটা ঘটল ধনী বণিক ও কৃষিক্ষেত্রের ধনী অধিকারীর ক্ষেত্রেই; নিজের দিকের বৈশ্য ও শূদ্র নারী উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, যেমন এখনও আছে। কিন্তু সমাজের অনুশাসন নির্মাণ করে ধনী ও শক্তিশালী সম্প্রদায়ই, সেকালে এরা ছিল ব্রাহ্মণ ও রাজন্য-ক্ষত্রিয়। তাদের সমাজে দাস দেখা দিল বহুসংখ্যায় এবং নারী উৎপাদনে আপেক্ষিকভাবে বাহুল্য হয়ে উঠল। ফলে সে ভার্যা ও ভরণীয়া হল ভৃত্যেরই মত এবং যেহেতু উৎপাদনের জন্যে বহির্জগতে চলাফেরার প্রয়োজন তার রইল না তাই তাকে শুদ্ধান্তঃপুরিকা করাও সহজ হল।

এতেও তার অবনমন সম্পূর্ণ হয়নি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে-সঙ্গেই ধনবান পুরুষের নতুন এক আতঙ্ক দেখা দিল। তার উপার্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী যেন তার ঔরসজাত পুত্র ছাড়া আর কেউ না হয়। কেমন করে নিশ্চিত হওয়া যাবে, পুত্রটি পিতারই ঔরসজাত কিনা? স্ত্রীকে যদি সম্পূর্ণভাবে পরপুরুষের সংগ থেকে সরিয়ে দিতে পারা যায় শুধু তবেই এ নিশ্চয়তা আসে। তাই বলতে হয়েছে, পরলোকে পিণ্ড পুত্রের মাতার স্বামী পায় না, পায় জন্মদাতা পিতা। তাই হাস্যকর ভাষায় পর্দাপ্রথার সংজ্ঞা দিয়েছে মহাভারত : ন চন্দ্রসূর্যং ন তরুং পুংনাম্নো যা নিরীক্ষতে। পতিবর্জং বরারোহা সা ভবেদ্ধর্মচারিনী ॥ [১৩।১৪৬।৮৮] চন্দ্র সূর্য বৃক্ষ ইত্যাদি কোন পুংলিংগান্তবস্তু স্বামী ছাড়া—যে নারী নিরীক্ষণ করে না সেই সুসম্ভোগ্যা নারীই ধর্মচারিণী। তাই গীতায় বর্ণসংকরের নামে এত আতঙ্ক এবং তার সমস্ত দায়িত্বটা নারীকেই দেওয়া হয়েছে। [স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকর : ভগবদগীতা ১।৪০]

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পর থেকে, অর্থাৎ যখন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনপ্রণালী ভেঙে কুল বা পরিবারগত বিন্যাস এসেছে সমাজে, সে সময় থেকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত যবন, শক, পহ্লব, দর্দ, হূন ইত্যাদি নানা বৈদেশিক আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছে আর্যাবর্ত। ফলে কুলের নারীকে রক্ষা করা একটি বিভীষিকার রূপ পরিগ্রহ করেছে। সে নারীর শিক্ষা নেই, স্বাধীন বৃত্তি নেই, তার দেহকে রক্ষা করার বিদ্যা জানা নেই, একান্ত পুরুষনির্ভর জীবনে তাকে অবরুদ্ধ রাখা হয়েছে প্রায় এক সহস্রাব্দ ধরে। আক্রমণকারী থেকে তাকে রক্ষা করার উপায় নির্ণীত হল যৌবনের পূর্বেই বিবাহ দিয়ে একান্ত দৃঢ় অবরোধে তাকে রুদ্ধ করে রাখা। এই মনোভাবের ফলে নারী বোঝা হয়ে উঠল। পুরুষের দৃষ্টিতে সে হয়ে উঠল প্রলোভয়িত্রী অতএব পরীক্ষা, নরকের দ্বার, অশুচি।

এই অশুচিত্বের বোধ ও ক্রমবর্ধমান তাচ্ছিল্য প্রতিফলিত শাস্ত্রবচনে। "নারী, কুকুর, কালো পাখী—এদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়; নইলে আলোক ও অন্ধকার, শুভ ও অশুভ সব একাকার হয়ে যাবে।" [শতপথব্রাহ্মণ ১৪।১।১।৩১] "নারী অসত্য, দুর্ভাগ্য, সুরা বা জুয়া খেলার মত একটা নেশা মাত্র।" [মৈত্রায়নী সংহিতা ১।১০।১১ ; ৩।৬।৩] তাই নারী শুধু নিজে মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারত না তাই নয়, তার সম্পর্কে অনুষ্ঠানগুলিতেও সে নীরব, তার ধর্মাচ্চরণ অমন্ত্রক। তার নিজের জন্যে কোন অনুষ্ঠান নেই, শুধু গর্ভাধান পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন ছাড়া এবং এগুলির একটিই উদ্দেশ্য—জাতকটি যেন কন্যা না হয়ে পুত্র হয়। সোমযাগে কতকগুলি যজ্ঞীয় পাত্রকে মাটিতে রাখা হয় আর কতকগুলিকে উপরে তুলে ধরা হয় "অতএব সদ্যোজাত শিশুপুত্রকে উপরে তুলে ধরা হয়, শিশু কন্যাকে মাটিতে শোওয়ানো হয়।" [তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬।৫।১০।৩] জন্মসূত্রেই নারী হীন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও নারীজন্ম অভিশাপের ফল, পুরুষজন্ম পূর্বজন্মের পুণ্যের পুরস্কার। [মহাভারতেও ৬।৩৩।৩২] নারী অশুভ, অশুচি। মৃত্যুর কিছু পূর্বে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, "নারীর চেয়ে অশুভ আর কিছুই নেই, পুত্র, পুরুষের উচিত সর্বথা নারীর প্রতি আসক্তি পরিহার করা।" [১৩।৪৩।২৫] বহু পূর্বে তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, 'সর্বগুণান্বিতা নারীও অধমতম পুরুষের চেয়ে হীন।' [৬।৫।৮।২] এর পুনরাবৃত্তি মহাভারতে একাধিকবার আছে। নারীর সামাজিক মূল্য আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের একটি নির্দেশে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ মাত্র একদিনের একটি প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে কতকগুলি হত্যার জন্যে ঃ "কালো পাখি, শকুনি, বেঁজি, ছুঁচো, কুকুর, শূদ্র ও নারী।" [১।৯।২৩।৪৫]

মহাভারত রচনার শেষ পর্যায়ের সমকালীন রচনা বাৎস্যায়নের কামসূত্র,

সেখানে দুবার উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, নারী পণ্যদ্রব্যের মত। উত্তরবৈদিক সাহিত্য থেকে মহাকাব্য যুগ পর্যন্ত যুগে নারী ভোগ্যবস্তু [তস্মাদু হ স্ত্রিয়ো ভাগমেব হারয়ন্তে। তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।৩।১০।৭] ভোগ্যবস্তু রূপে ভেবেই বলা হয়েছে, "পশুভূমিস্ত্রীণামনতিভোগঃ", অর্থাৎ পশু, জমি এবং স্ত্রীকে অত্যধিক ভোগ করা ঠিক নয়। [গৌতমধর্মসূত্র ১২।৩৯] নারীর অবনমিত স্থান আরও বোঝা যায় যখন শুনি সারস্বতানাময়ন নামক যজ্ঞের দক্ষিণা হল একটি ঘোটকী ও সন্তানবতী একটি নারী। [শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ১২।২৯।২১] পরে নারীকে দানে, দক্ষিণায়, অতিথি-আপ্যায়নে ভোগ্যদ্রব্যের মত ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর সঙ্গে দান করা হত, শ'য়ে শ'য়ে। রামায়ণ মহাভারতে সোনাদানা খাদ্যবস্ত্রের সঙ্গেই শত শত নারী দান করার কথা পাই।

"রূপিণী যুবতিঃ প্রিয়া ভাবুকা" [শতপথব্রাহ্মণ ১৩।১।৯।৬], অর্থাৎ সুন্দরী তরুণী স্বামীর প্রিয় হয়। আর যে কুরূপা, বা যার যৌবন অতিক্রান্ত? তার স্বামী বহুপত্নীত্বে অধিকারী অতএব প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের সামনেই প্রৌঢ়া প্রথমা পত্নীকে প্রকাশ্যে অপমান করে সুন্দরীতরা দ্বিতীয়াকে বাড়িতে আনতে পারত স্বামী। তাতেও না তৃপ্তি এলে অন্য পত্নী উপপত্নী ভোগ করার পরও গণিকালয়ের পথ খোলা ছিল তার। অশিক্ষিতা, সংসারের চাপে, সন্তানধারণের চাপে বিগতযৌবনা নারীকে যে এ সমাজব্যবস্থার কোন স্থানে রাখা হত তা এই সেদিনের কৌলীন্যপ্রথাতে স্পষ্ট বোঝা যেত। গণিকা চতুঃষষ্টিকলায়, সুশিক্ষিতা, সুসজ্জিতা, অতএব আকর্ষণীয়া, কুলকন্যা, কুলবধূ শিক্ষায় বঞ্চিতা, পুরুষনির্ভর, অতএব যৌবনের বছর কাটার পরে তার স্থান ঝরাপাতার স্তূপে। একথা মনে করার কোন কারণ নেই সব স্বামী স্ত্রীকে অনাদর করত; নিশ্চয়ই সুরুচিমান, সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন বহু সহৃদয় পুরুষ স্ত্রীকে সম্মান ও প্রেমের দৃষ্টিতেই দেখত। কিন্তু যদি কেউ অবজ্ঞা করতে চাইত ত শাস্ত্র তারই সপক্ষে ছিল এবং এ সমর্থনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে নারীর রূপ এই উত্তরবৈদিক যুগের চিত্রেরই অনুবৃত্তি। রামায়ণ মহাভারতে নারীর চিত্রণে স্পষ্ট দুটি স্তর আছে। প্রথম পর্যায়ে মূল ক্ষত্রিয় মহাকাব্যের মূল্যবোধ প্রতিফলিত; সেখানে নারী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচারিণী, অন্তত স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলে কিছু স্বীকৃতি আছে তার। এই মূল ক্ষত্রিয় মহাকাব্যে সীতা রাবণকে পরুষ ভাষায় ভর্ৎসনা করে; লক্ষ্মণকে, অন্যায়ভাবে হলেও, তীব্র ভাষায় ধিক্কার দেয়। রাম লঙ্কায় যখন নিরপরাধ সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন সীতা বলেন, 'আমার অধীন যে হৃদয় তা তোমাতে সমর্পিত, যে-দেহটার উপরে আমার শক্তি ছিল না সেখানে ত

আমি অসহায়। একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি আমরা, তাও যদি আমাকে তুমি না জেনে থাকো ত সেই আমার সর্বনাশ।' [৬।১১৬।৯, ১০] রামের সীতা প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে শোনা যায় যে প্রজারঞ্জনের জন্যে তিনি এ কাজ করেছিলেন, কিন্তু লঙ্কায় তাঁর প্রজা কোথায় ? সে প্রশ্নই ত ওঠে না সেখানে। আজকাল আরও বলা হয়ে থাকে রাম জানতেন সীতা নির্দোষ, লোকপ্রত্যয়ের জন্যে ঐ নির্দয় ভূমিকায় তিনি 'অভিনয়' করেছিলেন। এ গল্প ধোপে টেঁকে না, কারণ প্রত্যাখ্যানের পূর্বে রামায়ণ বলছে রাম 'হৃদয়ান্তর্গতং ভাবং ব্যাহর্তুমুপচক্রমে' [৬।১১৫।১] অর্থাৎ তাঁর 'মনোগত ভাব' প্রকাশ করতে উদ্যত হলেন। এ ভাব তৎকালীন জনসমাজেরই মনোগত ভাব, যার প্রকাশ মহাভারতের রামোপাখ্যানে, যেখানে রাম সীতাকে বলেন, "তুমি সচ্চরিত্রাই হও অসচ্চরিত্রাই হও তোমাকে আমি গ্রহণ করতে পারিনে, কারণ তুমি পরহস্তগতা। ধর্মাধর্মবিনিশ্চয় করতে পারে যে সে কেমন করে 'কুকুরে-চাটা-ঘি'-এর মত যে-তুমি সেই তোমাকে গ্রহণ করবে ?" এর পরে তাঁর স্বামীসুলভ মঙ্গলচিন্তার প্রকাশ দেখি "লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বিভীষণ, সুগ্রীব এদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পতিত্বে বরণ কর।" প্রত্যাখ্যানের জন্যে 'কুকুরে-চাটা-ঘি' বলার দরকার ছিল না, কাকে সীতা পতিত্বে বরণ করবেন সেই অতিগর্হিত তালিকা পেশ করারও দরকার ছিল না। এ হল তৎকালীন সমাজে নারীর অবনমিত স্থানের স্পষ্ট শাস্ত্রীয় উচ্চারণ। সেখানে অগ্নিকে সাক্ষী 'সত্যক্রিয়া' করেন, অর্থাৎ 'যদি নির্দোষ হই ত আমাকে অগ্নি রক্ষা করুন' এই বিশ্বাসে অগ্নিপ্রবেশ করা। [চারভাবে নির্দোষিতা প্রমাণ করা হত তৎকালীন আইনে। অনুপ্রবেশ, জলপ্রবেশ, বিষপান ও তুলারোহণ। একে সত্যক্রিয়া বলে] এই সত্যক্রিয়ার পূর্বে সীতা কঠোর ভাষায় রামকে নিন্দা করেন মিথ্যা সন্দেহের জন্যে।

উত্তরকাণ্ড পরবর্তীকালের সংযোজন, যুদ্ধকাণ্ডে 'অগ্নিপরিক্ষা'র কাহিনীটিও। উত্তরকাণ্ডে সীতা সম্বন্ধে লোকনিন্দা শুনে রাম ভাইদের বলেন, 'অপবাদ ভয়ে ভীত আমি প্রাণ ত্যাগ করতে পারি, তোমাদেরও ত্যাগ করতে পারি, সীতাকে ত্যাগ করতে পারি সে ত বলাই বাহুল্য' [৭।৪৮।১৪-১৫] শ্লোকের যে ভাষা তাতে বোঝায় যে তিনটি ত্যাগের মধ্যে সীতা পরিত্যাগই সবচেয়ে সহজ, 'কিং পুনর্জনকাত্মজাম্' এবারে ব্রাহ্মণ্য-সংযোজনের অংশে সীতা লক্ষ্মণের মুখে নির্বাসনের কথা শুনে কোন দৃপ্ত প্রতিবাদ করলেন না, যদিও এবারেই অন্তঃসত্ত্বার সাধপূরণের ছলে পরীক্ষিত নিরপরাধী সীতাকে বনে নির্বাসন দেওয়া সত্যিই অত্যন্ত গর্হিত আচরণ। এবারে সমাজের চাহিদা অনুসারে সীতা শুধু বিলাপই করলেন। 'শুধু দুঃখভোগের জন্যেই আমার এই

দেহটার সৃষ্টি হয়েছিল, লক্ষ্মণ।' [৭।৪৮।৩]. উপরন্তু লক্ষ্মণকে বললেন, 'রামকে বোলো, আমি শুদ্ধচারিত্রা এবং তোমাতেই পরম ভক্তিমতী জেনেও অযশোভীরু তুমি যে আমাকে ত্যাগ করেছ তা লোকনিন্দা পরিহার করবার জন্যেই করেছ। আমারও ত এই কর্তব্য…পতিই নারীর পরম দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গুরু। স্বামীর কাজ (স্ত্রীর কাছে) প্রাণের চেয়েও প্রিয়তর।" [৭।৪৮।১২-১৮]

বৌদ্ধ-জৈন-আজীবিক-ধর্ম ও উপনিষদের প্রভাব সমাজ থেকে অন্তর্হিত হবার পর ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধের যে পুনরভ্যুত্থান ঘটে তার একটি লক্ষণ ছিল নারীর সামাজিক অবমূল্যায়ন ; তারই নির্লজ্জ প্রকাশ এখানে। এর পরে গুপ্তযুগে এই মূল্যবোধের ফলে ভাস্কর্যে প্রথম দেখা যাবে লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছেন। নারী ও শূদ্র, যাদের স্বতন্ত্র সম্পত্তিতে অধিকার নেই, যারা অন্নবস্ত্রের জন্যে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর উপরে নির্ভরশীল, তাদের ক্রমান্বয়ে অবনমন ঘটতে লাগল রামায়ণ-মহাভারতের ব্রাহ্মণ্য প্রক্ষেপ থেকে পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিতে। এর সূত্রপাত মহাকাব্য যুগেই।

মহাভারতেও মোটের উপরে একই চিত্র তবে এর কলেবর রামায়ণের চারগুণ এবং ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের পরিমাণ মূল মহাকাব্যের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি বলে ক্ষত্রিয় মহাকাব্যে নারীর আলেখ্য ও ব্রাহ্মণ্য অংশের আলেখ্য—এ দুটির পার্থক্য অনেক বেশি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। প্রথম অংশে নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে [সাবিত্রী একাই স্বামী খুঁজতে বেরিয়েছিলেন ; কুন্তী একা কর্ণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন] শিবিকা ছাড়াই। তারা সুরাপান করে ; অপরাধী পুরুষকে পদাঘাত করে [দ্রৌপদী কীচককে ৪।১৬, ১৯-২০] এবং মোটের উপর তাদের ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র স্বীকৃতি আছে। সাবিত্রী পিতা ও পিতৃবন্ধুদের পরামর্শের বিরুদ্ধে রাজসভায় বসে তর্ক করে সত্যবানকে বিবাহের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, অম্বা নিজের নির্বাচিত বরের নাম অসংকোচে ভীষ্মের কাছে ব্যক্ত করে এবং তার আপত্তি স্বীকৃতও হয়। শকুন্তলা সন্তান নিয়ে দুষ্মন্তের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে দুষ্মন্তের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের বিরুদ্ধে বিস্তর কটুবাক্য বলে। গান্ধারী বারেবারেই ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্কার দেন তাঁর অন্ধ পিতৃস্নেহের জন্যে। [২।৭৫।৮-১০ ; ৫।১২২।৯] কুন্তী তাঁর পুত্রদের ক্লৈব্যের জন্যে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। [৫।১৩২-৩৫] দ্রৌপদী তাঁর বিশ্রুতযশা ধার্মিক স্বামী যুধিষ্ঠিরের প্রতিস্পর্ধী হয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে রীতিমত তর্ক করেন। [৩।২৭।৩০,৩২,৩৭] পাণ্ডু কুন্তীকে বলেন, ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে বিবাহিত নারী অন্য যে কোন পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। [১।১১৩।২৫,২৬] নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করে' গেলে পর বয়ঃপ্রাপ্ত

পুত্রকন্যার জননী দময়ন্তী নিজের জননীকে বলেন, নলের বিরহ অসহ্য তাঁর কাছে, তাঁর স্বয়ংবরসভার ঘোষণা করলে নল যেখানেই থাকুন চলে আসবেন। [৩৷৫৩-৭৮] দেবযানী কচকে অভিশাপ দেন, পরে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে যযাতির বিবাহ হলে পর তিনি সহচরীরূপে প্রেরিত হন ও গোপনে যযাতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর সন্তানের জননী হন। [১৷৫৯] প্রমদ্বরা রুরুকে, হিড়িম্বা ভীমকে, উলূপী ও চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বিবাহ করেন, নিজেরা উপযাচিকা হয়ে প্রণয়নিবেদন করে'। গান্ধারী কৃষ্ণকে তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় অভিশাপ দেন এবং সে অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়ে দিয়ে মহাভারতকার গান্ধারীর শাপকে এবং শাপ দেবার অধিকারকে সমর্থন করেন। সিদ্ধা শিবা [৫৷১০৯৷১৯] ও শাণ্ডিল্যের কন্যা [৯৷৫৪৷৬-৮] ও আরও কিছু নারী স্বেচ্ছায় তপস্বিনী হন, যা পরে অকল্পনীয় হয়ে ওঠে।

এ-ই হল নারীর আলেখ্য ক্ষত্রিয় মহাকাব্যে। মূল মহাভারতটি জনপ্রিয় এবং বেশ কিছু চারণের কণ্ঠস্থ হয়ে যাওয়ার ফলে প্রাক-লিপি যুগে তার পরে পরিবর্তন করা যায়নি বলেই কাব্যমূল্যের ঔজ্জ্বল্যে এর উপাখ্যান ও চরিত্রগুলি অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত আছে। কিন্তু যখন সমাজে ভিন্ন মূল্যবোধ প্রবর্তিত হল তখন নারীর অবমূল্যায়ণ প্রয়োজন হল। সেই সময়ে দুভাবে এই বোধটিকে মহাকাব্যে অনুপ্রবিষ্ট করা হল ঃ তত্ত্বকথা ও উপাখ্যান। আদর্শ পতিব্রতা সতী নারীর কিছু চিত্র নির্মাণ করা হয়। ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিথিকে অবজ্ঞা করে স্বামী-সেবায় নিরতা নারীকে শাপ দিতে উদ্যত হলে ব্রাহ্মণী তার দিব্যদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে বলে, সব পতিব্রতা নারীরই এর ক্ষমতা আছে। [৩৷২০৫] বনপর্বে সত্যভামা দ্রৌপদীকে প্রশ্ন করেন, পাঁচটি স্বামীকে কীভাবে তিনি পরিতুষ্ট রাখেন ; উত্তরে দ্রৌপদী পতিব্রতাধর্মের উপরে সুদীর্ঘ এক বক্তৃতা দেন। [৩৷২২২৷৫-৬০] এর মূলকথা হল, নারী যদি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলোপ করে এবং নিজেকে স্বামীর ইচ্ছাপালনের যন্ত্রমাত্রে পরিণত করে তবেই সে যথার্থ পতিব্রতা বা সতী হতে পারে। স্মরণীয়, 'সতী' শব্দের কোন সমার্থক পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ নেই, এবং 'পত্নীব্রত' বিদ্রূপাত্মক শব্দ স্ত্রৈণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। "যে নারীর শাশুড়িকে গৃহকর্ম করতে হয় বা যে শাশুড়ির কথার প্রত্যুত্তর দেয় সে অধম নারী।" [১৩৷৯৩৷১৩১] মঞ্জুভাষিণী নারী প্রশংসিত [৫৷৩৩৷৮৬] পরুষভাষিণী নিন্দিত। [৫৷৩৩৷৮৪]

ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে একটি উপাখ্যান পাই ঃ ব্রহ্মচারী গালব রাজা যযাতির কাছে এসে গুরুদক্ষিণার অর্থ প্রার্থনা করে। যযাতির তখন যথেষ্ট অর্থ ছিল না, তাই তার পরিবর্তে তিনি সুন্দরী তরুণী কন্যা মাধবীকে দেন, যেন তাকে পর-

পর রাজাদের কাছে এক বছরের জন্যে ভাড়া দিয়ে গালব গুরুদক্ষিণার অর্থ সংগ্রহ করে। তিন বছর ঐভাবে তিন রাজার কাছে মাধবীকে রেখে গালব প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে। পরে মাধবী বিবাহে অসম্মত হয়ে তপশ্চারিণী হয়। এই সময়ে যযাতি স্বর্গে যাবার সময়ে আবিষ্কার করে তার পুণ্যে কিছু কম পড়েছে, তখন মাধবীরই সঞ্চিত পুণ্যের এক অংশ নিয়ে যযাতি স্বর্গে যায়। [৫।১১৮-২২] অর্থাৎ দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বা মানসিক সবরকমের শোষণই মাধবীকে সহ্য করতে হল।

অথচ নারী নরকের দ্বার। মৃত্যুপথযাত্রী ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "নারীর চেয়ে অশুচি আর কিছু নেই।" [১২।৪০।১] "পুরুষের উচিত নারীর প্রতি আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যাগ করা।" [১৩।৪৩।২৫] "পূর্বজন্মের পাপের ফলে নারীজন্ম হয়", [৬।৩৩।৩২] "সাপের মত নারীকেও কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়।" [৫।৩৭।২৯] "নারীর কাছে মিথ্যা বললে পাপ হয় না।" এই ছ'টি বস্তুকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে না রাখলে সেগুলি নষ্ট হয় : গাভী, সেনা, কৃষি, স্ত্রী, বিদ্যা এবং শূদ্রসংসর্গ। [৫।৪৩।১০] ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির "নারীকে সর্বপাপের দ্বার বলে শাপ দিয়েছিলেন" [১২।৬] ভীষ্ম বলেন, "নারীর দ্বারাই বংশ কলুষিত হয়" [১২।৪।৮] গীতায় কৃষ্ণও তাই বলেন।

বৌদ্ধ জৈন আজীবিক ও আরও বহুবিধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের কাছাকাছি সময়ে; এর প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের গৃহস্থাশ্রমেও নারী সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞা ও অনাস্থার সূচনা হয়। স্বয়ং বুদ্ধ নারীকে প্রৌঢ়া মহাপ্রজাপতী গৌতমীকেও দীক্ষা দিতে চাননি কাজেই এ মনোভাব সমাজে তখন ব্যাপক ছিল। সাহিত্য নারীকে একটি ভূমিকাতেই প্রধানত দেখেছে; উল্লেখ করেছে রমণী, কামিনী, কান্তা, ভার্যা, জায়া বলে সম্বোধন বা উল্লেখ করেছে তার যৌন আবেদনের বর্ণনা করে। সুতানী, পীনপয়োধরা, বরারোহা ইত্যাদি। পুরুষের সম্ভোগবাসনা চরিতার্থ করা, তার ও তার পরিবারের পরিচর্যা করা ও তার বৈধ সন্তান, অর্থাৎ তার সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীকে গর্ভে ধারণ করা, এই হল নারীর শাস্ত্রসম্মত ভূমিকা। নারীর আকর্ষণ রোধ করে পুরুষ এবং তার জন্যে নারীকেই দোষ দেয়; সাহিত্যে এ দুটি ধারাই যুগপৎ বিদ্যমান। নারীর রূপযৌবনের প্রশংসা এবং তার সম্বন্ধে অনীহার প্রশংসা। সুস্থ সামাজিক জীবনবোধ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এর দ্বারা, কারণ আতিশয্য এবং কৃত্রিমতায় কলুষিত এ দুই মনোভাবই।

মধ্যযুগে বাংলায় নারী-ভাবনা ও নারীর স্থান : সাহিত্যে ও সমাজে

রীণা ভাদুড়ী

প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য মধ্যযুগে বাংলার সমাজে ও সাহিত্যে নারী-ভাবনার ও নারীর স্থান বিচার করা—এ যুগে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন মতাদর্শে নারীর অবস্থান ও নারী-চিন্তায় যে প্রভেদ লক্ষ্যণীয় তার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করা, সমাজাদর্শের বিভিন্ন ধারার, অর্থাৎ কৌম, লৌকিক, তান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্য, বৈষ্ণবীয়, ইত্যাদি নারীর ভূমিকা বিচার ও এ ক্ষেত্রে-পারস্পরিক প্রভাব ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা, সর্বশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ সংস্কারের বিশিষ্ট ধারায় নারী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করা।

মধ্যযুগে যে-কোন সমাজের মূল্যবোধ নির্ধারিত হত ধর্মীয় আদর্শের মাপকাঠিতে। সেই কারণে বাংলার মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় তিনটি ধারার কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন—লৌকিক, তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্য—বাংলার জনজীবন সমান্তরালে প্রবহমান এই ত্রিধারার মিলনে ও সংঘাতে সৃষ্ট। আলোচ্য যুগে নারীর ভূমিকা বিচার করতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিচরিত্রের উদাহরণ নেওয়া তথ্যের অভাবে সম্ভব নয়, প্রথমাংশে তাই ঐতিহাসিক চরিত্রের অভাবে সাহিত্য চরিত্রের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। পরবর্তী অংশে, বিশেষ বৈষ্ণবীয় ধারায়, অবশ্য ঐতিহাসিক চরিত্র অপেক্ষাকৃত সুলভ। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে, ধর্মীয় হওয়া সত্ত্বেও, সমাজ ভালই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নারীর ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ধারণারই প্রতিফলন হয়েছে সাহিত্যে, সেখানে কি দেবী, কি মানবী, রচনাতে পুরুষ ও নারী সাহিত্যিক নিজ নিজ সামাজিক ধারাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। স্মৃতিশাস্ত্রের সামাজিক অনুশাসনে ব্রাহ্মণ্য ধারার নারী-ভাবনা ও নারীর স্থান নির্দেশ পারম্পর্য্য রক্ষা করেছে। ব্রাহ্মণ্য ধারাটি নগরভিত্তিক, প্রাক্-মুসলিম শাসক সমাজের মতাদর্শ, শাস্ত্রজ্ঞ, শিক্ষিত মানুষের দ্বারা রচিত ও প্রচারিত—যাঁদের প্রচার-কার্যসূচীকে আর্যীকরণ বলা হয়।

বৈষ্ণব সাহিত্যে নারীর কল্পরূপ আর বৈষ্ণব সমাজে নারীর বাস্তব অবস্থায় বিস্তর প্রভেদ। বরঞ্চ শাক্তসাহিত্যে শক্তিরূপিনী মাতৃরূপ কিছুটা সমাজে প্রতিফলিত হয়েছে—মা, বিশেষত পুত্রবতী মাতার, কিছু প্রতিপত্তি ছিল। আলোচ্য যুগে মুসলিম রাজশক্তি ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ধারণা, তথ্যের ও জায়গার অভাবে ইসলামী ধারায় নারীর স্থান বিচার করা এখানে সম্ভব হয়নি। নিবন্ধটি যেহেতু প্রধানতঃ সামাজিক ধারার উপর নির্ভরশীল, সেই হেতু কালানুক্রম বজায় রাখা সর্বদা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন ধারার আলোচনাকালে স্মরণে থাকবে, অধিকাংশ সময়ে ধারাগুলি সমান্তরালে প্রবহমান। বাংলা সাহিত্যের উপাদানসমূহের জন্য কালক্রম চর্যাপদে আরম্ভ করে মোটামুটি সপ্তদশ শতকে শেষ করেছি, তবে সভাসাহিত্য ও জনসাহিত্য অন্তর্ভুক্ত করিনি।

[১]

নারী মর্যাদার ধারণা মূলতঃ জাতিগত বা 'রেশিয়াল'। অষ্ট্রিক, মঙ্গোলীয়, ইত্যাদি. আর্যেতর জাতিসমূহের মধ্যে নারীর স্বাধীন অবস্থাই ছিল স্বাভাবিক। আর্যীকরণের (Aryanization) পূর্বে বাঙালি সমাজেও মাতৃসূত্রী ব্যবস্থায় নারী প্রাধান্য ছিল। নানা সংকর জাতি নিয়ে গঠিত বৌদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থায়ও নারীর বিশিষ্ট স্থান পরিলক্ষিত হয়। আর্যীকরণের ফলে পৌরাণিক ধর্ম ও স্মৃতি ও অনুশাসনের দ্বারা এই নারী স্বাতন্ত্র্য লোপ পেতে বসে। তবে আর্যীকরণের পরবর্তী অবস্থাতেও সমাজে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে, নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনচর্চার মধ্যে নারীর অবস্থানের আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল। কৌমগত গ্রামীণ সমাজে নারী ছিল সহজ স্বাধীন, তাদের নারী-পুরুষ সম্পর্কের ধারণা ছিল অন্য মাত্রার, সামাজিক রীতিনীতি ছিল ভিন্নতর। অন্ত্যজ ডোম, শবর, পুলিঙ্গ, নিষাদ, যাযাবর নারীর জীবনে স্বাধীনতার অভাব ছিল না। নৃত্যগীত পটিয়সী ডোমনারী ছিল পুরুষের সঙ্গে সমানে জীবনানন্দের ভাগীদার। আদিম মাতৃসূত্রী কৌম সমাজে বাঙালি মানসে নারী-ভাবনার প্রাধান্য ও প্রসার দেখা যায়। এই জীবনাদর্শে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যরা জ্ঞানময় সত্তা বা নৈরাত্মাদেবীকে ডোম্বিনী কল্পনা করেছেন। কাহ্নপাদ বলছেন: 'আলো ডোম্বি তো এ সম করিব ম সংগ/নিঘিন কান কাপালি জোই লাংগ।' বৌদ্ধ সহজিয়ারা ও তান্ত্রিক নাথপন্থীরা বর্ণাশ্রম ধর্মের গণ্ডী ছিন্ন করে সকল নিম্ন-বর্গীয়- জাতিসমূহকে তাঁদের মতে ও পথে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। সহজ-

যানীদের মধ্যে ডোম্বীমার্গ ও চণ্ডালীমার্গ মুক্তির সাধন স্বরূপ গণ্য হত, বিশেষ বাঙালিদের মধ্যে। চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে ভূসুকুর একটি গান আছে ঃ 'আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী/নিঅ ঘরনী চণ্ডালী লেলী।'—রে ভূসু আজ তুই (খাঁটি) বাঙ্গালী হলি, চণ্ডালীকে ঘরনী করলি। হিন্দু তান্ত্রিক মতেও শিব অপেক্ষা শক্তির প্রাধান্য দেখা যায়। বামাচারী শাক্ত তান্ত্রিকেরা সাধনার জন্য সুপ্রশস্ত সঙ্গ বলেছেন কাপালিক, শবরী, চণ্ডালিনী, শুঁড়িনী, রজকিনী, নাপিতানী, গোয়ালিনী, মালিনী, নটি, গণিকা ও সর্বশেষে কুলাঙ্গনা ও ব্রাহ্মণীর। এই সাধনভজন প্রথায় নিম্নবর্গের নারীর প্রাধান্য লক্ষণীয়। সহজযানী ও তান্ত্রিক ধারায় নিম্নবর্গের নারীকে সাধনমার্গে সহযোগী করে নেওয়া, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মূল্যবোধে যৌনবিকারমাত্র সাব্যস্ত করলেও, তৎকালীন সমাজে দরিদ্র, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ নারীরা যোগী, কাপালিক, সাধু, সিদ্ধাচার্যদের ধর্মে-কর্মে অংশ নেবার অধিকারকে কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা' বিবেচনাযোগ্য।

একাদশ শতকের গ্রামীণ সমাজে কিছু স্ত্রীলোক প্রাধান্য বিস্তারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন মনে হয়। ডাকিনীসিদ্ধ বলতে এমন এক নারীশ্রেণীকে বোঝাতো যাঁরা অপরসায়ন বা অ্যালকেমি চর্চা করতেন। এঁদের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা থাকাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা নানা বিকৃতপন্থা অবলম্বনের ফলে সমাজে হেয় হয়ে পড়েন। **ডাকের বচনের** সঙ্গে এদের প্রারম্ভিক কোন যোগ ছিল কিনা কে জানে? ডাকের বচনে নারী ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়সমূহের আলোচনা আছে, যেমন—গৃহিনী ও কুগৃহিনীলক্ষণ, স্ত্রীদোষকথন, ইত্যাদি। চপলা স্ত্রীলোক সম্পর্কে সাবধান বাণী—'ঘরে স্বামী, বাইরে বইসে/চারিপাশে চাহে মুচকে হাসে। হেন স্ত্রীয়ে যাহার বাস/তাহার কেন জীবনের আশ।' অথবা, 'ঘরে আখা, বাইরে রান্ধে/অল্প কেশ ফুলাইয়া বান্ধে। ঘন ঘন চায় উলটি ঘাড়/ডাক বলে এ নারীর ঘর উজাড়।' দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে 'ডাক' মানে প্রচলিত বাক্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ডাক মন্ত্রবিজ্ঞ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী/সন্ন্যাসিনী। নারী চাপল্যের আশঙ্কা দেখে দ্বিতীয়টিই সত্য মনে হয়। তবে ডাক পুরুষই ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই. তাই বলছেন ঃ 'স্বর্ণ, ভূমি, কন্যা দান/বলে ডাক স্বর্গে স্থান।' 'সুশীলা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি/মিঠাবোল স্বামীতে ভকতি।' আবার ডাক ডাকিনী শব্দের পুংলিঙ্গ এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নাও হতে পারে। **খনার বচন** সম্পর্কে বলা যায় যে প্রবাদ বাক্যের সংকলন না হয়ে যদি ব্যক্তিবিশেষের সঞ্চয়ন হয় তাহলে সে যুগে রচয়িত্রীর আবহাওয়া, কৃষি ও

জ্যোতিষজ্ঞান বিস্ময় উৎপাদন করে। নারীচরিত্র বা মনুষ্যচরিত্র বিষয়ে খনার বচনে কোন উল্লেখ নেই।

ব্রতকথাগুলি বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্ট হয় এগুলি ব্রাহ্মণ্যধারা বহির্ভূত ব্রাত্য স্ত্রীলোকদের দ্বারা রচিত উৎপাদন ও প্রজননের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতীক-সমূহের পূজাপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে নারীই কথক—পুরোহিত, নারীই শ্রোতা ও ভক্ত। প্রাচীন প্রবাদবাক্য, মেয়েলী ছড়া ও ব্রতকথা, রূপকথা বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজের লোকধারায় নারীর বিশিষ্ট অবদান। ইন্দ্র, চন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণের পরিবর্তে থুয়া-ভাদালি. ধাতা-কাতা, সেঁজুতি ইতু, ইত্যাদি, মেয়েদের দ্বারা সৃষ্ট দেবতারা তাঁদের কাছেই পূজাভোগ পেতেন। এইসব কথা ও কাহিনীগুলিতে নারীর কৈশোর ও যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও পারিবারিক জীবনের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। রূপকথাগুলির ভাষাও অত্যন্ত প্রাচীন। এইসব কাহিনীতে মধুমালা, কাঞ্চনমালা, মালঞ্চমালাদের জীবন, যৌবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়ানো স্বতঃস্ফূর্ত, আবেগমণ্ডিত অভিব্যক্তি। এগুলিতে কিছু স্ত্রী-স্বাধীনতা সূচিত হয়, যেমন, 'কুলের বউ কুলনারী আপনা যদি রাখে তো মারে কে?'—(শঙ্খমালা)। এই প্রাচীন, নারী রচিত ও সংরক্ষিত কাহিনীগুলি পরবর্তীকালে হিন্দু ও ধর্মান্তরিত মুসলিম নারীর যুগ্ম উত্তরাধিকারে পরিণত হয়। তাই দেখা যায় ইসলামী বাংলা সাহিত্যে চন্দ্রাবলীর পুঁথি, মধুমালার কেচ্ছা, মালঞ্চকন্যার কেচ্ছা, মালতীকুসুম মালা, কাঞ্চনমালার কেচ্ছা, সখীসোনা, যামিনীভান, ইত্যাদি কিস্‌সা কাহিনীর রচয়িতা মুসলমান পুরুষ, কথক বা গায়ক ও শ্রোতা নারী। এই লোকধারার অন্তর্ভুক্ত ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় নরনারীর মধ্যে সদাজাগ্রত মানবীয় প্রেমের উচ্চ ও নব আদর্শ পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকার সাহিত্যে মেয়েরা নানা বিদ্যায় শিক্ষিত, ছেলেমেয়ে এক পাঠশালায় শিক্ষালাভ করছে; এমনকি মেয়েরা শরীরচর্চা পর্যন্ত করছে। এ পর্যন্ত গ্রামীণ লৌকিক সমাজব্যবস্থায় আর্যীকরণের প্রভাব তেমন অধিক অনুভূত হয়নি।

নাথপন্থী সাহিত্যে বিশেষতঃ ময়নামতীর গানে মাতৃসূত্রী সমাজ-ব্যবস্থার কিছু অবশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এই সাহিত্যে 'আদ্যের আমিনী' নামক এক নারী পুরোহিতশ্রেণী দেখা যায়। তখনও নারী-পুরুষের পরিপূরক সম্পর্কটি কিছু পরিমাণে বজায় রয়েছে। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণকালে রাণী অদুনা বিলাপ করছেন—'তুমি হবু বটবৃক্ষ, আমি তোমার লতা' বা 'নারী-পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ/ শিব বটে যোগিয়া, ভবানী তার সঙ্গ।' তিনি স্বামীকে সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য নানা যুক্তি দেখাচ্ছেন, যেমন,

'খালি ঘর জোড়া টাটি, মারে লাঠির ঘা/বয়সকালে যুবতী রাড়ী নিত কলঙ্ক রা।' সবচেয়ে বড় কথা, তিনি সোজাসুজি প্রশ্ন রাখছেন যে যৌন-সম্ভোগ থেকে কেন বঞ্চিত হবেন?—'ধর্মঘটি যৌবন মুহী কিরূপে রাখিমু?' —ময়নামতী চরিত্র তো মাতৃসূত্রী সমাজের জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি গুহ্যজ্ঞান লাভ করে নিজে স্বামী মাণিকচন্দ্রের গুরুপদ পাবার অভিলাষ ব্যক্ত করছেন।—তাঁর দাপট কি!—'তুড়ু তুড়ু করি ময়না হুঙ্কার ছাড়িল / যত মুনিগণে সে হুঙ্কারে নামাইল' এই গীতিকায় ময়নামতীর হাড়িসিদ্ধার সঙ্গে ব্যাভিচারিণী হবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুত্র অভিযোগ করছে, 'আমার পিতাকে মারছেন মা গরলবিষ খাওয়াইয়া' এবং 'আমার পিতার মরণের দিন সতী গেছেন কই?' দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, 'এই কুলটা, পতি-হন্তারিকা, এবং পুত্র-নির্বাসনকারিণী রমণীই গোবিন্দচন্দ্র গীতিকার শ্রেষ্ঠা নায়িকা।' এই প্রকার সাহিত্যে পৌরাণিক আদর্শের অভাব ভাষা সংস্কার প্রভাবমুক্ত ও নারী-ভাবনা অধিক মানবিকতাবোধসম্পন্ন। তবে সহজিয়া, নাথপন্থী ও ও তান্ত্রিকদের গুহ্যমন্ত্রভিত্তিক রহস্যবাদের মায়াজালে ঘেরা জীবনচর্চা ক্রমশঃ সাধারণ মানুষের অবোধগম্য হয়ে পড়ছিল। তবু লক্ষ্যণীয়, এই রহস্যময় লৌকিক সম্প্রদায়গুলি, যাদের জীবনযাত্রার ধারা ও ধর্মমার্গ ব্রাহ্মণ্যবাদের মানদণ্ডে ভ্রষ্টাচারের লক্ষণযুক্ত মনে হলেও, মানবিক বিচারে তারাই ছিল সাম্যভাবনার অমোঘ শক্তি।

[২]

১৪শ শতক থেকে ১৫শ শতকের মধ্যে গ্রামীণ সমাজের সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টায় ক্রমশঃ পৌরাণিক দেবতত্ত্বের বাইরে স্থানীয় দেবদেবী, বিশেষতঃ নারীদেবতার মাধ্যমে লৌকিক ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী, বাশুলী—মঙ্গলকাব্যে নারীদেবতারই প্রাধান্য, এক ধর্মমঙ্গলের শিব ঠাকুরই পুরুষদেবতা। আর এই নারীদেবতা-প্রধান লৌকিক ধারায় শৈব সম্প্রদায়ের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়। শিবভক্ত চাঁদ সদাগর মনসাকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে হেঁতালের আঘাতে তাঁর কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। কেন্দ্রকেতু শীতলার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন। শিবোপাসক ধনপতি সদাগর 'ডাকিনী'-দেবতা চণ্ডীর ঘট পদপ্রহারে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। স্ত্রী-দেবতাদের সঙ্গে পুরুষ-দেবতাদের মাহাত্ম্য নিয়ে বিরোধ মঙ্গলকাব্যে সুপরিপুষ্ট। স্ত্রী-দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করছেন সাহায্য প্রচারক নারীকুল। ব্যাপারটি সহজ নয়, সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এ এক ধরনের আদর্শগত মতবিরোধ এবং

নারীদের আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠার লড়াই। এই দিক থেকে চিন্তা করলে শেষকালে চাঁদ সদাগর মুখ ফিরিয়ে হলেও, মনসাকে স্বীকার করাতে শুধু দেবীর নয়, মানবী বেহুলারও জয় সূচিত হয়। এই জাতীয় সাহিত্য মিশ্রধারার লক্ষণ-যুক্ত; ইতিমধ্যেই গ্রামীণ সমাজে আর্যকরণের প্রভাব কিছুটা অনুভূত হচ্ছে। অবস্থাপন্ন বৈশ্য বণিকশ্রেণীর নায়ক-নায়িকা দ্বারা লৌকিক দেবদেবীদের পৌরাণিক দেবতাদের সমকক্ষ করার প্রচেষ্টা ধরা পড়েছে। লৌকিক দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারে ও স্বীকারে স্থানীয় সামন্তপ্রভু বা রাজতুল্য বণিকশ্রেষ্ঠকে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কালু ডোমকে সেনাপতি করে বা ব্যাধ কালকেতুকে প্রতিনায়ক করে লৌকিক ধারাকেও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

পৌরাণিক ধর্মের প্রতাপে ও প্রভাবে লৌকিক সাহিত্যেও নারীর পরাধীনতা সগর্বে ঘোষিত হয়েছে। যদিও নিম্নবর্গের নারীদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা থেকে থেকে চমক দিয়ে যায়। মঙ্গলকাব্যের দুটি নারী-চরিত্রকে মিশ্রধারার উদাহরণ ধরবো বেহুলা ও খুল্লনা। বেহুলা চরিত্রে দৃঢ়চেতা স্বাধীন রমনীর বাধাবিপত্তি অতিক্রম করার সাহসী প্রচেষ্টার মধ্যে আর্যেতর কৌম জীবনের প্রভাব, মৃতস্বামীর পুনরুজ্জীবনের আচারে ও সফলতায় তান্ত্রিক প্রভাব এবং সতীত্ববোধ ও একনিষ্ঠায় পৌরাণিক আদর্শের মিশ্রণ দেখা যায়। বেহুলা-লক্ষীন্দর কাহিনী অ-পৌরাণিক ও মূলতঃ লৌকিক। তা সত্ত্বেও বেহুলা চরিত্রটির উপর ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিফলনে আদর্শ স্ত্রীর মানদণ্ড আরোপিত হয়েছে—সর্বজয়ী পতিভক্তি, মরণোত্তর পতি-পত্নী সম্পর্ক ও অলৌকিক উপাদানসমূহ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এরই মাঝে মাঝে নির্মল হাস্য-কৌতুকের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ লোকজীবনের চিত্র ঝিলিক দিয়ে যায়—কবি বিজয় গুপ্ত বেহুলার বাসরঘরে এক এয়োর বর্ণনা দিচ্ছেন—'একজন এয়ো আইল তার নাম রাধা/ঘরে আছে স্বামী তার পোষা যেন গাধা।' কেওকাদাস-ক্ষেমানন্দে লক্ষীন্দর মাতা সনকা যেখানে বেহুলাকে বলছেন, 'বালিকা যুবতী বৃদ্ধা পতি যার মরে/বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে।' সেখানে বেহুলার ভ্রাতা তাকে মৃতপতির দেহ বর্জন করে বাপের বাড়ী ফিরে যেতে অনুরোধ করছে, 'মৎস্য মাংস এড়ি বহিন যত উপহার/সর্ব দর্ব দিব আমি তুমি খাইবার। শঙ্খ সিন্দুর মাত্র না পরিবা তুমি/আর নানা অলংকার তোমা দিমু আমি।' এ তো আচারে-বিচারে পিষ্ট করে যুবতী বিধবাকে জীয়ন্তে জ্বালানোর অভিসন্ধি নয়!

খুল্লনা চরিত্রটিও নানা জটিলতার সংমিশ্রণে গঠিত। স্বামীর অনু-পস্থিতিতে সপত্নীকে লহনা কর্তৃক ছাগল চরাতে বাধ্য করার মধ্যে লৌকিক

ধারাটি সুস্পষ্ট। প্রারম্ভে লহনা খুল্লনার সদ্ভাবে বিস্ময় প্রকাশ—'দু সতীনে প্রেমবন্ধ/দেখিয়া লাগয়ে বন্ধ। সুবর্ণে জড়িত যেন হীরা।' দুর্বলা দাসীর সম্পর্ক ভাঙ্গার অভিসন্ধি—'সাপিনী, বাঘিনী, সতা পোষ নাহি মানে।'—ইত্যাদিতে গ্রামীণ সমাজের মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। আবার সতীত্ব ধারণা সম্পূর্ণই পৌরাণিক—যৌনশুচিতা যে কেবল নারী কর্তৃক অবশ্য-পালনীয়, লৌকিক সমাজেও এ ধারণা অনুপ্রবেশ করেছে। স্বামী ধনপতি সদাগর সিংহলে বাণিজ্য যাত্রার প্রাক্কালে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী খুল্লনার গর্ভের সন্তানের দায়িত্ব স্বীকার করে 'জয়পত্র' লিখে দিলেন—'সন্দেহ ভঞ্জন পত্র করিলা নির্মিত।—যখন তোমার গর্ভ হইল ছয়মাস/সেইকালে নৃপাদেশে যাই পরবাস।' তাও তিনি গৃহে প্রত্যাগমনের পর খুল্লনার বিরুদ্ধে আত্মীয়, প্রতিবেশী ঘোঁট পাকালেন—যুক্তিটা মনে রাখার মত—'শুষ্ক জলে মৎস্য আর নারীর যৌবন/অযত্নে পাইলে তাহা ছাড়ে কোন জন'! স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করলে 'অষ্টপরীক্ষা' নামক এক অপমানসূচক ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। এই পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল, যদি না স্বামী অর্থদণ্ড দিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড দিয়ে উদ্ধার না করে স্ত্রীকে অষ্টপরীক্ষা দেওয়ানোতেই পতিদেবতারা উৎসাহী ছিলেন। অর্থদণ্ড মেনে নিলে অপরাধ স্বীকার করা হবে, এই আশঙ্কায় মেয়েরা অষ্টপরীক্ষা দিতে রাজি হতেন। বেহুলা ও খুল্লনা উভয়কেই এই উপলক্ষে ষষ্ঠীবরের রামায়ণে সীতার সক্ষোভ উক্তি মনে পড়ে—'বারবার আনি আমা দোষ পুনি পুনি/নগর চত্বরে যেন কুলটা রমনী।' এঁদের তুলনায় ব্যাধনারী খুল্লনার জীবন, বারোমাসের দুঃখ-দারিদ্য সত্ত্বেও, অনেক সহজ, স্বাধীন।

লৌকিক জীবনে সনাতন ধারার অনুপ্রবেশের ভূরিভূরি নিদর্শন মেলে। পুরুষদের তো কথাই নেই, স্ত্রীলোকেরাও, কথায় কথায় শাস্ত্রের নজির দিচ্ছেন—লহনা দ্বেষপরবশ হয়ে খুল্লনাকে স্বামীগৃহে যেতে নিষেধ করলে তিনি সপত্নীকে শাস্ত্রের দোহাই দিচ্ছেন, বেহুলাও স্বামীর শব ত্যাগ করার অনুরোধের বিপক্ষে অকাট্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাচ্ছেন, ধর্মমঙ্গলের রঞ্জাদেবীও শাস্ত্রীয় যুক্তি ব্যবহার করছেন, এমন কি ব্যাধনারী ফুল্লরাও ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধে শাস্ত্রীয় নীতির উল্লেখ করছেন। ধর্মমঙ্গলের নায়ক লাউসেন সুরীক্ষা নটী ও অস্পৃশ্যা নয়ানীকে দেখে মন্তব্য করছেন, 'বলিতে উচিত বাণী মনে কিবা দুখ/জন্মাবধি নাহি দেখি অসতীর মুখ।' কবি রূপরাম স্বয়ং পৌরাণিক পঞ্চসতীর উদাহরণ দিয়ে এই প্রকার ঘৃণার মনোভাবের প্রতিবাদ করছেন—'দ্রুপদনন্দিনী ছিল বাখানিয়া গাই/যার পতি বলিত পাণ্ডব পঞ্চভাই।

অহল্যার বারতা শুনেছি রামায়ণে/পরিণামে মুক্ত হইল শ্রীরাম চরণে।' বনিতার উপর পতির অত্যাচার দেখে ফুল্লরা বলছেন, 'দোষ দেখি নাক কাটে/ উৎসাহে বসায় খাটে/দণ্ডে রাজা বনিতার পতি।' একাধিক বা বহুবিবাহের ফলে সপত্নী-বিদ্বেষে জর্জরিত, দাম্পত্যজীবনে অবহেলিত স্ত্রীরা স্বামীদের বশীভূত করার উপায় চিন্তা করতেন বন্ধ্যার সন্তান লাভের জন্য, পুত্রবতী হবার জন্য মারণ-উচাটন-বশীকরণ, ইত্যাদি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিকৃত আচার-আচরণ অভ্যাস করতেন। মুকুন্দরাম লিখেছেন, 'কচ্ছপের নখ আনো, কুম্ভীরের দাঁত/কোটরের পেঁচা আনো, গোধিকার আঁত'। মেয়েদের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—'ঘুচায়ে মনের রোষ/কর পতি পরিতোষ' (মাধবাচার্য)। দাম্পত্য কলহ ও পতিনিন্দা, শাশুড়ী-ননদের হাতে নিগ্রহ, সপত্নীবিদ্বেষ, যৌবন হারালে স্বামীর অবহেলা যে সাহিত্যের বিষয়বস্তু তা কঠিন বাস্তব থেকে আহরিত, নিছক কবি-কল্পনা নয়। নারী জীবনের দৈনন্দিন তুচ্ছতার প্রতি বিদ্রূপের ভঙ্গীতে সহদেব চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গলে বলছেন, 'শিলনোড়াতে কোন্দল বান্ধিল, সরিষা ধরাধরি করে/চালের কুমুড়া গড়ায়ে পড়িল, পুঁইশাক হাঁসিয়া মরে।' অবশ্য এ জাতীয় সাহিত্যে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে সুরীক্ষানটীর বিদ্যাবত্তা ও শিল্প-জ্ঞান, লীলাবতীর জালপত্র লিখন ও খুল্লনার লেখাপড়ার জ্ঞান, মন্ত্রীকন্যা বিষয়ার তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, ব্যাধপত্নী ফুল্লরার শাস্ত্রজ্ঞান, রীতিমত নারী-শিক্ষা সূচিত করে। লক্ষ্মী ডুমনি ও রাজকন্যা কানেড়ার অবাধ চলাফেরার মধ্যে কিছু স্বাধীনতার আভাস মেলে।

লৌকিক ধারায় বারমাস্যা'গুলি স্ত্রীলোকের সুখদুঃখের রোজনামচা—চণ্ডী-কাব্যে ফুল্লরা ও খুল্লনার বারমাস্যা, পদ্মাপুরাণে পদ্মাবতীর বারমাস্যা, পদ-কল্পতরুতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা, বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যার বারমাস্যা, আলাওলের পদ্মাবতীতে নাগমতীর বারমাস্যা, শ্রীধর ও শেখ কমরালির রাধার বারমাস্যা, সেখ জালালের সখীর বারমাস্যা—পরবর্তীকালেও সাহিত্যের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

[৩]

বৌদ্ধ পালবংশের পতন ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনবংশের অভ্যুত্থানের সঙ্গে আদিশূরের কৌলিন্যপ্রথা ও বল্লালসেনী স্মার্ত্ত অনুশাসনের মাধ্যমে পুনরুদ্দমে বাংলায় আর্যীকরণ শুরু হয়। কুলজী সাহিত্যে দেখা যায়, মুসলিম শাসনের পটভূমিকায় ১৫শ শতকের মধ্যভাগ থেকে বর্ণহিন্দুসমাজের নানা স্তরে সংস্কার আন্দোলন দেখা দেয়। প্রচলিত ধর্ম ও সমাজব্যবস্থাকে প্রাচীন-কালের স্মৃতি শাসনের সঙ্গে যুক্ত করে পুরুষ প্রাধান্যের সুবিধাজনক ব্যাখ্যা

দেবার অপচেষ্টা এ যুগের শাস্ত্রজ্ঞদের বৈশিষ্ট্য। লক্ষ্যণীয় যে ইতিমধ্যেই লৌকিক সমাজে নারীস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পরম্পরা অনুযায়ী এখন স্মার্ত্ত সমাজকর্তারা উচ্চবর্গের সমাজে বাল্যবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা, বিধবা নির্যাতন ও সহমরণের মাধ্যমে নারীনির্যাতনকে এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করলেন পৌরাণিক আদর্শে, মনুর নির্দেশে, স্মার্ত্ত অনুশাসনে প্রবল প্রতাপে পুরুষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। এই ব্যবস্থায় মিশ্রধারার সামাজিক পদ্ধতির দায়ও আর রইল না। দু'টি সূত্রে পৌরাণিক আদর্শ সমাজের বিভিন্ন স্তরে অনুপ্রবেশ করল—একটি স্মৃতিশাস্ত্র ও অপরটি অনুবাদ (পুরাণের ও মহাকাব্যের) সাহিত্য। উচ্চবর্গীয় সমাজে স্মৃতিশাসন ও লৌকিক স্তরে মহাভারত, রামায়ণ, ইত্যাদির অনুবাদের মাধ্যমে এই মতবাদ বিস্তারিতভাবে প্রচারিত হয়।

অনুবাদ সাহিত্যে একটি ঐতিহাসিক চরিত্রের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যিনি ছিলেন এক মহিলা-কবি। তিনি মনসামঙ্গলের সুবিখ্যাত কবি দ্বিজ বংশী-দাসের কন্যা চন্দ্রাবতী। প্রথম যৌবনে পাঠশালার সহপাঠী জয়চন্দ্রের তিনি প্রেমে পড়েন। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে কবিতা লিখতেন। এঁদের দু'জনের কিছু কবিতা বংশীদাসের মনসামঙ্গলে (১৫৭৫) পাওয়া যায়। কিন্তু জয়চন্দ্র এক মুসলিম যুবতীর প্রতি আসক্ত হয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন। ভগ্নহৃদয় চন্দ্রাবতী কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করেন ও পিতৃ-আজ্ঞায় রামায়ণ রচনায় মনোনিবেশ করেন। পরে অনুতপ্ত জয়চন্দ্র সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে তাকে পত্র লিখলে তিনি প্রত্যুত্তর দেন, কিন্তু সাক্ষাতে অস্বীকার হন। পরিণতিতে জয়চন্দ্র ফুলেশ্বরী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা কেন তাঁর পূর্বপ্রেমিককে প্রত্যাখ্যান করে-ছিলেন ?—বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে না ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে ?—জানতে পারলে সে যুগের এক উচ্চবর্গীয় বিদুষী মহিলার সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে কিছু জানা যেত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি উচ্চশিক্ষিত, কবিত্বশক্তির অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর রামায়ণে সীতা দারুণ সতী।

১৬শ শতকের আর এক কবি দ্বিজ মধুকণ্ঠের রামায়ণে স্মৃতিশাসিত সংস্কার যুগের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় যেখানে স্ত্রীর উপর স্বামীর আধিপত্য প্রচার ও সহমরণের প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে।—'যুবতীর পতি গতি/পতি গুরু মৃত্যু-সাথী/গুরুবাক্য লঙ্ঘিবে কেমনে। পতি যুবতীর ত্রাতা/জীবনযৌবন কর্তা/মরিলে মরিবে তার সনে।' স্মার্ত্ত মৌলবাদীদের প্রচারকের ভূমিকায় এক কবিকে দেখা এক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনক সত্য!—এই জাতীয় অনুবাদ সাহিত্যের গ্রামাঞ্চলে বিস্তারিত প্রচার এবং প্রভাবের উল্লেখ পাওয়া যায় এমনকি মুসলিম

লেখকদের লেখায়ও।—ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজেও সীতার দুঃখে চোখের জল ফেলার মানুষ ছিল—যারা 'খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে'। এক মুসলমান ফকিরের গানে পাওয়া যাচ্ছে—'সতী নারীর পতি যেন পর্বতের-চূড়া/অসতীর পতি যেমন ভাঙ্গা নায়ের গুড়া।'

স্মৃতিশাস্ত্রে নারীর স্থান নির্ণয় করতে গেলে অসমতা, অবিচার, অত্যাচারের মহাভারত রচনা করা যায়। এই সমাজাদর্শের মূল কথা প্রবল পুরুষের প্রভুত্ব ও দুর্বল নারীর দাসত্ব। সতীত্ব, অর্থাৎ যৌনশুচিতা, সর্বদা শুধু নারীরই পালনীয়, এক 'ইনসেস্ট' বাদে পুরুষের যে কোন স্খলন বা ব্যভিচারের বিধান প্রায়শ্চিত্ত, পরনারী, শূদ্রনারী, রজঃস্বলা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সহবাস করলে প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া অন্য শাস্তির প্রয়োজন নেই। বিবাহপ্রথায় চরম অবিচার ও অসমতা—লক্ষ্যণীয় মনুর নির্দেশ অনুযায়ী নব্য স্মার্তরা নারীর বাল্যবিবাহ বাধ্যতামূলক করেন—ঋতুমতী কন্যার বিবাহ দিলে পিতার অখণ্ড নরকবাস ও পতি শূদ্রে পরিণত হত। পৌনর্ভবা অর্থাৎ অপরের বাগদত্তা, এমন কি মনোদত্তা কন্যাও বিবাহে বর্জনীয়া। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে যৌন-শুচিতার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বৈষম্য দেখা যায়—অসতী স্ত্রী বিনাশর্তে, বিনাবিচারে পরিত্যজ্য, ব্যভিচারী স্বামীর প্রায়শ্চিত্তে নিষ্কৃতি। সত্য বলতে কি, এ শাস্ত্রে 'অসতী' শব্দের কোন পুংলিঙ্গ নেই! নারীর সম্পত্তিতে অধিকার কোন স্মার্ত পণ্ডিত স্বীকার করেন নি। এক জীমূতবাহন তুলনায় উদার দুটি নীতি গ্রহণ করেছিলেন—তাঁর 'আধিবেদনিক' অনুযায়ী পতি অন্য পত্নী গ্রহণ করলে পূর্বপত্নীকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য; 'তুরীয়ক', যার আভিধানিক অর্থ এক-চতুর্থাংশ, অনুযায়ী পুত্রসন্তান হলে বিবাহিতা কন্যার পিতৃসম্পত্তির এক-চতুর্থাংশের উপর অধিকার থাকবে। এই দুটি তুলনায় মানবিক নীতি অন্যান্য স্মৃতিকারদের বিরোধিতায় বাস্তবে কার্যকরী হয়নি। তুরীয়কের অর্থ পরিবর্তন করে করা হয়—কন্যার বিবাহে পিতার অবস্থা অনুযায়ী দ্রব্যাদি দান। সহমরণের অর্থনৈতিক কারণ তো সুপরিজ্ঞাত। স্মার্ত রঘুনন্দন সুচিন্তিতভাবে, নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করে বিধবা-নির্যাতন ও হননের পথটি সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন। খাদ্যাখাদ্য বিচার, নিরম্বু উপবাস, ইত্যাদি কঠোর বঞ্চনা ও আত্মনিগ্রহের গণ্ডী বেঁধে, সহমরণে না পাঠাতে পারলে, বিধবাদের জীবন্মৃত করে রাখার তিনি সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত অনুশাসন দিয়ে গিয়েছেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুসারে লিখিত প্রায়শ্চিত্ত-প্রকাশে ব্রাহ্মণের বিধবাদের ক্রমাগত স্বর্গের প্রলোভন দেখিয়ে সহমরণে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে—যে স্ত্রী সহমরণে যান তিনি স্বামীকে সর্বপ্রকার পাপ থেকে উদ্ধার করেন—এর চেয়ে সৎ সাহস

ও বীরত্বের কর্ম আর নেই। যাগযজ্ঞ-পূজা-অর্চনায় নারীর করণীয় কিছুই নেই।—পতিসেবাই তার পরম ধর্ম, পতি ভিন্ন তার পৃথক স্বত্বা নেই। শুধু ইহলোকে যে সে স্বত্বাহীন তাই নয়, পরলোকেও তার আত্মার স্বাতন্ত্র্য নেই—পতির পুণ্যে তার স্বর্গবাস, পাপে নরক। এই শ্বাসরোধকারী ব্যবস্থার অবরোধ প্রথাকে বিধিবদ্ধ করার ফলে নারীর পরপুরুষ দর্শন হল মহাপাপ। অবগুণ্ঠনকে সতীত্ব ও অবরোধ প্রথাকে কুলমর্যাদা জ্ঞাপনের অভিজ্ঞান করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হল।

[৪]

উপরোক্ত সামাজিক পটভূমিতে সমান্তরালে পঞ্চদশ শতক থেকে ভক্তিবাদের প্রসার হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই যুগকে গৌড়ীয় যুগ বলা হয়। ১২শ শতক থেকে ১৪শ শতকের মধ্যে সমাজে বিস্তারিত তান্ত্রিক প্রভাবে, এমন কি উচ্চবর্গের মধ্যেও নরনারীর যৌনসম্পর্ক বিষয়ে ধারণায় কিছু শিথিলতা দেখা যায়। জয়দেব তার পদাবলীতে স্বীয় পরিচয় দিয়েছেন 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ চক্রবর্তি' রূপে। তাঁকে 'নবরসিক' অর্থাৎ নূতন নাগর অভিহিত করা হয়েছে—বিবাহিতা পত্নীকে দিয়ে এই উপাধি লাভ করা যেত না। পদ্মাবতী মন্দিরের দেবদাসী হয়ে নৃত্য-শিল্পী জীবন আরম্ভ করেন ও পরে জয়দেবের সঙ্গে সহবাস করেন। বিল্বমঙ্গল ও চিন্তা এবং রামী চণ্ডীদাসের কাহিনীতে এই ধারার উত্তরাধিকার লক্ষ্য করা যায়। রামীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হেতু চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভ্রাতা নকুলঠাকুর ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের হাতে-পায়ে ধরে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষায় রাজি করান, হয়ত 'দ্রব্যাদি' দানের নামে পয়সা-কড়ির ব্যবস্থাও ছিল। ব্রাহ্মণরা যখন অন্নগ্রহণে প্রস্তুত হয়েছেন, হঠাৎ সেখানে রানী গিয়ে উপস্থিত হলেন! প্রাচীন পুঁথিটির শেষাংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এই নাটকের পরিণতি কি হল আমরা জানতে পারি না। তবে রানীর এ ধরনের আকস্মিক উপস্থিতিকে আমরা প্রতিবাদের প্রচণ্ড সাহসী প্রচেষ্টা বলে ধরব। তাঁর রচিত পদগুলিতে (চারটি) কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।—'তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, সুহৃৎ কে আছে আর / খেদে রানী কয় চণ্ডীদাস বিনা জগৎ দেখি আঁধার।' পরবর্তীকালে তাঁদের নরনারীর অনাবিল মানুষী প্রেমকে অতিমানবিক, দৈবিক প্রেমরাজ্যের বিষয়বস্তু দাঁড় করাবার অপচেষ্টার কারণ রানী ছিলেন উচ্চবর্গের সমাজে অস্পৃশ্য।

১৫শ শতক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন শুরু হয়। সংস্কারবাদী

নেতৃবৃন্দ তাঁদের জীবোদ্ধার পরিকল্পনায় জাতিধর্মভেদ, অস্পৃশ্যতা ও পুরোহিত তন্ত্র বর্জন এবং অসাম্প্রদায়িকতার নীতি ও পতিতোদ্ধার ধারণা গ্রহণ করলেন। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, তাঁদের নারীর প্রতি প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গীর আপাত-পরিবর্তন। জীবোদ্ধার পরিকল্পনায় নারীর অন্তর্ভুক্তি একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। অদ্বৈত আচার্য শিষ্য বিশ্বম্ভর মিশ্রকে উপদেশ দিলেন—'যদি ভক্তি বিলাইবা/ স্ত্রী শূদ্র আদি মূর্খেরে সে কি দিবা।' চৈতন্য নীলাচল থেকে নিত্যানন্দকে প্রচারের উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে পাঠাচ্ছেন—'যতেক অস্পৃশ্য, দুষ্ট, যবন, চণ্ডাল/ স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম রাখাল'—এদের উদ্ধারের জন্যই নাম প্রচার প্রয়োজন। নারীকে সমাজে তার অবস্থান অনুযায়ী শূদ্র, অস্পৃশ্য, যবন, চণ্ডালদের দলে ফেলা হয়েছে—এখানে 'অধম রাখাল' মানে সমাজের দুর্বলতম অংশ। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের আংশিক কারণ গৌড়ীয় ভক্তিবাদে তাত্ত্বিক পরিবর্তন যা সামাজিক অবস্থানে এনেছিল কিছুটা গুণগত প্রভেদ। গৌড়ীয় তত্ত্বে লক্ষ্মীর স্থান নিলেন রাধিকা—লক্ষ্মী বিষ্ণুর পত্নী, কিন্তু রাধা কৃষ্ণের প্রেমিকা। নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিচারে বৈধী (স্বকীয়া) ও রাগানুগা (পরকীয়া) বিতর্কে রাগানুগার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল। অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে বৈধীর বাইরে নারী-পুরুষের সহযোগিতা স্বীকৃতি লাভ করল। চৈতন্য প্রচারিত ভক্তিমার্গে প্রারম্ভিকই নারী মাতা বা পত্নীভাবে প্রবেশ না করে নায়িকা রূপে আবির্ভূত হলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব নেতৃবৃন্দ, নারী স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে না পারলেও, জীবনচর্চায় নারীর সহযোগিতার অধিকার মেনে নিয়েছেন—সহকর্মিনী না হলেও সহধর্মিনী করে নিয়েছেন। চৈতন্য শ্রীবাস আচার্যকে অনুরোধ করেছেন, "সস্ত্রীক হইয়া পূজ চরণ আমার'। অদ্বৈত্য আচার্য চৈতন্য-দরশন আশে শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপে যাচ্ছেন, স্ত্রী মালিনীকে বলছেন, 'লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান।' গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রতি বছর চৈতন্যকে দেখতে নীলাচলে যান —'সে বৎসর চলিলা আচার্য সঙ্গে অচ্যুত জননী/শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী / শিবানন্দ সঙ্গে চলি তাঁহার গৃহিণী।' ইত্যাদি। এ তা' পথি নারী বিবর্জিতা নীতি নয়, যুগলে নীলাচল ভ্রমণ!

নবগঠিত বৈষ্ণব সমাজে অবরোধপ্রথা পরিলক্ষিত হয় না। যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-আনন্দে তৎকালীন সামাজিক জীবনের প্রতিফলন, সেখানে মেয়েদের উপস্থিতি ও যোগদান, সীমিত হলেও, আশাতীত স্বাধীনতা। মেয়েরা প্রকাশ্যে নৃত্য-গীত-বাদ্যে অংশগ্রহণ করতেন। এমন প্রমাণ মেলে—'নানা বাদ্য ভেরী বাজে, স্ত্রীগণে গায় গীত।' শ্রীবাস অঙ্গনে বৈষ্ণব সম্মিলনে,

ভোজে, কীর্তনে মেয়েরাও উপস্থিত থাকতেন। নরহরি দাস (ভক্তিরত্নাকর) দেখেছেন, 'কীর্তনের মাঝে নাচে কুলের বৌহারি।' চৈতন্যের নেতৃত্বে নগর-সংকীর্তনে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অসংখ্য নগরবাসী অংশগ্রহণ করেছেন—'বুলে স্ত্রী-পুরুষ সর্বলোক প্রভুর সঙ্গে/কেহ কাহ নাহি জানে পরমানন্দ রঙ্গে।' পরস্পর অচেনা স্ত্রী-পুরুষ প্রকাশ্যে এক সঙ্গে উৎসবে যোগদান করছেন—এ ঘটনা স্মার্তদের শ্বাসরোধকারী অবরোধ প্রথার সঙ্গে তুলনা করলে তার দাম বোঝা যাবে।—'নারীগণ হুলাহুলি দিয়া বলে হরি/পতি পুত্র গৃহবিত্ত সকলি পাশরি।' ভাগবত কারণে হলেও গতানুগতিকতা ভুলে মেয়েরা আনন্দ করার কিছু অধিকার পেয়েছেন।

সমকালীন বৈষ্ণব সমাজে নারী-ভাবনায় স্ববিরোধ লক্ষণ অবশ্য কম নয়। তত্ত্বগত অর্থে নায়িকাভাব গ্রহণ করলেও বাস্তব জীবনে পতিব্রতা স্ত্রী ও সর্বত্যাগিনী মাতাই নারীর আদর্শ। চৈতন্য স্বয়ং একাধিকবার সতীত্ব সম্পর্কে বলেছেন—'স্বামী আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতা-ধর্ম', 'প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যে জন/বেশ্যার ভিতরে তারে করিবে গণন।' বৈষ্ণব নেতাদের পত্নীদের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—'অদ্বৈত্য গৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা', 'মহাসতী মুরারি গুপ্তের পতিব্রতা', 'শ্রীলক্ষ্মীর অংশে যত বৈষ্ণব গৃহিণী', ইত্যাদি। লোচনদাস বর্ণিত সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব রাত্রে বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রণয়লীলা—'হাঁসিয়া সম্ভাষে প্রভু আইস আইস বলে/পরম পিরিতি করি বসাইলা কোলে'—কোন বৈষ্ণব পণ্ডিত পরবর্তীকালে স্বীকার করেন নি। বিবাহিতা স্ত্রীর উপর নায়িকাভাব চলবে না, কার্যক্ষেত্রে বৈধীই বিধান। দাম্পত্যজীবনে রাধা অপেক্ষা লক্ষ্মীই নিরাপদ। একটিমাত্র ঘটনায় পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম নিজ কন্যা ষাঠীকে স্বামী পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন—'পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যাজিতে উচিত।'—এক্ষেত্রে অবশ্য 'পতিত' মানে ধর্মভ্রষ্ট, অর্থাৎ চৈতন্যকে অস্বীকার করা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রাণপুরুষ স্বয়ং চৈতন্যের জীবনে নারীর স্থান বিচার করলে দেখা যায় শচী পুত্রার্থে সর্বত্যাগিনী মাতার আদর্শ ও বিষ্ণুপ্রিয়া ভাগবত কারণে পতি পরিত্যক্তা অভাগিনী পত্নীর উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে চিরাচরিত ধারায় নারীর ভূমিকা অপরিবর্তিত। চৈতন্যের জীবনে মায়ের স্থান সর্বোচ্চে, এমন কি সন্ন্যাসী অবস্থাতেও। মায়ের স্নেহ যত্নের ঋণ তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন, সাগ্রহে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন—'দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার /আমি কোটিকল্পে নারিব শুধিবার', 'বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বার বার /তোমার সকল ভার আমার আমার।' শচী কিছুটা

নিজগুণে—ধৈর্যে, সপ্রতিভতায় উজ্জ্বল চরিত্র ; বিষ্ণুপ্রিয়া সে তুলনায় নিষ্প্রভ, অবহেলিত—তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের বিশেষ খবর পাওয়া যায় না। সন্ন্যাসোত্তর কালে চৈতন্য তাঁকে মাতার বধূ বলে সবিনয় উল্লেখ করেছেন ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুরোধে নিজ পাদুকা পূজার অধিকার দিয়েছেন। চৈতন্য সনাতনকে বলে-ছিলেন—'আমি তো সন্ন্যাসী, আমার সমদৃষ্টি ধর্ম।' কিন্তু নারীর ব্যাপারে তাঁর অভেদ-দৃষ্টি সর্বদা কার্যকরী হয় নি। শ্রীনিবাস আচার্যের অনুরোধে চৈতন্যভক্ত ছোট হরিদাস মাধবী দেবী নামে এক বৈষ্ণবীর নিকট হতে ভক্তভোজনের জন্যে এক মন উৎকৃষ্ট চাল নিয়ে আসেন। আপাতনির্দোষ এই ঘটনায় চৈতন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন—'ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া / ইন্দ্রিয় চরাইঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।' তাঁর বর্জনের ফলে ছোট হরিদাস আত্মহত্যা করেন। অথচ, সুন্দরী যুবতী বিধবার সন্তান এক ওড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার চৈতন্যের কাছে যাতায়াত করত, বোধহয় তার মা-ও ; কারণ, দামোদর চৈতন্যকে সাবধান করছেন—'যদ্যপি ব্রাহ্মণী হয় তপস্বিনী সতী / তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী। তুমি হ নবীন যুবা পরম সুন্দর/লোক কানাকানি বাতে দেহ অবসর।' —অন্যদিকে আবার সংস্কারবাদীরা পতিতোদ্ধার পরিকল্পনায় গণিকাদেরও অন্তর্ভুক্ত করেন। যবন হরিদাস হীরা নামে এক বারনারীকে উদ্ধার ক'রে বৈষ্ণবধর্মে গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে সে 'প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইলা পরম মোহান্তি / বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি।' দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে স্বয়ং চৈতন্য সত্যবালা, লক্ষ্মী, বারমুখী, প্রমুখ বারনারীদের উদ্ধার করেন—'সত্যেরে বাহুতে বাঁধি বলে বল হরি', ইত্যাদি। এইসব পরস্পরবিরোধী ঘটনা বিচার করলে বৈষ্ণবদের নারী-ভাবনায় স্ববিরোধ ও বৈপরীত্যের সমাবেশ দেখা যায়।

এ যুগের এক চরম বিতর্কিত নারীচরিত্র শ্রীবাস আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী। তিনি বাল্যবিধবা ছিলেন, যৌবনে তাঁর গর্ভে কবি বৃন্দাবন-দাসের জন্ম হয়। এই রহস্যাবৃত জন্মবৃত্তান্তকে বৈধরূপ দান করার জন্য পরে অলৌকিকত্ব আরোপ করে প্রচার করা হয়, চৈতন্যের চর্বিত তাম্বুল খেয়ে নারায়ণীর গর্ভোদয় হয়েছিল। তাঁর পুত্র বৃন্দাবনদাস কার্যকারণ সম্পর্ক উল্লেখ না ক'রে লিখেছেন—'নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন/তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীবৃন্দাবন।' যুবতী বিধবার এই যৌবনরহস্য তৎকালীন বৈষ্ণব-সমাজ কিভাবে গ্রহণ করেছিল, তা সুস্পষ্ট নয়। সমকালীন ও পরিবর্তী প্রতিটি বৈষ্ণব লেখক বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন ; শুধু, বৃন্দাবনদাস মাতৃপরিচয় ছাড়া পিতৃপরিচয় দেন নি। তবে জন্মরহস্য তাঁর সামাজিক জীবনকে কলঙ্কিত

করলে, তিনি শুধু সুপণ্ডিত ও ভক্ত বলে নয়, 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' নামে খ্যাতিলাভ করতে পারতেন না, যদি না ব্যাস নামটি মাতৃসূত্রে দ্বর্থ্যবোধক হয়।

নিত্যানন্দ ও তৎপুত্র বীরভদ্র গঠিত বৃহত্তর বৈষ্ণবসমাজে কোন কোন মহিলা নেত্রীস্থান অর্জনে সক্ষম হন। তাঁরা নিজ নিজ শাখা প্রতিষ্ঠা করে সমষ্টি গুরুর স্থান অধিকার করেন। অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী সখীভাব সম্প্রদায় গঠন করেন। সীতাগুণকদম্ব ও সীতাচরিত জীবনী দুটি তাঁর প্রভাব সূচিত করে। নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবীদেবী সম্পর্কে প্রেমবিলাসের লেখক (নিত্যানন্দদাস) বলেছেন—'মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবী ঈশ্বরী।' তাঁকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের এক আদি গুরু ধরা হয়। শ্রীনিবাস আচার্যের দ্বিতীয়া পত্নী গৌরীদেবী পুরুষ ভক্তদের দীক্ষাদান করতেন। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হিমলতাদেবীও জাহ্নবাদেবীর মত বৈষ্ণব মহান্তি বলে গণ্য ছিলেন। প্রায় প্রতিটি বৈষ্ণবের মাতা ও মাতৃকুলের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের এই বিশেষ ধারায় কৌলিন্য প্রথা, বহুবিবাহ (দুই স্ত্রী আছে), বিধবা নিপীড়ন, সহমরণ, ইত্যাদির প্রমাণ নেই। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, চৈতন্য, প্রমুখের বিবাহবৃত্তান্ত পড়লে বাল্যবিবাহ মনে হয় না।

১৬শ শতকের শেষভাগ থেকে বৈষ্ণব মতবাদ দুটি ধারার বিভক্ত হয়ে যায়—এক, গোস্বামীমত বা বৈষ্ণবীয় মৌলবাদ, যার সঙ্গে বাস্তবে সনাতন ধর্মের পার্থক্য ক্রমশঃ কমতে থাকে, দুই, সহজিয়ামত যা' নিঃসন্দেহে পরকীয়াবাদের ভিত্তিতে চিরকালীন লৌকিক জীবনধারার প্রবাহ। ১৭শ শতক থেকে সহজিয়ারা রাগানুগার তাত্ত্বিক অংশ বর্জন করে পরকীয়াবাদকে নারী-পুরুষের অবাধ যৌন সম্পর্কের সামাজিক ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেন। নিম্নবর্গের সমাজের উপর এই মতবাদ ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রাথমিক পর্যায়ে সহজিয়া গুরুরা চৈতন্যকে বাদ দিয়েছিলেন ; কিন্তু পরে বৈষ্ণবতত্ত্বের মূলধারায় সংশ্লিষ্ট থাকার প্রচেষ্টায় চৈতন্যকে দিয়ে আরম্ভ করা হয়।—'বাহেতে প্রকৃতি নিন্দা অন্তরে তন্ময়/বিধবা ব্রাহ্মণী সঙ্গে প্রয়োজন হয়।' ইত্যাদি। বিবর্তবিলাসে আকিঞ্চনদাস বলেছেন—'বেদশাস্ত্র পুরাণেতে স্ত্রীসঙ্গ বারণ কেমনে/বারণ তাহা না বুঝি কারণ।' অবশ্য বিখ্যাত বৈষ্ণব তাত্ত্বিক শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণিতে পতি ও উপপতির পার্থক্য দেখিয়ে বলেছিলেন—(অনুবাদ) 'শাস্ত্রমতে কান্তার যেই করে পাণিগ্রহে/সেই ভর্ত্তা হয় তারে পতি শব্দ কহে। পরকীয়া নারী সঙ্গে করয়ে বিহার/সদা প্রেমবশ উপপতি নাম তার।' এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাহলে কৃষ্ণ রাধার উপপতি। অষ্টাদশ শতক থেকে কিশোরীভজা, কর্তাভজা, সখীভাব, আউল-বাউল, সাঁইদরবেশিয়া,

সাহেবধনী, খুশীবিশ্বাসী, বলরামশাহী, লালনশাহী, প্রভৃতি সহজিয়া সম্প্রদায়গুলির বহুল প্রচলন হয়। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বিবাহপ্রথা সরলীকরণ (কণ্ঠীবদল) বা বর্জন, যৌনশুচিত্ব ও সতীত্ব ধারণার পরিবর্তনের কার্যকরণ বিশ্লেষণের পরিবর্তে সামাজিক ব্যভিচার ও বিকারের প্রতি অতিমাত্রায় দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বৈষ্ণব আখড়াগুলিতে নারী-পুরুষের যৌথ জীবনযাত্রার সম্পর্কে যথাযথ সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হলে তৎকালীন লৌকিক সমাজে নারীর যথার্থ স্থান নিরূপণ সহজসাধ্য হবে।

এই আলোচনায় মধ্যযুগে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারী-ভাবনা ও নারীর অবস্থানের অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধান, সচেতনতা সত্ত্বেও, সীমাবদ্ধতা হেতু সম্ভব হয়নি। কৌমগত লোকজীবনের সঙ্গে গ্রামীণ লৌকিক জীবনচর্চার সঙ্গে নাগরসমাজের পার্থক্য সুস্পষ্ট ও কারণ প্রধানত অর্থনৈতিক। কৌম-জীবন আর্যীকরণের পূর্ববর্তী অবস্থা ; আর্যীকরণের ফলে গ্রামে লৌকিক জীবনচর্চার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল সনাতন ধর্মের রীতিনীতি। যে সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থায় নারী-সহযোগিতা ছিল অপরিহার্য, সেখানে তাদের স্বাতন্ত্র্যও ছিল অনিবার্য। যে ব্যবস্থায় ভূমির উপর অধিকার সাব্যস্ত হত পুত্র সন্তান দ্বারা, সেখানে নারীর স্বভাবতই একমাত্র আদর্শ হল পুরুষের (পিতা-পতি-পুত্র) অধীনে থেকে সতীত্ব, অর্থাৎ যৌনশুচিতা, বজায় রেখে পুত্রদান করা এবং অপমান, অবিচার ও অবদমনের শিকার হওয়া।—মুসলমান বিজয়ের ফলে আলোচ্য যুগে ইসলামী ধারা অনুপ্রবেশ করায় নারীর স্থান পরিবর্তিত হয়েছিল কি না, তা' একটি বিতর্কিত বিষয়। মুসলমান শাসনামলে বর্ণহিন্দু-সমাজে যে সংস্কার প্রচেষ্টা দেখা যায় তা'তে সর্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত হানা হয় নারী মর্যাদার উপর। পঞ্চদশ শতক থেকে নব্য স্মার্ত সমাজকর্তারা পুরাতন স্মৃতি নারীর উপর আক্রমণাত্মক ব্যবস্থাকে ইসলামী প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। স্মার্তদের কঠোর বিধিনিষেধ আক্রান্ত অনুশাসন যদি ইসলামী প্রভাবের বিরোধিতা করার নামে তৈরি হয়ে থাকে, তবে নারীর ক্ষেত্রে সে ছিল একান্ত নেতিবাদী, অত্যন্ত হানিকর, প্রায় বিধ্বংসী ব্যবস্থা মুসলিম বিজয়ের বহু পূর্বেই যে সমাজে নারীর স্থান অবনমিত হয়েছিল সে বিষয়ে ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য বিশদ ও প্রামাণিক আলোচনা করেছেন। মুসলমান শাসনকালে বিদেশী পর্যটকদের লেখায় ইব্‌নে বতুতা ক্রীতদাসী প্রথা, বারবোসা উপপত্নী ও অবরোধ প্রথা, নিকোলো কন্তি সহমরণের অনুপুঙ্খ

বিবরণ (প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া আশ্চর্য নয়) দিয়েছেন, চীনা দোভাষী মা হুয়ান পাণ্ডুয়ার রাজপথে মেয়ে বাজীকরদের উল্লেখ করেছেন, যারা প্রকাশ্যে খেলা দেখিয়ে ধনী নির্ধন নির্বিশেষে চিত্ত-বিনোদন করত। কিন্তু এই যুগে নিম্নবর্গে ধর্মান্তরণ, মুসলিমরাজসেবী মধ্যস্বত্বভোগী সামন্তশ্রেণী ও আমলাতন্ত্রের উপর ইসলামী প্রভাব, ইত্যাদি, স্মার্ত্ত অনুশাসকদের প্রাচীন স্মার্ত্ত অনুশাসকদের প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে নারীর ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক ব্যবস্থাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার সুযোগ ক'রে দিয়েছিল; এবং উচ্চবর্গের মধ্যে ইসলাম বিরোধিতার নামে সে সুযোগ তাঁরা সফলতার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। অপরদিকে ইসলামী সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্বের সমাজাদর্শ ছিল একান্তই পুরুষ-ভিত্তিক। পরন্তু পর্দাপ্রথা, উপপত্নী প্রথা, ক্রীতদাসী প্রথা, একাধিক উপপত্নী প্রথা, ক্রীতদাসী বিবাহে ধর্মীয় সমর্থন, বিবাহবিচ্ছেদে পুরুষের একপক্ষীয় অধিকার ইত্যাদি, স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করা ছাড়া, নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রগতিমূলক ধারা সংযোজন করেনি। যে শিক্ষিত মধ্যবর্তী শ্রেণী গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল, সেই শ্রেণীর সমাজাদর্শের সীমিত মধ্যপন্থায় নারীর ক্ষেত্রে যতটুকু পরিবর্তন পুরুষের পক্ষে নিরাপদ নেতারা ঠিক ততটুকুই অনুমোদন করেছিলেন। ঐটুকু ছাড় দেবার একটি কারণ, বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ ছিল মূলত ধর্মান্ধ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রতিবাদ। স্মার্ত্ত ব্যবস্থায় নারীর অবদমনের বিপরীতে কিছুটা অনুকূল পরিস্থিতি অনুমোদন করে বৈষ্ণব নেতারা সংস্কার আন্দোলনে নারীদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। বাহ্যিক কিছু অধিকার ব্যতিরেকে নারী ভাবনায় ও ভূমিকায়—কন্যা, জায়া, জননী, সতীত্ব, পত্নীত্ব, মাতৃত্ব, বিবাহ-প্রথা, ইত্যাদি ধারণায় বৈষ্ণব মৌলবাদীদের মতের সঙ্গে সনাতন মতের খুব একটা পার্থক্য ছিল না। কিন্তু এটি লক্ষ্যণীয় বিষয় যে নাগর সমাজে ও ধর্মে নারীর স্থান যতই অবদমিত ও সঙ্কুচিত হচ্ছিল, গ্রামীণ সমাজে নিম্নবর্গের দৈনন্দিন লোক-ধর্মচর্চায় ততই নারীর প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমন কি, মুসলিম সমাজেও দেখি যখন উলেমা ও মোল্লা-মৌলভীরা উচ্চবর্গীয় মেয়েদের মসজিদে যাওয়া, জুম্মা প্রার্থনা ও ধর্মীয় উৎসবে গণ-প্রার্থনায় প্রকাশ্যে অংশ-গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন, তখন গ্রামীণ জীবনে দরগা পূজা ও পীরপরস্তি প্রধানতঃ মেয়েদের জন্য মেয়েদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। হিন্দু-মুসলিম একতাপন্থী সহজিয়া সম্প্রদায়গুলির মাধ্যমে নিম্নবর্গের জীবনচর্চায় নারী অন্য এক মানবিক মাত্রা পায়। ভবিষ্যতে এই দিকটি অনুসন্ধানের ইচ্ছা রইল।

নির্দেশিকা

[পাদটীকা না দিয়ে কেবলমাত্র তথ্যসূত্র নির্দেশিত হয়েছে]

১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধ গান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৮৮ ব. অ.

২ বিজয় গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭

৩ বিপ্রদাস, মনসা বিজয়, সুকুমার সেন সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৬৩

৪ নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭

৫ দ্বিজ বংশীবদন দাস, পদ্মাপুরাণ, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী সংগৃহীত, ঢাকা, ১৯৩৬

৬ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য আকাদেমি, নিউ দিল্লী, ১৯৮৬

৭ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সাহিত্য আকাদেমি, নিউ দিল্লী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭

৮ মাণিকরাম গাঙ্গুলী, ধর্মমঙ্গল, বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১২৬০

৯ রূপরাম, ধর্মমঙ্গল, সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৫১ ব. অ.

১১ রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন, যোগিলাল হালদার সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭

১২ সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল থেকে উদ্ধৃতির জন্য তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্তের 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ও দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ১ম খণ্ড, টীকা দ্রষ্টব্য

১৩ জয়দেব গোস্বামী গীতগোবিন্দ

১৪ চণ্ডীদাসের পদাবলী, নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২১ ব. অ.

১৫ বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য ভাগবত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৬০

১৬ জয়ানন্দ, চৈতন্যমঙ্গল, নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাগ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩১ ব. অ.

১৭ লোচনদাস, চৈতন্যমঙ্গল, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩০৮ ব. অ.

১৮ ঈশান নাগর, অদ্বৈত প্রকাশ, অচ্যুতচরণ চৌধুরী সম্পাদিত, কলিকাতা, ৪১২ গৌরাঙ্গাব্দ

১৯ নরহরিদাস, নরোত্তমবিলাস, রাখালদাস কবিরত্ন সংগৃহীত, কলিকাতা, ১৩৩১ ব. অ.

২০ গোবিন্দদাস, কড়চা, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬

২১ চূড়ামণিদাস গৌরাঙ্গবিজয়, সুকুমার সেন সম্পাদিত, বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা সং, কলিকাতা, ১৯৫৭

২২ মৈমনসিংহ গীতিকা, দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৩

২৩ পূর্ববঙ্গ গীতিকা—২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ঐ, ঐ, ১৯২৫

২৪ ঐ —৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ঐ, ঐ ১৯৩০

২৫ ঐ —৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ঐ, ঐ, ১৯৩২

২৬ কৃত্তিবাস ওঝা, রামায়ণ, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯১৬

২৭ দ্বিজ মধুকণ্ঠ, রামায়ণ, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্তের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে। টীকা ৩৭।

২৮ চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, ঐ

২৯ সৈয়দ আলাওল, পদ্মাবতী, ১ম খণ্ড, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৫০

৩০ দৌলৎ কাজী, সতী ময়না ও লোরা চন্দ্রানী, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত, সাহিত্য প্রকাশিকা, ১ম খণ্ড, বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী, ১৩৬২ ব. অ.

৩১ মুহম্মদ কবীর, মধুমালতী, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, বাংলা অকাদেমি, ঢাকা, ১৩৬৫ ব. অ.

৩২ গরীবুল্লাহ শাহ ফকির, ছহি বড় সোনাভান, কলিকাতা, ১৩৩০ ব. অ.

৩৩ সাধন, ময়নাসত, বাংলা আকাদেমি পত্রিকা, ঢাকা, ১৩৬৬ ব. অ.

৩৪ শেখ ফয়জুল্লাহ গোরক্ষবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, বিশ্বভারতী ১৩৫৬ ব. অ.

৩৫ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৮

৩৬ মুহম্মদ শহীদুল্লা, বাংলা সাহিত্যের কথা, খণ্ড ২, ঢাকা, ১৯৬৫

৩৭ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহ স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫১

৩৮ দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম ও ২য় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৬

৩৯ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৩৫৯ ব. অ.

৪০ অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম খণ্ড, করুণা সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৯৪ ব. অ.

৪১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, কলিকাতা, ১৩৭৩ ব. অ.

৪২ সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, সুলতানী আমল, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৬

৪৩ সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারত—সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৯৪ ব. অ.

৪৪ সুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৫৩ ব. অ.

৪৫ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী, কলিকাতা, ১৩৬৮ ব. অ.

৪৬ বিমানবিহারী মজুমদার, চৈতন্য চরিতের উপাদান, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, ১৯৩৯

৪৭ কল্যাণী মল্লিক, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০

৪৮ ঐ, নাথপন্থা, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৫৭ ব. অ.

৪৯ সুধাময় ভট্টাচার্য, তন্ত্র পরিচয়, বিশ্বভারতী ১৩৫৯ ব. অ.

৫০ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৬৪ ব. অ.

স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলাদেশে নারী জাগরণ (১৯১১-২৯)

ভারতী রায়

উপস্থাপনা

নারীমুক্তিবাদী ঐতিহাসিকদের একটি সতত অভিযোগ এই যে ঃ নারী, মানবপ্রজাতির অর্ধাংশ, প্রচলিত ইতিহাস রচনায় সর্বদাই পরিত্যক্ত বা অবহেলিত ; যা শুধুমাত্রই পুরুষসমাজের ইতিবৃত্ত, তাদের ধ্যানধারণা, সাফল্য অথবা ব্যর্থতাকেই বর্ণনা করে এসেছে।[১] মহিলা পণ্ডিতরা প্রতিপন্ন করেন যে ঐতিহাসিক সাহিত্য—আমাদের সমাজের অন্যান্য সব মতব্যক্তকারী প্রকাশ মাধ্যমের মতোই—পুরুষ এবং নারীকে দুই সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভাজন ; পুরুষদের পরিপ্রেক্ষিতে নারীরা যেন 'অতিরিক্ত/বাড়তি'—এভাবে নারীজাতিকে তুচ্ছ নগন্য প্রমাণ করে পুরুষদের ঔজ্জ্বল্য প্রদান করার মাধ্যমে পুংশাসিত সমাজের পরিচর্যা করে এসেছে।[২] এযাবৎ ভারসাম্যহীন এই ইতিহাসের বৈসাদৃশ্য দূর করার জন্য প্রয়োজন 'প্রিজম'-এর ত্রিপার্শ্বটিকে পুনরালোকিত করা এবং নারীদের দৃষ্টিপথ থেকে নারীদের অবলোকন।[৩] বর্তমান রচনাটি এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে একটি ক্ষীণ প্রচেষ্টা ও নারীমুক্তিবাদী ইতিহাস রচনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে মূল উৎস রূপে মহিলাদের নিজস্ব লেখনী (যা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করে) এবং মহাফেজখানার প্রমাণ ও উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত পুস্তকাদির দ্বারা পুষ্ট ও সমসাময়িক সৃজনমূলক সাহিত্যের (যাতে

[অধ্যাপিকা ভারতী রায় পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের আলোচনাচক্রে বর্তমান শিরোণামে প্রবন্ধ-পাঠের পরে আমাদের কাছে যে ইংরেজি প্রবন্ধটি পাঠান, তাতে ঐ বক্তব্যের বাইরেও 'বাংলা সাহিত্যে মেয়েরা' শীর্ষক একটি অংশ যোগ করা ছিল। তাঁর অনুমতিক্রমে, বঙ্গানুবাদের সময়, আমরা সেই অংশটি বাদ দিয়েছি। বাকী অনুবাদ যথাযথ।

—সম্পাদক]

পরিবর্তিত/প্রচলিত বিশ্বাস চক্রটি প্রতিফলিত হয় এবং সামাজিক ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে যা আকারদান করে) উপর আস্থা স্থাপন করেছে। এই রচনা. আমার পূর্বের রচনা "স্বদেশী আন্দোলন এবং বাংলাদেশে নারী জাগরণ, ১৯০৩—১৯১০"[৪] এর প্রসারণমাত্র এবং পূর্বোক্তটির মতোই বাংলাদেশের হিন্দু মধ্যবিত্ত শহুরে নারীসমাজের মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। প্রথম রচনাটির সমাপ্তি যেখানে অর্থাৎ ১৯১১ সাল থেকে এই রচনাটির সূত্রপাত এবং ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রবহমান। সংক্ষেপক বৎসরটি—১৯২৯ সাল—স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি পর্যায়ের সূত্রপাতের দিক্‌নির্দেশ করে। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৯ সালের শেষ দিনটিতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস লক্ষ্য[৫] হিসেবে পূর্ণ স্বরাজ (সম্পূর্ণ স্বাধীনতা) এর কথা ঘোষণা করে এবং ১৯৩০ সালে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়—আইন অমান্য আন্দোলনে।[৬] ১৯২৯ সাল, ভারতীয় নারী ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একটি দিক্‌চিহ্ন ; এই বৎসরেই শিশু বিবাহ বিরোধ আইন[৭] কার্যকর করার ফলে। মহিলাদের শিক্ষালাভের সুযোগ এবং বিবাহের পূর্বে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অবরুদ্ধ দুয়ারটি উন্মুক্ত হয়। এক বিস্ময়কর যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয় যেমন ১৯১১ সালে ব্রিটিশ রাজের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় (অবশ্যই বাংলাদেশের শক্তিশালী স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া), ফলস্বরূপ ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক চালচিত্রে বাংলাদেশের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে ; ১৯২৯ সালের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব-রাশি এই উপমহাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে হস্তান্তরিত হয় এবং চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর সর্বতোরূপেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্বিতীয় সারিতে উপবেশন করে।

প্রকল্প

এই রচনার উদ্দেশ্য হল : ১৯১১ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলাদেশের নারীচেতনার জাগরণ পদ্ধতিটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা। স্বাধীনতা আন্দোলনকে কখনোই একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ—এভাবে দেখা উচিত নয়। বরং এক অখণ্ড আন্দোলনের অংশমাত্র যা ব্রিটিশদের[৮] রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যর (ভারতীয় ও ইংরাজ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—উভয়েই একে অপরের মধ্যে সম্মিলিত হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে) প্রতি রাজনৈতিক,

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভারতীয় প্রত্যুত্তর দ্বারা পরিবেষ্টিত। বর্তমান লেখ্য বিষয়টির উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভারতীয় সমাজে লিঙ্গভেদের অসমতার সম্পর্কে মহিলাদের সচেতনতা এবং বর্ণিত মূল্যব্যবস্থা ও ভূমিকায়ণের মুষ্টি থেকে তাদের স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা যা কিনা ঐতিহাসিকভাবে তাদের স্বার্থর বিরূদ্ধে সক্রিয় ছিল—এভাবেই নারী জাগরণকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তিনটি মূল পরিগ্রহণ থেকে এই রচনার শুরু। প্রথমত, ভারতীয় (অবশ্যই বাঙালীও সমাজ লিঙ্গ-পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এক পিতৃ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা যা মহিলাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। যৌন-অপ্রতি-সাম্যর 'গভীরতম ভিত্তি জনগণের মনকে স্থাপিত' এবং বৈদিক (বিশেষত বৈদিক যুগের পরবর্তী কালে) যুগের সময়কাল থেকেই এক "অসম্ভব শক্তিশালী" সামাজিকীকরণ[৯] প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তিবর্ধন করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া, পুরুষ ও মহিলা—উভয়কেই সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে প্রভাবিত করে। নারীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া যখন পুরুষদের মধ্যে আগ্রাসী মনো-ভাবকে গ্রথিত করে, তখন মহিলাদের মধ্যে জন্ম দেয় পুরুষদের প্রতি দাসত্বের ভাবধারা। শিক্ষাদানের অস্বীকার, অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং বাল্যবিবাহ—নারীজাতিকে আয়ত্তাধীনে রাখার জন্য আবিষ্কৃত মাধ্যমগুলির কয়েকটি মাত্র।[১০]

দ্বিতীয়ত, পুরুষ-নারী অপ্রতিসমতাবোধকে, "বারবাড়ির পৌরুষ আবরণ এবং অন্দর মহলের মেয়েলী ধারা" গোছের এক কৃত্রিম দ্বিবিভাজনের মাধ্যমে বলবৎ করা হয়েছে। গার্হস্থ্য জগতের মধ্যে যুক্ত হয়েছে সীমাবদ্ধ পরিবার ব্যবস্থার মধ্যে ঘটিত প্রতিটি কর্তব্য পালন। অথচ সর্বসাধারণের যে পৃথিবী তার মধ্যে পড়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যার অধিষ্ঠান ও প্রতিক্রিয়া সীমায়িত পরিবার নামক অংশটির অনেক উচ্চে এবং মানুষ অথবা বস্তুর উপর অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত।[১১] বর্ণিত পুংমণ্ডলের মধ্যে সম্ভ্রম ও কর্তৃত্ব এবং স্ত্রীমণ্ডলের মধ্যে প্রান্তিকরণের বণ্টন, সমাজে মহিলাদের অধঃপতনকে ত্বরান্বিত করে।

তৃতীয়ত, প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির মধ্যেকার পক্ষপাতের বিরুদ্ধে নারী-চেতনার জাগরণ বিরূদ্ধ লড়াইয়ের প্রথম পদক্ষেপ কিন্তু একমাত্র পদক্ষেপ নয়। মনুষ্য সম্পর্কিত প্রতিটি বিচার্য বিষয়ই পরস্পরযুক্ত এবং হাজার বছরের শোষণ ও কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য নারীজাতির সংগ্রাম বস্তুত মানব

প্রজাতির সংগ্রামেরই অংশমাত্র এবং কদাচই একে পৃথকতায় বিচার করা উচিত নয়।

আমার প্রকল্প থেকেই এই পরিগ্রহণগুলির উৎপত্তি। রাজনীতির পুরুষশাসিত বহিআঙ্গিনায় মহিলাদের প্রবেশ দুই পৃথক স্তরের বহু অ-স্বাভাবিক দ্বিবিভাজন ও সামাজিকতায় নির্মিত লিঙ্গ—প্রতিসাম্যহীণতাকে অপসারিত করবে। আমি স্থিরনিশ্চিত যে, শাসিত বঙ্গদেশে, সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন দুটি অ-সংযুক্ত ঘটনা নয়, বরং জাতীয়তাবোধের একই কর্মপ্রকাশের দুটি মুখমাত্র; একের মধ্যেই ছিল অপরের অবস্থান। এবং রাজনৈতিক সচেতনতা সামাজিক চেতনাবোধের সঙ্গে ছিল গভীরতায় সম্পৃক্ত। একবার মহিলারা "লক্ষণরেখা (অলঙ্ঘনীয় গণ্ডিটি) অতিক্রম করল, (দেখা গেল) তাদের চেতনজগতে এক বিস্ময়কর রূপান্তর।"[১২] তাছাড়াও, গার্হস্থে প্রাপ্ত দাসত্ববোধের বিরুদ্ধে নারীদের ক্ষোভ, রাজনৈতিক দাসত্বের অপমানজ্বালা উপলব্ধ করতে তাদের সাহায্য করে। সৃজনমূলক সাহিত্যে এ বিষয়টি দৃঢ়তায় উপস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কিভাবে তার পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম হৃদয় দিয়ে অনুভব করা সম্ভব—এক পুরুষমানুষের এই প্রশ্নে সুবর্ণলতার, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশের কাহিনী নিয়ে পড়া এক উপন্যাসের নায়িকার, এই উত্তর দিতে দেরী হয় না যে, "এতে এত অবাক হবার কি আছে? আমরা মেয়েরাই যদি সর্বক্ষণ নজরদারীর মধ্যে থাকার অপমানটা না বুঝতে পারি, তাহলে বুঝবেটা কে? আমরাতো (ইংরেজদের) চাকরের চাকরাণী বৈ আর কিছু নই।"[১৩] তবে এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয় যে, পূর্বোক্ত বক্তব্য সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের অনুভবমাত্র বা সর্বস্তরের নারীই রূপান্তরিত হয়েছিল সমমাত্রায় কিন্তু, এদের মধ্যে এক গরিষ্ঠ অংশের সামাজিক রাজনৈতিক অধিকারে সমতালাভের আকাঙ্খা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত এবং পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের সমালোচনা উচ্চারিত।

পটভূমি

ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে, অজ্ঞ, অশিক্ষিত,[১৪] 'ঘোমটা বন্দী', কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গললনাদের অস্তিত্বের স্তরটি ছিল শোচনীয়। কৈলাসবাসিনী দেবীর (জন্ম: ১৮৩৭ সাল) কথায়, মেয়েরা ছিল 'জন্তুর' মতো, নিজেদের অনুভূতিকে কণ্ঠে প্রকাশে অক্ষম। পুরুষরা ভাবত যে "পশুপাখির মতই মেয়েছেলেদের উপর তারা কর্তৃত্ব খাটাবে।"[১৫] এক সর্বজ্ঞাত বিষয় হল এই যে: ঊনবিংশ

শতাব্দীতেই নারীজাতির দুরাবস্থার অবসান ঘটাতে এক আন্দোলনের সূচনা হয় এবং নেতৃত্ব গ্রহণ করে পুরুষরাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহু উৎকৃষ্ট রচনায়[১৬] আলোচিত হয়েছে। এখানে তাদের পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়টি তার নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমিকায় অবলোকন করা উচিত, যা হল মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক নগর—সংস্কৃতির উদ্ভব এবং ঐতিহ্যবাহী জমিদারী প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এক পেশাদার বংশধারার বিকাশ (ভবিষ্যতে এক ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভবে যা স্ফীতকায় হয়ে ওঠে)।[১৭] এই নতুন অভিজাতরা—'ভদ্রলোক'—ঔপনিবেশিক শাসকদের ক্ষুদ্র অংশীদার হয়ে ওঠে। এবং পিতৃতন্ত্রের বিলোপ ঊনবিংশ শতকের নারী অবস্থা সংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য আর রইল না, পরিবর্তে ঔপনিবেশিক জগতে ভদ্রলোকের সামাজিক সাফল্যলাভের জন্য মেয়েদের উত্তম-রূপে গড়ে তোলা হতে লাগল এবং তাদের কাজ হল ভদ্রলোকেদের জন্য 'আলোকপ্রাপ্ত' সন্তানের জন্মদান।[১৮] এজন্যেই ইংল্যাণ্ড থেকে নারী কাঠামোর এক দৃষ্টান্ত আমদানী করা হয়; শুধুমাত্র যুক্ত করে দেওয়া হয় ভারতীয় নারীত্বর বহমান গুণাবলী। বাংলাদেশের নবনারীরা এই অদ্ভুত রূপাকৃতি গ্রহণ করে এবং ঘোষণা করে যে, মেয়েরা বাংলা পড়তে লিখতে শিখবেই এবং কিছুটা ইংরেজী (মূলত শাসকশ্রেণীর সাথে ভাষাগত যোগা-যোগে যাতে তারা সক্ষম হয় সেইজন্যই), গার্হস্থ-নিপুণতা শিখবে এবং হয়ে উঠবে 'সুমাতা' ও 'সুগৃহিনী'।[১৯] কার্যক্ষেত্রে, ভারতীয় ব্যবহার-প্রণালীর গতানুগতিক ধারাটা বর্জিত হল না[২০] অথচ লেখায় এবং কথায় প্রতীচ্য নারীদের দৃষ্টান্ত উচ্চারিত হতে লাগল সর্বক্ষণ।

পূর্ব এবং পশ্চিমের প্রতি এই বিপরীতধর্মিতা, ঊনবিংশ শতকের দীপ্তমান দেশজ সাহিত্য, বাংলাদেশে যার পরিব্যাপ্তি দেখা যায়, তার মধ্যেও লক্ষিত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (জন্ম: ১৮২৪ সাল), সংস্কৃত রূপকাঠামো যিনি বর্জন করেন ও অনুপ্রাণিত হবার জন্য হোমার, ভার্জিল ও মিলটনের অনুসারী হন; তিনি চমকপ্রদ সব নারীচরিত্র সৃষ্টি করেন। মেঘনাদবধ কাব্যে (১৮৬১ সাল) তাঁর প্রমীলা এক বীর্যবতী নায়কোচিত চরিত্র। বীরাঙ্গনা কাব্যের (১৮৬২) তারা এবং সূর্পণখা, তাদের প্রেম ও যাদের ভালোবাসে সেইসব পুরুষদের প্রতি শরীরী বাসনার কথা, চিরন্তনী নারীসুলভ চরিত্রাবলীকে[২১] অস্বীকার করে ঘোষণা করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম: ১৮৩৮ সাল) লিখলেন দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) (যা 'সমসাময়িক বঙ্গদেশ'কে শিহরিত করে তোলে এবং পূর্বের সমস্ত

নজীরকে ভেঙ্গে দিয়ে লেখকের জীবদ্দশাতেই তেরোটি সংস্করণে মুদ্রিত হয়) এবং আয়েশাকে এক বন্ধনহীন রোমাণ্টিক নায়িকারূপে চিত্রিত করেন। ভ্রমর, বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তর উইল (১৮৭৮)-এর কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র, দাম্পত্য বিশ্বাসঘাতকতার[২২] জন্য স্বামীকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (জন্ম: ১৮৬১) চিত্রাঙ্গদা (এই নামকরণসমেত পুস্তকটি ১৮৮২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়) দৃঢ়তায় ঘোষণা করেন যে, কোন অবস্থাতেই তিনি দেবী রূপে পূজ্য হতে চান না অথবা চান না নারী বলে অবহেলা এবং স্বামীর সহযোগী হওয়াই তাঁর কাম্য।[২৩]

রোমাণ্টিক প্রেম ও সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডে বহুলালোচিত স্বামী-স্ত্রী সখ্যতাবোধের ভিত্তিতেই এসব চরিত্র সৃষ্ট—একথা বলাই বাহুল্যমাত্র। উল্লিখিত বর্ণময় ও জনপ্রিয় লেখকদের সৃষ্টি নারীপুরুষ নির্বিশেষে পাঠকদের চিত্ত জয় করেছিল নিশ্চয়ই। এতদ্‌সত্ত্বেও, লেখকরা স্বয়ং ভারতীয় ঐতিহ্যের বন্ধনটিকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করতে সক্ষম হন্‌নি যদিও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে প্রতীচ্য প্রভাবের কাছে তারা ছিলেন অকপট। এর ফলেই বোঝা যায় যে কেন সাহসী প্রমীলা স্বামী ও শ্বশুর সম্পর্কে গর্ববোধ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে; তারা ও সূর্পনখা কেনইবা পুরুষ প্রেমিকদের দাসী রূপে নিজেদের ঘোষণা করে; মৃত্যুশয্যায় কেন ভ্রমর স্বামী সন্দর্শনের ইচ্ছায় নিমজ্জিত হয়; হিন্দু-রাজার প্রতি মুসলমান আয়েশার প্রেম শুরু থেকেই কেনবা দণ্ডপ্রাপ্ত; এবং স্বামীর পাশেই তাঁর স্থান—এই ঘোষণার পর চিত্রাঙ্গদা কেন আর অগ্রসর হতে পারেন না। এইসব বিখ্যাত কথাশিল্পীরা প্রত্যেকেই চেয়েছেন প্রতীচ্য ও ভারতীয় স্ত্রীসুলভ গুণাবলীর এক সমন্বয়মাত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্ব বিংশ শতাব্দীতে যেমন সমাধান হয় নি, তেমনই ভারতীয় নারীত্বর গতিপ্রকৃতি, নতুন শক্তি ও প্রতিক্রিয়ার প্রবেশের দ্বারা নির্দিষ্ট এক আকার লাভ করে। প্রতীচ নারীমুক্তিবাদী অ্যানি বেসান্ত ও মার্গারেট কাজিন্স ভারতীয় রমনীদের পশ্চিমী নারীমুক্তিবাদী ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করে তোলেন এবং নারী শিক্ষার প্রসার নতুন নতুন চিন্তাধারা ব্যাপ্তি ঘটায়। স্ত্রী-ভাবমূর্তির পরিবর্তনই হল ঊনবিংশ শতকের সংস্কার ও বিংশ শতাব্দীর সংগ্রামের মধ্যেকার একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। এর কারণ অনুসন্ধান দুরতিক্রম্য নয়। ঊনবিংশ শতকের সমাপ্তিকালে শিক্ষিত অভিজাতরা—পূর্বে যারা 'রাজ'এর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল—প্রধানত নিজেদের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যেই, এবং যাদের আশা ছিল যে ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের

ছাঁচে রূপান্তরিত করবে—মিত্রদের সম্পর্কে ক্রমশই নির্মোহ হয়ে উঠতে থাকে।[২৪] তাঁরা উপলব্ধি করেন : ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনত দুর অস্ত, বাস্তবে ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষের বিকাশে বাধাদান করছে এবং "ভারতীয় বুর্জোয়াদের গাঁট কাটার চেষ্টায় আছে।"[২৫]

যদিও ভারতবর্ষের অপরাপর অঞ্চলে বুদ্ধিজীবী মহলের মোহভঙ্গ ক্রমান্বয়ে হতে থাকে, কিন্তু বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গের কার্জনীয় চক্রান্তের ক্রূরতার আকস্মিক ঝাঁকুনি এখানকার বুদ্ধিজীবীদের জাগরিত করে। যদিও বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী বা স্বদেশী আন্দোলন মূলত একটি রাজনৈতিক চালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেই শুরু হয়, কিন্তু ব্রিটিশদের একচেটিয়া পুঁজিবাদী আধিপত্যর ধ্বংসসাধন ও ব্যবসা এবং শিল্পক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগলাভের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙালী অভিজাতদের উদগ্র ইচ্ছাই এই আন্দোলনকে চালিত করে। বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রচার এবং দেশজ ভোগ্যদ্রব্যের[২৬] সপক্ষে যুক্তিচালনা এই অন্তর্নিহিত ইচ্ছাকেই ব্যাখ্যা করে। আন্দোলনের জন্য মহিলাদের সাহায্য বাঙালী পুরুষদের প্রয়োজন হয় (আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য) কিন্তু কোন বিদেশী রূপাকৃতির ঐন্দ্রজালিক আবির্ভাব ঘটান হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই জাতীয়তাবাদ নিজ দেশের অতীত, ঐতিহ্য, প্রথা ও সামাজিক সংগঠনসমূহ থেকে স্বাস্থ্যলাভের প্রয়োজন বোধ করে। সুতরাং ভারতীয় নারীর দেশজ ভাবমূর্তির দিকেই জাতীয়তাবাদী আহ্বান ধাবিত হয়। অধিকন্তু, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ইংরাজের বিরুদ্ধে সামাজিক-আর্থনীতিক সংগ্রামকে মাতৃভূমির পূজায়, যা অদূর-ভবিষ্যতে মাতৃদেবীর[২৭] রূপ ধারণ করে, অগোচরে পরিবর্তিত করেন। এই ভূমিকার প্রধান সীমাবদ্ধতা এই যে : আন্দোলনকে অধিক মাত্রায় হিন্দু ধর্মীয় প্রভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন করা হয় ফলে মুসলিমদের অংশগ্রহণে বাধা আরোপিত হয়। লাভের ক্ষেত্রটি হল : দেবীমাতৃকার পুনরাহ্বান, 'শক্তি'র (শক্তির উৎস) আবির্ভাব বাংলাদেশের প্রচণ্ড শক্তিশালী এক প্রাগার্য ভাবধারার প্রতি আহ্বান[২৮] এবং এই প্রার্থনা শেষ-পর্যন্ত কাল নিরহিত নারীশক্তির[২৯] প্রতিই নিবেদিত হয়। সংস্কৃতিগতভাবে ধর্মের ক্ষেত্রটি মহিলাদের দ্বারাই অধিকৃত এবং জাতীয়তাবাদ ধর্মে রূপান্তরিত হবার ফলে রাজনীতির আঙ্গিনায় মহিলাদের প্রবেশ সহজ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে (বাস্তবে যা হয়েও ছিল), এই প্রক্রিয়া নারী-হৃদয় স্পর্শ করে কারণ অনায়াসেই তারা, যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, নিজেদের এই একই 'শক্তি'র অংশরূপে একাত্মবোধ করতে সক্ষম হয় (পুনরায় এক অন্তর্নিহিত গভীর সাংস্কৃতিক চেতনা)। কলকাতা এবং মফস্বলের মহিলাদের এক

বৃহত্তর অংশ আন্দোলনের[৩০] ডাকে সাড়া দেন এবং এভাবেই পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যে তাঁরা প্রবেশ করেন।

স্বদেশী আন্দোলন নিঃশেষিত হয়ে আসে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের[৩১] প্রারম্ভ বৎসরগুলিতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলন এক সুপ্ততার মধ্যে বাহিত হয়। কিন্তু রাসবিহারী বসু, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, ভি. ডি. সাভারকর, এম. এন. রায়, অবনী মুখার্জী ও যতীন মুখার্জীদের মত ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ভারতবর্ষের নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই অনুপ্রাণিত করে তোলে।[৩২] ইতিমধ্যে, শাসকগোষ্ঠী ও শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকদের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বিরোধ এবং "আর্থিক সুযোগ-সুবিধার উপর চাপিয়ে দেওয়া সংকীর্ণতা"র অপমানজ্বালা প্রবলতর হয়ে উঠেছে[৩৩] এবং দেশীয় ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক অসন্তুষ্টি চরমাকার ধারণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, বেঙ্গল পীস্ গুডস্ মার্চেন্টস্' এ্যাসোসিয়েশানের সম্পাদক রুদ্ধস্বরে অভিযোগ করেন যে, বাংলাদেশে 'পাটের অচলাবস্থা' এবং চা, কয়লা ও অন্যান্য শিল্পে সঙ্কটের ফলে উদ্ভুত অর্থনৈতিক মন্দার দরুন বাঙালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীই ভয়াবহ চাপের মুখে পড়েছে, সর্বোপরি অর্থনৈতিক মন্দার বৃদ্ধি কয়েক কোটি মানুষকে নিষ্পেষিত করছে ও তাদের দুঃখমোচনের জন্য কোন চেষ্টাই করা হচ্ছে না।[৩৪] এই বিরূপতাই গান্ধী আহ্বায়িত ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও পরবর্তীকালে ১৯৩০ সালে মূর্ত হয়ে ওঠে।[৩৫] ১৯২০ সালের গান্ধীবাদী আন্দোলনে বাঙালী মহিলাদের যোগদানের ক্ষেত্রে, তিনটি পৃথক বৈশিষ্ট্য আলোচনার অপেক্ষায় রাখে।

প্রথমত, 'দেশপূজার' সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের একাত্মকরণ এবং 'শক্তি' ও নারী-শক্তি জাগরণের বন্দনা চলতেই থাকে ফলত, মহিলাদের যোগদান সুসাধ্য হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, একটি জনপ্রিয় দৈনিকের পর্যবেক্ষণ এই যে, "হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে অনাচারের অবসান ঘটাতে যখন দেবশক্তি সক্ষম হয় নি একমাত্র নারীশক্তিই তখন সাফল্য লাভ করেছে।"[৩৬] মহিলারা প্রভাবিত হন, পূর্বের মতই এই প্রচারে সাড়া দেন এবং দৈনিক সংবাদপত্র ও পুস্তিকায় লিখতে থাকেন, ঘোষণা করেন যে, দুর্গার আশীর্বাদে বলীয়ান হয়েই রাম রাবণকে পরাজিত করেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শক্তিলাভের জন্য নারীদের 'আদ্য মা'কে পূজা করা উচিত।[৩৭] এমনকি সরোজিনী নাইডুর ভারতবর্ষের ভাবমূর্তিটি ছিল আদিমাতার রূপকল্প।[৩৮] অতএব, স্বাধীনতা

আন্দোলনকে ভারতীয় চরিত্রদানই ছিল এর উদ্দেশ্য এবং ভারতের নিজ অতীতের মূলানুসন্ধানই এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় নেতারূপে গান্ধীর উত্থান মহিলাদের যোগদানকে সাহায্য করে। গান্ধীর "চরিত্র ছিল মহৎ…। মহিলারা যখন ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল এবং রাজনীতির মঞ্চে কাজ শুরু করল", পরিবারের অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধতায় মুখোমুখি তাদের হতে হয়নি কারণ তারা জানত যে, "মহিলারা সুরক্ষিত।"[৩৯] তাৎপর্যময় এই যে, অহিংস আন্দোলনের জন্য নৈতিকভাবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং "পুরুষদের কর্মের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অংশে ও অংশগ্রহণের অধিকার" মহিলাদের আছে—এই ধরনের গান্ধীর নিশ্চয়তা পুরুষদের তুলনায় নারী অপকৃষ্ট—এই হীনমন্যতা-বোধকে মহিলাদের হৃদয় থেকে অপসারিত করে।[৪০]

তৃতীয়ত, আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন দাস ও বিপিনচন্দ্র পালের[৪১] মত জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক নেতা এবং বাসন্তীদেবী (জন্ম: ১৮৮০) ও হেমপ্রভা মজুমদার (জন্ম ১৮৮৮)-এর[৪২] মত নেতৃত্ব-দানকারী রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ মহিলাদের উত্থান ঘটে। মহিলা নেতৃবৃন্দ নারীদের অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার লাভ করেন, তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতার বিকাশ ঘটতে সাহায্য করেন।[৪৩]

রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ

নারীর সামাজিক সচেতনতা প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে, তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া প্রয়োজন। রাজনীতির প্রতি মহিলাদের আগ্রহ, স্বদেশীর সময়কালে একদা জাগরিত হয়, প্রবাহিত হতে থাকে (যদিও খুবই নীচুগ্রামে) আগামী দশক পর্যন্ত, যতদিন পর্যন্ত না একজন নারীর, অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে, হোমরুল বিদ্রোহ শুরু হয়। বেসান্ত "জন্ম প্রতীচ্যে কিন্তু আত্মায় প্রাচ্যদেশীয়, ইংল্যাণ্ডে প্রতিপালিত অথচ চরিত্রে আইরিশ"[৪৪] হোমরুল লীগ (১৯১৬) স্থাপন করে ভারতের স্বাধীনতা লাভেচ্ছার জন্য আন্দোলনের সূচনা করেন।[৪৫] তাঁর অন্তর্ভুক্তি বহু ভারতীয় নারীকে অনুপ্রাণিত করে তোলে (যেমন, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়)[৪৬] এবং এক অর্থে, গান্ধীর নেতৃত্বে মহিলাদের রাজনৈতিক দানের পথটি এর ফলেই সুগম্য হয়ে ওঠে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে অ্যানি বেসান্তের নির্বাচন—এই পদের অধিকারী প্রথম মহিলা—এবং কলকাতায় তাঁরই

নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলন নারীজাতির কাছে এক বিশেষ বার্তা বহন করে আনে। মার্গারেট কাজিন্সের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ নেতৃত্বের[৪৭] ফলও অনুরূপ। সর্বভারতীয় চালচিত্রে—বাংলাদেশের মতই—পরবর্তী স্তরে মহিলাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দুটি লক্ষ্যে চালিত হয়ঃ "মেয়েদের ভোট চাই" তার জন্য আন্দোলন (নিঃসন্দেহে পশ্চিমী সাফরাগেট আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত এবং মার্গারেট কাজিন্স কর্তৃক চালিত) যা মূলত নারীদেরই বিষয় এবং দ্বিতীয়ত পুরুষদের পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান।

নারীদের ভোটাধিকার অর্জনের সংগ্রাম

ভোটাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে মহিলাদের "ক্ষুদ্রতম বিরোধিতার" মুখোমুখি হতে হয়েছে[৪৮]—পূর্বের এই ধারণার বিশ্বাসযোগ্যতা অপ্রমাণ করে বর্তমানে আমরা নিশ্চিত যে এক্ষেত্রে জয়লাভ সহজ ছিল না এবং সংগঠিত নারীশক্তির চাপ ব্যতিরেকে ভোটাধিকার নারীদের জন্য অনুমোদিত হয় নি।[৪৯] প্রায়শই এবং ঠিকই বলা হয় যে ঃ ভোটাধিকার দাবী, অভিজাত শ্রেণীর মহিলাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা-কাঠামোয় স্থানলাভের অতিরিক্ত কিছু ছিল না এবং এভাবেই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সেই গোষ্ঠীর একাধিপত্যকে শক্তিমান করে তোলা যেত। বীণা মজুমদারের স্বীকৃতি অনুযায়ী, এ দাবীর সপক্ষে তারাই মুখর হয়েছিল যাদের কাছে সেই সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোটি 'নারীদের নারী হিসেবে অংশগ্রহণে' বিরত রেখেছে, সেইসময়কালের নিয়ন্ত্রক শ্রেণী থেকেই তারা আগত যে শ্রেণী তাদের অপকৃষ্ট বিশেষণে ভূষিত করেছে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বকরণ থেকে বঞ্চিত রেখেছে।[৫০]

এক্ষেত্রে মহিলাদের সংগঠিত রাজনৈতিক কর্মসূচি তখন থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে সূচিত হয় যখন সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ভোটাধিকার অর্জনেচ্ছু প্রতিনিধিদল, যার মধ্যে ছিলেন মার্গারেট কাজিন্স, অ্যানি বেসান্ত, ডরোথি জিনারাগাদেশা, উমা নেহরু[৫১], রমাবাই রানাডে[৫২] এবং অবলা বোস[৫৩]; সেক্রেটারী অফ স্টেট মণ্টাগুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং নারীদের ভোটের সম-অধিকার দানের দাবী জানান। তাদের প্রধান বক্তব্য ছিল, রাজনীতির জগতে মহিলাদের আগমন দূষিত আবহাওয়াকে সুস্থ করে তুলবে এবং সন্তানদের স্বাস্থ্যকর বিকাশের সহায়ক হবে। যদিও এবিষয়ে মণ্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড প্রকল্প নীরব থাকে, অনুসন্ধানের জন্য সাউথবরো ফ্র্যাণ্টাইস্‌ কমিটি স্থাপিত হয় এবং

ঐক্যবদ্ধ মহিলা সংগঠনগুলির দ্বারা সমর্থিত এক মহিলা প্রতিনিধিদল এই কমিটির সামনে বিষয়টি উপস্থাপিত করে। তাছাড়াও, ১৯১৯ সালে সরোজিনী নাইডু, অ্যানি বেসান্ত, হীরাবাই টাটা ও নির্বাণ টাটা মহিলাদের ভোটদানের সপক্ষে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির (মণ্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের মার্জনাসাধনের উদ্দেশ্যে গঠিত) সামনে সাক্ষ্যদানের জন্য লণ্ডন গমন করেন। এই প্রশ্নের সমাধানের দায়িত্বভার জয়েণ্ট কমিটি ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের আগত আইনসভার উপর ন্যস্ত করেন।[৫৪] অতএব মহিলাদের ভোটদান আন্দোলনের মূল বিন্দুটি সর্বভারতীয় নাটমঞ্চ থেকে নির্দিষ্ট প্রাদেশিক অঙ্গনে সংস্থাপিত হয়। প্রদেশগুলির মধ্যে মাদ্রাজই সর্বপ্রথম আইনগত ভোটদানের ক্ষেত্রে যৌন-অসাম্যকে দুর করায় নেতৃত্ব দেয় এবং আইনসভায় ডক্টর মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী[৫৫], একজন মহিলাকে সদস্যরূপে গ্রহণ করে।

বাংলাদেশে, কুমুদিনী বসু (জন্ম ১৮৮২)[৫৬], কামিনী রায় (জন্ম ১৮৬৪)[৫৭], মৃণালিনী সেন (জন্ম ১৮৭৯)[৫৮], এবং জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর (জন্ম ১৮৮৯)[৫৯] নেতৃত্বে বঙ্গীয় নারীসমাজই হল প্রধান মহিলা সংগঠন যা ভোটাধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে। এই গোষ্ঠী রামানন্দ চ্যাটার্জী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং বিপিনচন্দ্র পালের মত রাজনৈতিক নেতা ও অভিজাত পুরুষ বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে এ বিষয়ে সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। কিন্তু ১৯২১ সালে বঙ্গীয় আইনসভায় আনীত নারীদের ভোটের অনুমোদন দানের প্রস্তাবটি এক লজ্জাকর পরাজয়ে বিধ্বস্ত হয়।[৬০] অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের এই আঘাত পেলেও বঙ্গললনাগণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে, প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হয় এবং নিজেদের দাবীতে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চলতে থাকে। মাদ্রাজে অবস্থিত উইমেন্স ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যপদ গ্রহণ করে বঙ্গীয় নারীসমাজে যাতে পূর্বোক্তদের ঐক্যবদ্ধ অভিজ্ঞতার থেকে তারা শিক্ষালাভ করতে পারে। একই সাথে, কলকাতা পৌর নির্বাচনে মহিলাদের ভোটাধিকার অর্জনের জন্য সমান সর্বশক্তি নিয়োজিত করে এবং ১৯২৩ সালে এই অধিকার অর্জিত হয়।[৬১] এই জয়লাভে উৎসাহিত হয়ে কামিনী রায় এবং দুই মুসলমান মহিলা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ও বেগম সুলতান মুয়াজিদ্‌জাদার নেতৃত্বে এক নারী প্রতিনিধিদল লর্ড লিটনের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করেন। ভোটাধিকার প্রত্যাশীরা, সরলাদেবী চৌধুরাণীর (জন্ম ১৮৭২) মত একজন বিশিষ্ট নারীমুক্তিবাদী (যিনি লাহোর থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন)[৬২] ও বাংলার জেলা শহরগুলির

যেমন ঢাকা, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম ইত্যাদি ক্ষুদ্র কিন্তু সংগঠিত মহিলা সমিতি-গুলির সমর্থনে প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করে। ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় আইনসভা মহিলাদের ভোটদানকে (এক সীমায়াত ক্ষেত্রে) অনুমোদন দান করে এবং ১৯২৬ সালে সর্বপ্রথম[৬৩] বাংলার নারী এই অধিকার প্রয়োগ করে—যে অধিকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের প্রচলিত সার্বজনিক পুরুষ-প্রাধান্যের জগতে তাদের প্রবেশলাভের প্রতীকরূপে পরিগণিত হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

ভোটদানের সাংবিধানিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য মহিলাদের আত্মনিবেদন। ১৯১৯-২০ সালে ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এক নাটকীয় পরিবর্তন সূচিত হয়। রাওলাট বিল পাশ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯) প্রত্যুত্তরে এবং খিলাফৎ আন্দোলনের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে ১৯২০ সালে গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশেষ কংগ্রেস সম্মেলন এই প্রস্তাবিত বিক্ষোভকে সমর্থন করে। বাংলাদেশে আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন সি. আর. দাস ও তাঁর স্ত্রী বাসন্তীদেবী। বিদেশী দ্রব্য বিক্রয়কারী বিপণিগুলিতে মহিলাদের পিকেটিং-এর নেতৃত্ব দেন বাসন্তীদেবী। ১৯২১ সালের ৭ই ডিসেম্বর কলকাতার কোন একটি রাস্তায় খদ্দর[৬৪] ফেরি করার জন্য উর্মিলাদেবী (জন্ম ১৮৮৩) এবং সুনীতিদেবীর সঙ্গে তিনি গ্রেপ্তার হন। যদিও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা মুক্তিলাভ করেন কিন্তু তাঁদের গ্রেপ্তার জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণার জন্ম দেয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উর্মিলাদেবীর মন্তব্য হল এই যে: "আমাদের মনে হয়েছিল লড়াইয়ের মধ্যে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি ও একে কিছুটা গতি দেওয়া উচিত…। অবশিষ্ট মেয়েদের সামনে আমরা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলাম, আমাদের গ্রেপ্তার প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়াটিকে জন্ম দেয়।"[৬৫]

সি. আর. দাসের কারাবন্দীত্বের সময়, বাসন্তীদেবী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি (১৯২১-২২) হন ও ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এ ঘটনা দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পুরোভাগে একজন বাঙালী মহিলাকে নিয়ে এল। তাঁর সভাপতির বক্তব্য শুধুমাত্র 'চরকা'র মূল্য ও সংগঠিত কর্মসূচীর বিবরণ পর্যালোচনাতেই সমাপ্ত

হয় নি, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল গ্রামীণ ভারতের পুনর্বর্ধনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি আহ্বান ঃ

> "যদি প্রাচীন ভারতের সহজ ও সর্বোকৃৎষ্ট জীবনধারাটিতে আমাদের ফিরে যেতেই হয় তাহলে ঘুমিয়ে থাকা গ্রামগুলিকে আমাদের জাগাতেই হবে…। আধুনিক জীবনের শর্তাদি নিয়েই গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলি নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামগুলিকে আমাদের পুনর্গঠন করতে হবে, কিন্তু করতে হবে আমাদের জাতীয় জীবনের সৃজনমূলকতার অনুযায়ী করে।[৬৬]

এই বক্তব্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। প্রথমত, জাতীয় আন্দোলনের সাফল্যের জন্য সমাজের শেষতম স্তরটির অংশ-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বাসন্তীদেবী অনুভব করেছিলেন। বাংলাদেশে মূলত তিনি তাই-ই করছিলেন—গুজরাটে কস্তুরবা যা করছিলেন অর্থাৎ গ্রামীণ অর্থনীতি ও কুটিরশিল্প পুনঃপ্রবর্তনের গান্ধীয় আর্থনীতিক পদ্ধতিকে প্রাধান্যদান যা কিন্তু মহিলাদেরই হারিয়ে যাওয়া আর্থিক উৎসের কয়েকটিকে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়।[৬৭] দ্বিতীয়ত, পুরুষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের মতই তিনিও অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বলতা ও প্রাচীনতার চিত্রটিকেই পুনর্বহাল করেন। পরিষ্কারভাবেই, আধুনিকতাকে ততখানি পর্যন্তই উৎসাহিত করা হবে যতখানি পর্যন্ত দেশের নিজস্ব প্রয়োজনকে সমাধান ও দেশের নিজস্ব চারিত্রিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা যাবে। তৃতীয়ত, সংবাদিত হয় যে, তাঁর ভাষণ শ্রোতাদের কাছে 'বিশেষভাবে আবেদনময়' হয়ে ওঠে এবং এমনকি বিপিনচন্দ্র পালের বক্তব্যের থেকেও অধিক মাত্রায় কার্যকরী হয়। এই সম্মেলনে মহিলাদের উপস্থিতির কাছে পূর্বেকার সমস্ত নারী সমাগম নিষ্প্রভ হয়ে যায়। সংবাদপত্রের প্রশ্ন ঃ "এ ঘটনার কারণ কি একজন মহিলার সভাপতিত্ব গ্রহণ না বাঙালী নারীর রাজনৈতিক জাগরণ ?"[৬৮]

যখন জনসভার মঞ্চ থেকে বাসন্তীদেবী মহিলাদের রাজনীতিজ্ঞ ও অনুপ্রাণিত করে তুলছেন তখন তাঁর ননদ উর্মিলাদেবী স্বরাজের মূলমন্ত্র নিঃশব্দে প্রচার ও চরকা এবং মহিলাদের মধ্যে চরকা প্রচলন জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে নারী কর্ম মন্দির (১৯২১)-এর কর্মসূচিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। সভাসমিতিতে উপস্থিতি ও ভাষণদান থেকে তিনি বিরত হন নি কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যই তাঁর উৎসাহনুযায়ী সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অগ্রগামী করে তুলতে দেয় নি।[৬৯] হেমপ্রভা মজুমদার, তৎকালীন যুগের যোগ্যতম রাজনৈতিক নারী-নেত্রী সম্ভবত, এবং

সি. আর. দাস গঠিত স্বরাজ্য পার্টির পাঁচজন স্থাপক-সদস্যের অন্যতম,[৭০] মূলত ঊর্মিলাদেবীকে নারী কর্মী মন্দির পরিচালনায় সহায়তা করতেন এবং এটি বন্ধ হয়ে যাবার পর মহিলা কর্মী সংসদ (১৯২২) গঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল একই সাথে রাজনৈতিক এবং সামাজিক—তা হল নারীদের বৃত্তিগত প্রশিক্ষণদান ও জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় রঞ্জিত করে তোলা। সংসদ একটি মহিলা নিবাস পরিচালনা করত, যেখানে পরিত্যক্ত নারীদের আশ্রয় দেওয়া হত। তবে অধিক আলোড়িত রাজনৈতিক আঙ্গিনায় হেমপ্রভা চাঁদপুর এবং গোয়ালন্দের (১৯২১) স্টিমার ধর্মঘটে তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করেন। তিনি স্বয়ং গোয়ালন্দে যান এবং আসাম চা বাগান থেকে আগত কুলীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক স্বেচ্ছাসেবক দল করেন। পরে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে একটি মহিলা সংগঠনের সূচনা ঘটান।[৭১] কলকাতায় প্রত্যাগমনের পর, একটি মহিলা মিছিলের পুরোভাবে থাকাকালীন পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি আহত হন।[৭২] যখন সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের সভাপতি হন (১৯২৬), হেমপ্রভা তাঁর প্রতি মূল্যবান সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন। বস্তুত, এই দু'জন মহিলাই বোধহয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারীমুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী মাধ্যম রূপে পরিগণিত হন।

তৎকালীন যুগের অন্যতমা বীর্যবতী মহিলা নেত্রী হলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, যিনি সিংহলে (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) শিক্ষকতা পদ ত্যাগ এবং প্রত্যাগমন করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁর সাফল্যের মধ্যে ছিল ১৯২০ সালের কলকাতা কংগ্রেসে প্রথম নারী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন। দেবীচৌধুরাণী নামে জনপ্রিয় এই মহিলা, পরবর্তীকালে, বিশেষত ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে বহুমূল্য সহায়তা করেন।[৭৩] রাজনীতির বাস্তবক্ষেত্রে নাইডু, গাঙ্গুলী ও মজুমদারদের মত মহিলাদের প্রবেশ "শুধুমাত্র কংগ্রেসের ভাণ্ডারকেই ঐশ্বর্যশালী করে নি, ভারতবর্ষের দোলায়মান নারীজগতের সম্মুখেও সত্যিকারের প্রেরণা রূপে কাজ করেছে।" অপরাপর মহিলারা তাদের গৃহকোণ, স্বামী ও সন্তানদের ত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিলীন হতে সক্ষম—এই ঘটনাই মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলে।[৭৪]

এইসব মহিলাদের উৎসাহ আমলাতন্ত্রকে স্নায়ুতাড়িত করে তোলে। এক গোপনীয় রিপোর্টে কলকাতা পুলিশের তৎকালীন কমিশনার ক্লার্ক, প্রথম সারির মহিলা প্রতিবাদীর মধ্যে বাসন্তীদেবী, ঊর্মিলাদেবী ও সুনীতিদেবী ছাড়া হেমপ্রভা মজুমদার (বসন্তকুমার মজুমদারের স্ত্রী), সুনীতিবালা মিত্র (ডক্টর

অনুকূল মিত্রের সহধর্মিনী), নারী কর্ম মন্দিরের উমাদেবী ও সতীদেবী, বগলা সোম (সূর্য সোমের স্ত্রী), মোহিনী দাসগুপ্ত, বীণাপানি দেবী এবং প্রতিমাদেবীর উল্লেখ করেন। ক্লার্কের ভাষ্যাঅনুযায়ী মহিলা স্বেচ্ছাসেবীরা অধিকাংশই ব্রাহ্ম ; প্রতিদিন তাঁরা রাস্তায় নেমে পড়েন এবং চলার পথে পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য উৎসাহীদের সমবেত করেন, "মহিলারা গান গাইতে থাকেন এবং পুরুষ সমর্থকরা দোকানদারদের বিদেশী কাপড়-ব্যবসা বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গুদামজাত করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে থাকেন।" মিছিল ধীরে ধীরে এগোতে থাকে এবং ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে, অবশেষে তিন থেকে চারশো লোক একসাথে যাত্রা করেন, "যানবাহন চলাচল ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রায়শই সব অচল হয়ে যায়।" যদি কোন দ্রুত পন্থা না গৃহীত হয়, আন্দোলন ক্রমশ বিশালাকার হয়ে উঠবে এবং অনতিবিলম্বেই "পুলিশের সঙ্গে নারী বিক্ষোভকারী সঙ্ঘর্ষ" অবশ্যম্ভাবী।[৭৫] এক সপ্তাহ পরে, ক্লার্ক আবার রিপোর্ট দেন যে : জনসমাবেশ ও মিছিলের সরকারী নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ অমান্য করার মধ্যে দিয়ে মহিলাদের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাসন্তীদেবী মির্জাপুর স্ট্রীটের এক জনসমাবেশের নেতৃত্ব দেন ; কলেজ স্কোয়ারের এক বিশাল গণ-সমাবেশে হেমপ্রভা মজুমদার বক্তব্য রাখেন ; বিনোদিনীদেবী ও জগৎ-মোহিনীদেবী হাজরা পার্কে এক জনসভার আয়োজন করেন। পুলিশ কমিশনারের অকথ্য বক্তব্যটি এই যে বাংলার পুরুষেরা "মেয়েদের আঁচলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে" এবং "কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলন মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে।"[৭৬]

মফস্বলের মেয়েরাও পিছিয়ে রইলেন না। মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট আন্দোলন মেয়েদের সহযোগিতার ফলেই সফল হয়েছিল। ঢাকার আশালতা সেন—"গাণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন,—"স্থানীয় মেয়েদের মধ্যে গান্ধীজির বাণী ও জাতীয়তাবাদের চেতনা প্রচার করার" জন্য। এই সমিতির মেয়েরা মাথায় খদ্দরের গাঁঠরি নিয়ে বিক্রি করে বেড়াতেন এবং স্বদেশী সামগ্রী বিক্রি করার জন্য প্রতি বছর শিল্পমেলা সংগঠিত করতেন।[৭৭] যেটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় তা এই যে অল্প কয়েকজন নেত্রী নয়, কাতারে কাতারে মেয়ে, তাদের নামও কেউ মনে রাখেনি, নির্ভয়ে ব্রিটিশ-রাজকে আঘাত করেছিল। যেসব মেয়েরা কখনও বাড়ীর পুরুষ আত্মীয়দের সামনেও বেরোতেন না, তাঁরা এখন রাস্তায় বেরিয়ে এলেন, মিছিল করলেন, এমনকি গ্রেপ্তারও হলেন। ১৯২২-এ বহুসংখ্যক মেয়ে গ্রেপ্তার হলেন। মেয়েদের মধ্যে প্রথম তিন মাসের জেল হল সাবিত্রী ও পার্বতীদেবীর।[৭৮]

সে যুগের সংবাদপত্রগুলি সুচতুর মন্তব্য করলেন যে মেয়েরা জেলে যাওয়ায় স্বরাজ আসবে না বটে, কিন্তু—"মেয়েদের এই অসম্মানের" ফলে সমগ্র জাতি আঘাত খেয়ে নতুন "শক্তি" পাবে। তার ফল ব্রিটিশরাজের পক্ষে গুরুতর হবে।[৭৯]

চৌরিচৌরার ঘটনার পর গান্ধীজি আকস্মিকভাবে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেও বাংলাদেশে রাজনীতিতে মেয়েদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল না। তার কারণ, গান্ধীজির রাজনৈতিক প্রভাব সত্ত্বেও, বাংলাদেশ সব সময় আকৃষ্ট হয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে। স্বদেশী যুগের বিপ্লবী আন্দোলন, বিশেষ করে আলিপুর বোমার মামলা, বাংলাদেশে অভূতপূর্ব উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল।[৮০] সে যুগের মেয়েরা বিপ্লবীদের শুধু পরোক্ষ সাহায্য করতে ও সহানুভূতি জানাতেই পারতেন।[৮১] ১৯২০-র দশকে তাঁরা অনেক প্রকাশ্যভাবে বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন।

লীলা রায় (জন্ম ১১০০) ১৯২৪-এ ঢাকাতে, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নাম করে দীপালি সংঘ নামে সংগঠন গড়লেন। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের বিপ্লবী আদর্শের দিকে টেনে আনা।[৮২] ১৯২৭-এ গড়ে উঠল মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ মেয়েদের মধ্যে দেশপ্রেম ও সুভাষচন্দ্র বসুর চিন্তাধারা প্রচারের জন্য। এর সভানেত্রী ছিলেন সুভাষচন্দ্রের মা প্রভাবতী বসু, সম্পাদিকা লতিকা ঘোষ এবং সহ সম্পাদিকা অরুবালা সেনগুপ্ত। এই সংগঠনের মেয়েরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে মত বিনিময় করতেন। ১৯২৮-এ লতিকা ঘোষ, কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়, একটি অত্যন্ত দক্ষ মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।[৮৩] আরও প্রগতিশীল মহিলা নেত্রীদের মধ্যে সন্তোষকুমারী গুপ্ত ১৯২৩-এ তারকেশ্বর সত্যাগ্রহকে সংগঠিত করেছিলেন এবং বিশের দশকের মধ্যভাগে চটকল শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করে মহিলা শ্রমিক নেত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।[৮৪] প্রভাবতী দাশগুপ্ত ১৯২৮-এ কলকাতা ও হাওড়ার ধাঙড় ধর্মঘটের এবং ১৯২৮ ও ১৯২৯-এর চটকল ধর্মঘটে বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। শ্রমিকরা তাঁকে ভালবেসে আর মধ্যবিত্ত দেশপ্রেমিকরা বিদ্রূপ করে তাঁকে—"ধাঙড় মা" বলত।[৮৫] বাংলাদেশে স্থানীয় সংগ্রামী ঐতিহ্যের ফলে বিপ্লবী আন্দোলনে বামপন্থী মতবাদ অনুপ্রবেশ করে এবং ১৯২০'র ও ১৯৩০'র দশকে বহু বিপ্লবী নেতা আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। অনেক মেয়েরা, যাঁরা প্রকাশ্যে বিপ্লবী আদর্শ বা কমিউনিস্ট আদর্শকে সমর্থন করতেন না, কিন্তু গোপনে বিপ্লবীদের অস্ত্র সরবরাহ[৮৬] করে বা আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট কর্মীদের আশ্রয় দিয়ে পরোক্ষ সাহায্য করতেন।[৮৭]

১৯১০'র দশকে বাংলার নারীজগতে আরেক ধরনের যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে—ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে পড়ল। তখন খুব বেশী মেয়ে স্কুল-কলেজে পড়তেন না। হিন্দু মেয়েদের কমবয়সে বিয়ে হওয়ার প্রথা চালু থাকায়,[৮৮] তাঁদের অনেকেই এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু যাঁরাই স্কুল-কলেজে পড়তেন তাঁদের বেশীর ভাগ রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হলেন। প্রথমতঃ অসহযোগের দিনগুলিতে বাসন্তীদেবী, ঊর্মিলা-দেবী ও অন্যান্যরা অনবরত ছাত্রীদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে ডাক দিতেন। কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্কোয়ার এবং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট এলাকা দিয়ে স্বেচ্ছাসেবিকাদের মিছিল প্রায়ই বের হত, ছাত্রীদের আকৃষ্ট করাই তাদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সরকারী নথিপত্র থেকে আমরা দেখতে পাই যে ছাত্রীরা কিভাবে এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল।[৮৯]

বেশ কয়েকটি কলেজের, বিশেষতঃ ডায়াশেসনের ছাত্রীরা গান্ধীজি কলকাতায় এলে[৯০] তাঁর বক্তৃতা শুনতে যান এবং ১৯২৮-এ লতিকা ঘোষ স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গড়ে তুললে, বিভিন্ন কলেজের ২০০ ছাত্রী তাতে যোগ দেয়। এক মর্মস্পর্শী রচনায় ঊর্মিলাদেবী বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে মোটা খদ্দরের শাড়ি পরে বাঙালী মেয়েরা স্বদেশীর প্রচারে বের হতেন এবং কিভাবে রেল স্টেশনের কুলিমজুরেরা তাদের প্রতিটি প্রয়োজনে দেখাশুনো করত। একবার ট্রেনযাত্রী একজন ভদ্রলোক মন্তব্য করেন ঃ "সন্দেহ নেই যে দেশ জেগে উঠেছে। অবিবাহিত বাঙালী মেয়েরা, বাড়ীর নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে, পুরানো সংস্কার ভেঙ্গে বেরিয়ে আসছে—তা দেখে সবাই উৎসাহবোধ করতেন।"[৯১]

ক্রমেই বেশী বেশী সংখ্যায় ছাত্রীরা বেরিয়ে এসে পথসভা করতে শুরু করল, একা একা ট্রামে বাসে ট্রেনে চলাফেরা করতে থাকল, দলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করল,[৯২] প্রচার করল, ধর্মঘট সংগঠিত করল। এইভাবেই মেয়েরা ভাঙ্গলেন নারীসুলভ প্রচলিত জীবনযাত্রার রীতিনীতিগুলি।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে ১৯২০-র দশকে ছাত্রীদের দ্বারা নিজস্ব সংগঠন গড়তে শুরু করা। পূর্ববঙ্গে ছাত্রী আন্দোলনের প্রথম সংগঠিত ধাপ নিলেন ঢাকার দীপালী সংঘ। এই সংঘের ছাত্রী শাখাটি তৎপরতার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে মন দিলেন এবং ধর্ষিতা মেয়েদের পুনর্বাসন সহ মেয়েদের নানান সামাজিক অধিকার নিয়ে বিতর্ক সভা ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা করলেন। এরই পাশাপাশি চলল মেয়েদের ছোরা ও লাঠিখেলা শেখানো ও অন্যান্য আত্মরক্ষা ব্যবস্থাতে পটু করা।[৯৩]

আর একটি রাজনৈতিক সংস্থা ছিল কলকাতার ছাত্রী সংঘ। ১৯২৮-এ এর জন্ম। এর সভানেত্রী ছিলেন সুরমা মিত্র, সম্পাদিকা ছিলেন কল্যাণী ভট্টাচার্য। এর সদস্যাদের মধ্যে ছিলেন বীনা দাস ও কমলা দাসগুপ্তা। এর সদস্যাদের সাঁতার কাটতে ও আত্মরক্ষা করতে শেখানো হত। এঁদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন একনিষ্ঠ বিপ্লবী নেতা দীনেশ মজুমদার।[৯৪] এটি গোপন সংগঠন ছিল না এবং এর সদস্যা বাড়ানো হত। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটুশন, বেথুন স্কুল ও কলেজের বেশ কিছু ছাত্রী এই সংস্থার সদস্য হয়েছিলেন। কল্যাণী ভট্টাচার্যর মা ছাত্রী সংঘের সদস্যাদের থাকার জন্য একটি হোস্টেল খুলেছিলেন।[৯৫]

দীপালী সংঘ ও ছাত্রী সংঘের মধ্যে নিবিড় সংযোগ ছিল।

এদের সদস্যাদের মধ্যে ছিলেন বীনা দাস (জন্ম ১৯১১), প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (জন্ম ১৯১১) এবং কল্পনা দত্ত (জন্ম ১৯১৩)। ১৯৩০-এর দশকে এঁরা সবাই সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। এইসব সংগঠনের দু'জন প্রধান নেতা—লীলা রায় ও অনিল রায়—এবং বেশীর ভাগ সদস্যারা মোটের উপর সুভাষচন্দ্র বসুর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।[৯৬] ক্রমে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির (এ বি এস এ) মত অন্যান্য ছাত্র সংস্থাগুলিও মাথা তুলে দাঁড়াল—বিশেষ করে ১৯৩০-এর পরে। এইসব ছাত্র সংস্থানের একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল এই যে তারা মেয়েদের শক্তিকে পুরুষদের শক্তির সমতুল্য বলে গণ্য করতেন। তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন একদল স্বাধীনচেতা, দৃঢ় মনোবল-সম্পন্ন তরুণীকে যাঁরা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের আদর্শকে অন্য তরুণীদের মধ্যে প্রচার করতে দৃঢ়পণ ছিলেন। মোট কথা, ১৯২০র দশকের শেষে এবং ১৯৩০-এর দশকের গোড়ায় বাঙালী মেয়েদের একটা বড় অংশ রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সক্রিয় ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যেসব প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গেই মনে জাগে তা এই ঃ দেশের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক কাঠামোতে মেয়েদের প্রতি যে অবিচার করা হয়, তার সম্বন্ধে এঁরা কতটা সজাগ ছিলেন? এই কাঠামো ভাঙবার লক্ষ্য কি নিয়ে তাঁরা আন্দোলনে নেমেছিলেন? তাঁদের রাজনৈতিক অবদান কি তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছিল?

অনেকে বলেছেন যে, রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ হচ্ছে তাদের গৃহকর্মেরই একটা অন্য চেহারা মাত্র।

স্বদেশী আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে বরথউইক লিখছেন যে, "একই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আন্দোলন, সমাজব্যবস্থার মধ্যে অন্যান্য সম্ভাব্য বিরোধ থেকে দৃষ্টি কার্যকরী ভাবে সরিয়ে দিতে পেরেছিল।"[৯৮] ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকের আন্দোলনের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে একই কথার প্রতিধ্বনি করে তনিকা সরকারও বলছেন ঃ "ধর্মের মধ্যেই ডুবে গিয়েছিল দেশপ্রেম। চিরাচরিত সাংস্কৃতিক কাঠামোতে খাপ খেয়ে গিয়েছিল মেয়েদের রাজনীতিকরণ।"[৯৯]

তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের জীবনীতে[১০০] রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে তাঁদের বক্তৃতাবলীর যে চিত্র আমরা পাই, তা থেকে এইসব মন্তব্য যথার্থ মনে হয়। চিত্তরঞ্জন দাসের জীবনীগ্রন্থগুলিতে রাজনৈতিক নেত্রী বলে বাসন্তীদেবীর উল্লেখ নেই বললেই চলে।[১০১] চরমপন্থী নেতা বিপিন পালের স্মৃতিচারণে তাঁর মা ও ঠাকুরমা সম্বন্ধে দীর্ঘ রচনা রয়েছে, কিন্তু তাতে বলা হয়েছে আত্মত্যাগী গৃহকর্ত্রী রূপেই তাঁদের সপ্রশংস বর্ণনা রয়েছে।[১০২] আশালতা সেন বলেছেন যে, মেয়েদের চাকরী করা তিনি পছন্দ করতেন না এবং তিনি নিজে জেলে যাবার আগে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন যাতে তাঁর বর্ষীয়ান শ্বশুরের ঠিকমত দেখাশুনা করা হয়।[১০৩]

এইসব বাহ্যিক দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও, এই যুগে মেয়েদের চেতনাতে যে বিপুল রূপান্তর ঘটেছিল, তা আমাদের বুঝতে হবে। একথা আমরা অস্বীকার করি না যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেতনাই সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু সামাজিক চেতনাও তার খুব একটা পিছনে পড়ে ছিলনা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, তাদের নিরাপদ গৃহকোণ থেকে মেয়েরা বেরিয়ে এসেছিলেন, রাজনীতি ও ক্ষমতার জগতে, যেটা এতদিন ছিল একান্তভাবেই পুরুষদের নিজস্ব। বাইরের সমাজের সমস্যায় জড়িত হয়ে পড়লেন মেয়েরা। গান্ধীজি মেয়েদের যে বিশেষ আত্মনিবেদনের বা দেশপূজার কথা বলেছিলেন, তার যুক্তি যাই থাক না কেন, বাস্তবে ব্যক্তিগত জীবন, বাড়ীর সংসার ও সামাজিক দায়িত্ববোধ— এইসব খুলে, অল্প কিছু দিনের জন্য, মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। মেয়েদের জীবনে তার বিরাট প্রভাব পড়েছিল। শতাব্দীর শৃঙ্খল খানিকটা আলগা হয়ে গিয়েছিল।

গৃহকর্মে মেয়েদের ভূমিকার কথা এই যুগে অস্বীকার করা হয় নি ; কিন্তু মেয়েদের জীবনে মা বা স্ত্রী হওয়াই যে চরম পূর্ণতা এনে দেবে, একথা আর মানা হয় নি। কারণ বারবার বলা হল যে, মাতৃভূমির প্রতিও মেয়েদের একটা বড় দায়িত্ব আছে। তাছাড়া মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে নিকৃষ্ট, এ ধারণাও

পিছু হঠতে শুরু করল। কারণ মেয়েরা প্রমাণ করেছিলেন যে, তাঁরা "কাপুরুষ" নন, তাঁরাও পুরুষদের সমানই কঠিন লড়াই চালাতে পারেন।[১০৪]

মেয়ে-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই মেয়েদের শক্তি সম্বন্ধে এই বিশ্বাস, ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে দৃঢ়তর হল। বীনা মজুমদার লিখছেন ঃ "এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে আইন অমান্য আন্দোলনে মেয়েদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণই (স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের কোনও প্রগতিবাদী মতবাদ থেকে নয়) শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস দলের ভিতরে ও আরও পরে সংবিধান পরিষদে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের সপক্ষে পাল্লা ভারী করেছিল। তারজন্যই এ প্রশ্ন বা তার তাৎপর্য নিয়ে তেমন কোনও বিতর্ক আর হল না।"[১০৫] কংগ্রেস দল ও তার নেতৃত্ব সম্বন্ধে এটি একটি যথাযথ বর্ণনা। তবে এতেও কোনও সন্দেহ নেই যে, ক্রমেই বেশী বেশী করে মহিলা রাজনৈতিক নেত্রীরা ও কর্মীরা মেয়ে হিসাবে তাঁদের সামাজিক অসুবিধাদি সম্বন্ধে সচেতন হলেন ও সবরকম বন্ধনমুক্তির জন্যই অধীর হয়ে উঠলেন।

মহাফেজখানাতে তেমন কোন দলিলও নেই, সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবও নেই, যার মাপকাঠিতে আমরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও সামাজিক চেতনালাভ এই দুইয়ের মধ্যে মেয়েদের চেতনার স্তর কিভাবে বিকশিত হল, তার জোরালো প্রমাণ দিতে পারি। তবে পরোক্ষ প্রমাণ যথেষ্টই আছে। বহু মেয়েই সমান দৃঢ়তা নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছেন।[১০৬] সরলাদেবী চৌধুরাণী থেকে শুরু করে আশালতা সেন পর্যন্ত, রাজনৈতিক মহিলা সংগঠকরা সবাই নিপীড়িত ও দুর্গত মেয়েদের সাহায্য করতে সংগঠন গড়েছেন, প্রমাণ রেখে গেছেন যে মেয়েদের সামাজিক পরিবেশ বদল করার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদের বক্তৃতা ও লেখা থেকে দেখা যায় যে, একদিকে মেয়েদের উপর প্রাতিষ্ঠানিক উৎপীড়ন সম্বন্ধে তাঁরা সজাগ, অন্যদিকে মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতালাভের দাবীতেও তাঁরা সোচ্চার।[১০৭] একথা বলা যায় যে রাজনৈতিকভাবে সচেতন মেয়েরা বুঝেছিলেন যে, এই পুরুষ-প্রধান সমাজে এক ধরনের অন্যায় ও অবিচার, সর্বক্ষেত্রেই প্রসারিত হতে পারে।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জীবন এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আত্মহত্যা করে যে চিঠি তিনি রেখে যান তাতে লেখা ছিল যে, মেয়েদের ভারতীয় সমাজে জোর করে নীচে ঠেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক জগতে আত্মদান করে মেয়েরা এখন প্রমাণ করছেন যে-কোনও অংশেই তাঁরা পুরুষদের চেয়ে কম নন।[১০৮] এই চিঠি থেকে স্পষ্ট যে, মেয়ে হিসাবে তাঁদের উৎপীড়িত

অবস্থা সম্বন্ধে প্রীতিলতা সচেতন ছিলেন। এই সূত্রে বলা উচিত যে, তিনি দীপালী সংঘের সদস্যা ছিলেন, যে সংঘ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির পতাকাবাহী ছিল।

১৯৩১-এ একটি উল্লেখযোগ্য গল্প বেরিয়েছিল। তাতে পুলিশের গাড়ীতে বন্দিনী রূপে চড়বার সময় একজন মেয়ে আর একজন বন্দিনীকে বলছেন: "এতদিন আমরা একটা ছোট শ্বশুরবাড়ীতে বন্দী ছিলাম এবার বন্দী হতে চলেছি একটা বড় শ্বশুরবাড়ীতে।"[১০৯] যদিও কথাগুলি ঠাট্টার সুরেই বলা, তবু মাঝে মাঝে মনে হয় যে, মেয়ে রাজনৈতিক কর্মীরা কি ঐ পথ বেছে নিয়েছিলেন, বাড়ীর বন্দীত্ব থেকে ছাড়া পাবার জন্য ?

মেয়েদের চেতনার রূপান্তরের একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে মেয়েদের নিজেদের মধ্যেই মূল্যবোধের বড় রকম পরিবর্তন। একে অবশ্য পিতৃতান্ত্রিক প্রভাব থেকে পরিপূর্ণ "নারীমুক্তির" দিকে যাত্রা বলা যাবে না। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যে চিরাচরিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রচারক ছিলেন, এইসব মেয়েরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শুধু ঘরের কোণে জীবনযাপনের বদলে বাইরের জগতে মেয়েরা সোচ্চার মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁরা বলতেন যে, বাড়ীতেই হোক আর বাইরের জগতেই হোক, পুরুষদের একাধিপত্য আর চলবে না।[১১০]

পুরাতন ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সংঘাতকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এক ঠাকুরমা ও নাৎনীর মধ্যে কল্পিত বিতর্কে। ঠাকুরমা বলছেন যে ঘরই হচ্ছে মেয়েদের উপযুক্ত স্থান, আর নাৎনী বলছে যে বাইরের জগতেই বাস্তবে, মেয়েরা অর্জন করতে পারবে মর্যাদা, সম্মান ও ক্ষমতা। "আমরা সবাই মা বা স্ত্রী হব—এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু আমরা সবাই চাই আত্মবিকাশ।"[১১১] এই বিতর্কের লেখিকা হচ্ছেন স্বনামধন্য কামিনী রায়, যিনি মেয়েদের ভোটাধিকার চেয়ে যোগ দিয়েছিলেন সোৎসাহে বঙ্গীয় নারী সমাজে। মেয়েদের অধিকারের জন্য তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

পুরুষপ্রধান সমাজকে উপেক্ষা করে মেয়েরা রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন নি। বরঞ্চ এ কাজে তাঁদের প্রথম উৎসাহ দিয়েছেন পুরুষরাই। এর ফলে জীবন সম্বন্ধে, পৃথিবী সম্বন্ধে, নিজেদের সম্বন্ধে মেয়েদের ধ্যানধারণা পাল্টে গেল। এল একটা গভীর আত্মবিশ্বাস।[১১২] এই রূপান্তরের ব্যাপ্তি ও গভীরতাকে অতিরঞ্জিত করে দেখা যেমন ঠিক হবে না, তেমনই তা ছোট করে দেখা বা সমাজজীবনে মেয়েদের ব্যাপক প্রবেশের তাৎপর্যকে অবহেলা করাও অনুচিত হবে।

তবে, নিজেদের জীবন যে বহু বাধার নিগড়ে আবদ্ধ মেয়েদের এই সামগ্রিক চেতনা ও সেই শৃঙ্খল মোচনের জন্য তাদের প্রচেষ্টা, সবটাই রাজনৈতিক কার্যকারণে ঘটে নি। দেশজ সাহিত্যও এ ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতে জাতীয়তাবাদ একটা সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিগত চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছিল। একটা জাতির অন্যতম প্রধান পরিচয় তার ভাষা ও সাহিত্যে—এ কথা স্বীকৃত হয়েছিল। ফলে মাতৃভাষার ও মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। অন্যান্য রাজ্যের মত, বাংলাদেশেও মেয়েদের উপর এই সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিগত আন্দোলনের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। শুধু তাই নয়, ১৯১১-৩০ পর্বে গড়ে উঠল, মেয়েদের নানা রাজনৈতিক সংগঠন। এর ফলেও রাজনৈতিক আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণ সহজ হয়।

উপসংহার

এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে মেয়েদের ধ্যানধারণার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেল। এ কথা অবশ্যই বলা হচ্ছে না যে তাদের জাগরণ সম্পূর্ণ হয়েছিল অথবা সব মধ্যবিত্ত মেয়েরাই এইসব নতুন ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষত সঙ্কটের সময়ে, পুরানো ধ্যানধারণা এমনকি প্রগতিবাদী মেয়েদের চিন্তাকেও আচ্ছন্ন করেছে। সংসারের টানে বাইরের জগতের ডাক ম্লান হয়ে এসেছে। আন্দোলনটির নেতৃত্ব ছিল অভিজাতদের হাতে, গণভিত্তিও ছিল সঙ্কীর্ণ। মধ্যবিত্ত কাঠামোর মধ্যেও যেসব মৌলিক প্রশ্ন তোলা যেত, তাও সম্ভব হয় নি। নারীদেহ একান্তভাবে মেয়েদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা উচিত, এ দাবী এঁরা তোলেন নি। পরিবার পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেবার সময় মেয়েদেরও একটা ভূমিকা আছে, এ দাবীও জোরালো হয় নি। স্বামীকেও স্ত্রীর গৃহকর্মে সাহায্য করতে হবে—এ কথা ওঠে নি বললেই চলে। মাতৃত্বই থেকে গেল সবচেয়ে গর্বের ধন। মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবী উত্থাপিতই হল না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেয়েরা যে সমস্যাজর্জর, তার সামগ্রিক চেতনা এখনও অনুপস্থিতই রইল এবং এর সঙ্গে ভারতের ঔপনিবেশিক সত্তারই বা কি সম্পর্ক, তা আলোচিত হল না।

তবে, এ কথা মানতেই হবে যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের মেয়েদের উপর ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলের ও চিরাচরিত ঐতিহ্যের যে পিছুটান ছিল, তাকে পরাজিত করা ছিল তাদের সাধ্যাতীত। ইতিহাসের বিচারে, মেয়েদের

সামাজিক মুক্তি কখনও বিচ্ছিন্নভাবে আসতে পারে না। স্ত্রীপুরুষের মধ্যেকার অসাম্য, সমাজের অন্যান্য অসাম্যর সঙ্গেই যুক্ত। "ভারতের বিভিন্ন অংশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের অংশ হিসাবেই গড়ে উঠেছিল মেয়েদের আন্দোলন"[১১৩]—এটাই চূড়ান্ত রায়। তাসত্ত্বেও এই শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছরে, যত সীমাবদ্ধই হোক, বাঙালী মেয়েরা নেমেছিলেন এক দুঃসাহসী অভিযানে—সামাজিক মুক্তির জন্য। তাঁদের উত্তরসূরীদেরই দায়িত্ব, শ্রেণী, জাতপাত ও স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ নির্বিশেষে এক বিকল্প মুক্ত মানবজীবন গড়তে এগিয়ে যাওয়া।

[ইংরেজি মূল প্রবন্ধ থেকে ভাষান্তর ঃ সৌমিত্র সরকার]

সূত্রনির্দেশ

১ নারী মুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য দ্রষ্টব্য গার্ডা লারনার, "দ্য নেসেসিটি অফ হিস্টরি অ্যাণ্ড দ্য প্রফেশনাল হিস্টোরিয়ান", দ্য জার্নাল অফ আমেরিকান হিস্টরি, ৬৯ বর্ষ, ১ সংখ্যা, জুন, ১৯৮২ ; স্যালি আলেকজাণ্ডার, "উইমেনস ওয়ার্কস ইন নাইনটিনথ সেঞ্চুরি লণ্ডন ঃ এ স্টাডি অফ দ্য ইয়ারস ১৮২০-৫০", দ্রঃ জুলিয়েট মিচেল ও এ ওকলি (সম্পা.), দ্য রাইটস অ্যাণ্ড রংস্ অফ উইমেন, হারমনডস্ওয়ার্থ, ১৯৭৬ ; শীলা রোবথাম, উইমেনস্ কনশাসনেস্ ঃ মেনস্ওয়ার্ল্ড, হারমনডস্ওয়ার্থ, ১৯৭৩ ; ঐ, হিডিন ফ্রম হিস্টরি, লণ্ডন, ১৯৭৭ ; যোয়ান কেলি, উইমেন, হিস্টরি অ্যাণ্ড থিয়োরী, শিকাগো, ১৯৮৪ ; গেইল মিনল্ট "উইমেন অ্যাণ্ড হিস্টরি ; সাম থিয়োরিটিক্যাল কনসিডারেশনস্", দ্রঃ সাম্যশক্তি, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৯৮৩। আরো দ্রষ্টব্য, মারিয়া মাইস্, "মার্ক্সিস্ট সোশালিজম অ্যাণ্ড উইমেনস্ এমানসিপেশন", দ্রঃ মারিয়া মাইস ও কুমারী জয়বর্ধনে (সম্পা.), ফেমিনিজম্ ইন ইয়োরোপ, হেগ, ১৯৮৩।

২ কেটি মিলেট তার সেক্সুয়াল পলিটিকস্ শীর্ষক অসাধারণ পুস্তকে (ভিরাগো, ১৯৭০) মন্তব্য করেছেন (পৃ ৪৬) যে, বর্তমান নারীজাতির প্রতিকৃতি পুরুষসমাজ তাদেরই প্রয়োজনসিদ্ধ করতে গড়ে তুলেছে।

৩ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রঃ ভারতী রায়, "বেঙ্গলী

উইমেন ইন দেয়ার ট্রানজিশন টু মডার্নিটি", বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট, জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ১৯৮৫।

৪ দ্রঃ দ্য ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল জার্নাল, ৯ বর্ষ, ২ সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, ১৯৮৫।

৫ যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন, তাদের কাছে সেদিনের প্রতিজ্ঞা ছিল "এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা, যা প্রায় আধ্যাত্মিক পর্যায়ের"। দ্রঃ বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, দ্য স্কোপ অফ হ্যাপিনেস: এ পারসোনাল মেমোয়ার, নতুন দিল্লী, ১৯৭০, পৃ ৯২।

৬ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সকলেরই জানা; তাই তা এই প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হয় নি।

৭ এই আইনের ফলে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স হল পনেরো এবং ছেলেদের আঠারো।

৮ 'জাতীয়তাবাদ' কথাটি ব্যাপক অর্থে নিতে হবে। বস্তুত, প্লামেনাজের মত অনুসারে, জাতীয়তাবাদ হল "মূলত একটি সাংস্কৃতিক ব্যাপার" যদিও তা প্রায়ই "রাজনৈতিক মোড়" নেয়। দ্রঃ জন প্লামেনাজ, "টু টাইপস্ অফ ন্যাশানালইজম", উদ্ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ন্যাশানালিস্ট থট অ্যাণ্ড দ্য কলোনিয়াল ওয়ার্ল্ড: এ ডেরিভেটিভ ডিসকোর্স, লণ্ডন, ১৯৮৬, পৃ ১।

৯ রিপোর্ট অফ দ্য কমিটি অন দ্য স্ট্যাটাস্ অফ উইমেন ইন ইণ্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৭৪।

১০ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রঃ এ. এস. আলটেকার, দ্য পজিশন অফ উইমেন ইন হিন্দু সিভিলাইজেশন, বেনারস, ১৯৫৬ এবং কে. এম. কাপাদিয়া, হিন্দু কিনশিপ, বোম্বাই, ১৯৪৭। তাছাড়া দ্রঃ ভারতী রায়, "বিয়ণ্ড দ্য ডমেস্টিক। পাবলিক ডাইকোটমি: উইমেনস্ হিস্টরি ইন বেঙ্গল, ১৯০৫-১৯৪৭", দ্রঃ নিশীথরঞ্জন রায় (সম্পা.) বেঙ্গল: এ সোসিও-ইকনমিক সারভে, ২য় সং (প্রকাশিতব্য)।

১১ পেগি. আর স্যানডে, "ফিমেল স্ট্যাটাস্ ইন দ্য পাবলিক ডোমেইন" দ্রঃ মিচেল রোসালডো ও লুইস্ ল্যাম্পহিয়ার (সম্পা.), উইমেন, কালচার অ্যাণ্ড সোসাইটি, স্ট্যানফোর্ড, ১৯৭৪, পৃ ১৯০।

১২ দ্রঃ এ. মুবলি, "পারস্পেকটিভ অন উইমেনস লিবারেশন: অন্ধ্র ইন দ্য নাইনটিনথ অ্যাণ্ড দ্য আর্লি টুয়েনটিথ সেঞ্চুরিজ", স্টাডিজ ইন হিস্টরি, ৩ বর্ষ, ১ সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, ১৯৮৭, পৃ ১১৭। আমার 'স্বদেশী আন্দোলন ও নারী জাগরণ' শীর্ষক পূর্বোক্ত প্রবন্ধের যুক্তিও অনুরূপ।

১৩ আশাপূর্ণা দেবী, সুবর্ণলতা, ২য় সং, কলকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৭৭।

১৪ এ রকমই সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে, নারী শিক্ষিত হলেই বিধবা হবে।

১৫ কৈলাশবাসিনী দেবী, হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা, কলকাতা, ১৮৬৩, পৃ ৬১।

১৬ দ্রঃ নিমাইসাধন বসু, দ্য ইণ্ডিয়ান অ্যাওকেনিং অ্যাণ্ড বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৬০ ; ডেভিড কফ, দ্য ব্রাহ্মসমাজ অ্যাণ্ড দ্য শেপিং অফ দ্য মডার্ন ইণ্ডিয়ান মাইণ্ড, প্রিন্সটন, ১৯৭৯ ; কে. এন. পানিক্কর "দ্য ইনটেলেকচুয়াল হিস্টরি অফ কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া : সাম হিস্টোরিয়োগ্রাফিক্যাল অ্যাণ্ড কনসেপশনাল কোয়েশ্চনস্" দ্রঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও রমিলা থাপার (সম্পা.) সিচুয়েটিং ইণ্ডিয়ান হিস্টরি, দিল্লী, ১৯৮৬, পৃ ৪২৮।

১৭ তুলনীয়, অশোক সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অ্যাণ্ড হিজ এলুসিভ মাইলস্টোনস, কলকাতা, ১৯৭৭।

১৮ বীণা মজুমদার, "দ্য সোসাল রিফর্ম মুভমেণ্ট ফ্রম র‍্যানাডে টু নেহরু," দ্রঃ বি. আর, নন্দা (সম্পা.) ইণ্ডিয়ান উইমেন : ফ্রম পর্দা টু মডারনিটি, নতুন দিল্লী, ১৯৭৭।

১৯ এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রঃ মেরিডিথ বর্থউইক, "দ্য চেঞ্জিং রোল অফ উইমেন ইন বেঙ্গল, ১৯৪৯-১৯০৫"। প্রিন্সটন, ১৯৮৪, অধ্যায় ৩ এবং ৬।

২০ ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে অন্য কাজও করতেন ভালোভাবেই। দ্রঃ পুণ্যলতা চক্রবর্তী, ছেলেবেলার দিনগুলি, কলকাতা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, পৃ ১২ ; প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার নারী জাগরণ, কলকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

২১ মধুসূদন রচনাবলী, কলকাতা, ১৯৭৭।

২২ বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

২৩ রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিক সং, ৫ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৬১।

২৪ হীরেন মুখার্জী, ইণ্ডিয়াজ স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ ২১, ৯১।

২৫ ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ঔপনিবেশিক বিরোধের জন্য দ্রঃ বিপান চন্দ্র, দ্য রাইজ অ্যাণ্ড গ্রোথ অফ ইকনমিক ন্যাশানালইজম ইন ইণ্ডিয়া, নতুন দিল্লী, ১৯৬৬ এবং ন্যাশানালইম অ্যাণ্ড কলোনিয়ালইজম ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া, নতুন দিল্লী, ১৯৭৯, পৃ ১৪৬-৪৭।

২৬ বিস্তারিত দ্রঃ সুমিত সরকার, দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট ইন বেঙ্গল, ১৯০৩ ১৯০৮, নতুন দিল্লী, ১৯৭৩।

২৭ রবীন্দ্রনাথ এই সময়কার রচিত একটি সঙ্গীতে বাংলাকে দেবী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করেছেন ; অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন ভারতমাতার বিখ্যাত চিত্র।

২৮ দেবী কালিকা বা মা-কালীর মূর্তি "পুরুষত্বের উপর নারীত্বের প্রাধান্যের রূপক।" অশোক রুদ্র, "কালচারাল অ্যাণ্ড রিলিজিয়াস এক্সপিরিয়েন্স", দ্রঃ দেবকী জৈন (সম্পা.), ইণ্ডিয়ান উইমেন, দিল্লী, ১৯৭৮, পৃ ৪৯।

২৯ বাংলায় সর্ববৃহৎ উৎসব দুর্গাপূজায় দেবী দুর্গা মহিষাসুর নিধন করছেন, এই প্রতিবিম্বিত হয়।

৩০ পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দ্রঃ ভারতী রায়, "স্বদেশী আন্দোলন ও নারী জাগরণ", পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

৩১ সতীশ পাকড়াশি, অগ্নিদিনের কথা, কলকাতা, ১৯৪৭, পৃ ৯৭।

৩২ আশালতা সেন, আওয়ার উয়োম্যানস্ সাগা (টাইপ কপি), পৃ ৪।

৩৩ রজতকান্ত রায়, সোস্যাল কনফ্লিক্ট অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল, ১৮৭৫-১৯২৭, দিল্লী, ১৯৮৪, পৃ ১৫০-৮৫ এবং ২২৫-৩০।

৩৪ বেঙ্গল পিস্গুডস্ মারচেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদকের লেখা গান্ধীকে পত্র, তাং ৩১ মে ১৯২৮। কংগ্রেস—কাগজপত্র (দিল্লীর নেহরু মেমোরিয়াল লাইব্রেরী ও মিউজিয়ামে রক্ষিত), ফাইল নং জি-৪৮।

৩৫ সব্যসাচী ভট্টাচার্য, "কটন মিলস্ অ্যাণ্ড স্পিনিং হুইলস্ : স্বদেশী অ্যাণ্ড দ্য ইণ্ডিয়ান ক্যাপিটালিস্ট ক্লাশ", দ্রঃ কে. এন. পানিক্কর, ন্যাশানাল অ্যাণ্ড দ্য লেফট মুভমেণ্টস্ ইন ইণ্ডিয়া, নতুন দিল্লী, ১৯৮০।

৩৬ দৈনিক বসুমতী, ৮ ডিসেম্বর ১৯২১। দৈনিক ভারতমিত্র, ৮ ডিসেম্বর ১৯২১। দুটোই নেওয়া হয়েছে রিপোর্ট অফ দ্য নেটিভ নিউজপেপারস্ ইন বেঙ্গল, রাজ্য মহাফেজখানা, পঃ বঙ্গ থেকে (পরে শুধু 'রিপোর্ট' নামে উল্লিখিত)।

৩৭ যেমন, ধূমকেতু, ১৭ অক্টোবর ১৯২২, সূত্র পূর্বোক্ত 'রিপোর্ট'।

৩৮ ভি. এস. নারাভানে, সরোজিনী নাইডু : এন ইনট্রোডাকশন টু হার লাইফ, ওয়ার্ক এ্যাণ্ড পোয়েট্রি, নিউ দিল্লী, ১৯৮০, পৃঃ ৮০-৮২।

৩৯ সুচেতা কৃপালনি, মৌখিক সাক্ষ্য- (রক্ষিত আছে নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে) ভিত্তিক রচনা, পৃ ১৬। কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এই মত সমর্থন করেন। দ্রঃ তার ইনার রিসেসেস, আউটার স্পেসেস : মেমোয়ারস্, নতুন দিল্লী, ১৯৮৬, পৃ ৪৭।

৪০ ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮। নারীজাতি সম্বন্ধে গান্ধীর মতের জন্য দ্রঃ তাঁর উইমেন অ্যাণ্ড সোসাল জাস্টিস, আমেদাবাদ, ১৯৫৪।

৪১ বিপিনচন্দ্র পাল, মেমোয়ারস্ অফ মাই লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস্, ২ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৩২। পৃথ্বিশচন্দ্র রায়, লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস অফ সি. আর. দাস, লণ্ডন, ১৯২৭।

৪২ কমলা দাশগুপ্তা, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, কলকাতা, ১৯৬৩।

৪৩ বাসন্তীদেবীর কন্যা কল্যাণীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১৯ এপ্রিল, ১৯৮৩।

৪৪ ১৯১৭, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ।

৪৫ হোমরুল আন্দোলন সম্বন্ধে তার নিজের মতের জন্য দ্রঃ অ্যানি বেসান্ত, দ্য ফিউচার অফ ইণ্ডিয়ান পলিটিকস্ (১৯২২) এবং ইণ্ডিয়া বণ্ডেড অর ফ্রি (১৯২৬)।

৪৬ কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, মৌখিক সাক্ষ্য (নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম), পৃ ৬।

৪৭ মার্গারেট কাজিন্স, ইণ্ডিয়ান উওম্যানহুড টুডে, এলাহাবাদ, ১৯৪১। জে. এইচ. কাজিন্স ও এম. ই. কাজিন্স, উই টু টুগেদার, মাদ্রাজ, তারিখ নেই ; এম. ই. কাজিন্স, দ্য অ্যাওকেনিং অফ এশিয়ান উওম্যানহুড, দিল্লী, তারিখ নেই।

৪৮ হানা সেন, "আওয়ার ওন টাইমস", দ্রঃ তারা আলি বেগ (সম্পা.), উইমেন অফ ইণ্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৫৮, পৃ ৩৫।

৪৯ জেরালডিন ফরবস্, "ভোটস্ ফর উইমেন : দ্য ডিমাণ্ড ফর উইমেনস ফ্রানচাইজ ইন ইণ্ডিয়া", দ্রঃ বীণা মজুমদার (সম্পা.), সিম্বলস্ অফ পাওয়ার : স্টাডিজ অন দ্য পলিটিক্যাল স্ট্যাটাস অফ উইমেন ইন ইণ্ডিয়া, নতুন দিল্লী, ১৯৭৯।

৫০ বীণা মজুমদার, তদেব, 'ভূমিকা'।

৫১ বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, পূর্বোক্ত।

৫২ এই অসাধারণ মহিলার বিষয়ে সমসাময়িক মূল্যায়নের জন্য দ্রঃ এস. সোরাবজী, "রমাবাঈ রানাডে", দ্রঃ ই. সি. গেজ ও এম. চোকসি, উইমেন ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া, বোম্বাই, ১৯২৯।

৫৩ অবলা বসু (জন্ম ১৮৬৫) সমাজ-সংস্কারক দুর্গামোহন দাসের কন্যা এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী।

৫৪ অরুণা আসফ আলি, "উইমেনস্ সাফারেজ ইন ইণ্ডিয়া", দ্রঃ এস. কে. নেহরু (সম্পা.) আওয়ার কজ, এলাহাবাদ, তারিখ নেই, পৃ ৩৫১-৫৭ ; জেরালডিন ফরবস্, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ ৪-৮।

৫৫ অপর্ণা বসু (সম্পা.), দ্য পাথ ফাইণ্ডার, নিউ দিল্লী, ১৯৮৬ এবং অটোবায়োগ্রাফি অফ মিসেস মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী, মাদ্রাজ, ১৯৬৪।

৫৬ কুমুদিনী ছিলেন লীলাবতী ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকথার জন্য দ্রঃ প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

৫৭ কামিনী রায়, কবি, শিক্ষয়িত্রী, সমাজ-সংস্কারক সম্বন্ধে 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' দ্রষ্টব্য।

৫৮ মৃণালিনী সেনের আত্মজীবনী নকিং অ্যাট দ্য ডোর, কলকাতা, ১৯৫৪।

৫৯ জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, শিক্ষাব্রতী, দেশপ্রেমিকা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী।

ইনি ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। প্রবাসী, পৌষ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ দ্রষ্টব্য।

৬০ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিংস্, ভল্যুম ৪, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২১।

৬১ ঐ, ভল্যুম ১১, ২৯ জানুয়ারি, ১৯২৩।

৬২ দ্রষ্টব্য তার সুলিখিত আত্মজীবনী, জীবনের ঝরাপাতা, কলকাতা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

৬৩ বিস্তারিত বিবরণের জন্য, দ্রঃ বারবারা সাদার্ড, "প্লানজ ইনটু পলিটিকস্ : দ্য ডেভেলোপমেন্ট অফ পলিটিকাল কনশাসনেস অ্যামং বেঙ্গলী উইমেন রিফরমারস্ ইন দ্য ডায়ার্কি এরা" (অপ্রকাশিত)। ফিলাডেলফিয়াতে (১৯৮৫) অ্যাসোসিয়েশন ফর এশিয়ান স্টাডিজ-এর বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ।

৬৪ এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধু মন্তব্য করেন যে, যেহেতু তাঁর মায়ের ডাক, তাই তাঁর স্ত্রী অলসভাবে বসে থাকতে পারেন নি। দৈনিক ভারতমিত্র, ৮ ডিসেম্বর, ১৯২১।

৬৫ বাংলার কথা, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২১। অপিচ দ্রষ্টব্য একই পত্রিকার ২৮ ডিসেম্বর ১৯২১ সংখ্যায় উর্মিলাদেবীর প্রবন্ধ 'প্রাণের কথা'।

৬৬ অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৯২২। 'রিপোর্ট' থেকে।

৬৭ ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতির জন্য গ্রামীণ মেয়েদের ভূমিকা খর্ব হয়েছিল।

৬৮ দ্য নিউ এম্পায়ার, ১৭ এপ্রিল, ১৯২২। দৈনিক বসুমতী, ২৪ এপ্রিল, ১৯২২। সূত্র—'রিপোর্ট'।

৬৯ কমলা দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫২-৫৩।

৭০ তিনি পার্টির জেনারেল কাউন্সিল মিটিং-এ (বোম্বাই, ১৯২৩) উপস্থিত ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে। পরে ১৯৩৭-এ তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত হন।

৭১ কমলা দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫৪-৫৬।

৭২ দৈনিক বসুমতী, ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২। সূত্র—'রিপোর্ট'।

৭৩ প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৫ এবং পৌষ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

৭৪ লক্ষ্মী মেনন, "উইমেন অ্যাণ্ড ন্যাশানাল মুভমেন্ট", দ্রঃ দেবিকা জৈন (সম্পা.) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৪।

৭৫ গভর্ণমেন্ট অফ বেঙ্গল, হোম পলিটিকাল ফাইল নং ৪৮, সিরিজ ১-৮, ১৯২২ (রাজ্য মহাফেজখানা, পঃ বঙ্গ)।

৭৬ তদেব। দ্রঃ 'নোট অন ফিমেল অ্যাজিটেশন' (আর. ক্লার্ক লিখিত)।

৭৭ আশালতা সেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫-৬।

৭৮ দৈনিক বসুমতী, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২। স্বতন্ত্র, ৯ ডিসেম্বর, ১৯২২। সূত্র—'রিপোর্ট।

৭৯ হিন্দুস্থান, ৮ ডিসেম্বর, ১৯২১। দৈনিক বসুমতী, ৮ ডিসেম্বর, ১৯২১। হিন্দুস্থান, ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২। সূত্র—'রিপোর্ট'।

৮০ ভারতে ১৯০০-১৯১৩ পর্বে বিপ্লবী নারী আন্দোলন বিষয়ে দ্রঃ এম. কাউর, উইমেন ইন ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল, নতুন দিল্লী, ১৯৮৫, পৃ ৮৯-১০১।

৮১ ভারতী রায়, 'স্বদেশী আন্দোলন ও নারী জাগরণ' পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

৮২ লীলা রায়ের যোগ্য সহকর্মী ছিলেন রেণুকা সেন (জন্ম ১৯০৯)। ইনি ছাত্রীদের এক হোস্টেল এবং কলকাতায় দীপালী সংঘের এক শাখা স্থাপন করেন।

৮৩ যোগেশচন্দ্র বাগল, 'রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বাঙালি মহিলা', দ্রঃ কালিদাস নাগ (সম্পা.) বেথুন কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল সেন্টেনারী ভল্যুম, কলকাতা, ১৯৪৯ পৃ ২৩২-৩৩।

৮৪ মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, ''সন্তোষকুমারী দেবী: এ পাইয়োনীয়ার লেবার লীডার'', দ্রঃ সোসাল সায়েন্টিস্ট, সংখ্যা ১২৮, জানুয়ারি, ১৯৮৪।

৮৫ তনিকা সরকার, "পলিটিকস অ্যাণ্ড উইমেন ইন বেঙ্গল দ্য কণ্ডিশন অ্যাণ্ড মিনিং অফ পার্টিসিপেশন'', ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোসাল হিস্টরি রিভিউ, ২১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৯৮৪, পৃ ৯২।

৮৬ ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের আকর্ষণীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, ''প্রথম যেদিন ধরা পড়ি'', মন্দিরা, ১১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৯৪৮। আরো দ্রঃ ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, চলার পথে, কলকাতা, ১৯৩১।

৮৭ কল্পনা যোশীর সঙ্গে লেখিকার সাক্ষাৎকার, ১৯৮৬।

৮৮ ১৯২০-এর মধ্যে শহুরে বাঙালী হিন্দুসমাজের একটা বড় অংশ মনে করতে শুরু করলেন যে তাদের মেয়েদের কিছু শিক্ষা দিতেই হবে। দ্রঃ লক্ষ্মী মিত্র, এড্‌কেশন অফ উইমেন ইন ইণ্ডিয়া, ১৯২১-৬৬, বোম্বাই, ১৯৬৬, পৃ ৪২। ভারত মহিলা, ৭ বর্ষ, ৫ সংখ্যা (১৯১১-১২) আগেই অন্তত স্কুল-গণ্ডী পর্যন্ত শিক্ষা বাঙালী হিন্দু মেয়েদের দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

৮৯ দৈনিক বসুমতী, ১০ ডিসেম্বর, ১৯২১। সূত্র—'রিপোর্ট'।

৯০ রেণুকা রায়, মাই রেমিনিসেন্সেস, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ ১৬, ২৪-৩০।

৯১ উর্মিলা দেবী, চিত্রা, বাংলার কথা, ৪ নভেম্বর, ১৯২১।

৯২ মনিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ ৪৬। সুপ্রিয়া আচার্যের সঙ্গে লেখিকার সাক্ষাৎকার একই তথ্য দেয়।

৯৩ লীলাবতী নাগ, 'দীপালি', বঙ্গলক্ষ্মী, ৫ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ১৯২৯-৩০।

৯৪ কমলা দাসগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়মে রক্ষিত)।

৯৫ কল্যাণী ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (একই স্থানে রক্ষিত)।

৯৬ কুমারী জয়বর্ধনে, ফেমিনিজম্ অ্যাণ্ড ন্যাশানালইজম ইন দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড, নিউ দিল্লী, ১৯৮৬, পৃ ১০৪।

৯৭ ঐ, পৃ ১০৫। অপিচ, রেণু চক্রবর্তী, কমিউনিস্টস্ ইন ইণ্ডিয়ান উইমেনস্ মুভমেন্ট, নতুন দিল্লী, ১৯৮০।

৯৮ মেরিডিথ বর্থউইক, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩৬১।

৯৯ তনিকা সরকার, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ ৯৮।

১০০ যেমন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী, এ নেশন ইন মেকিং, লণ্ডন, ১৯৬৩।

১০১ পৃথ্বিশচন্দ্র রায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

১০২ বিপিনচন্দ্র পাল, "সমসাময়িক কথা", নব্যভারত, ৪০ বর্ষ, ১ সংখ্যা ১৯২২।

১০৩ আশালতা সেনের সঙ্গে লেখিকার সাক্ষাৎকার (অক্টোবর ১৯০৫)।

১০৪ হিন্দুস্থান, ৮ ডিসেম্বর, ১৯২১। সূত্র—'রিপোর্ট'।

১০৫ বীণা মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 'ভূমিকা'।

১০৬ বাংলার বাইরের ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

১০৭ দ্রষ্টব্য, সরলাদেবী চৌধুরাণী, "সিংহের বিবরে", বঙ্গবানী, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা ; উর্মিলা দেবী, "প্রাণের কথা", বাংলার কথা, ৪ নভেম্বর, ১৯২১।

১০৮ অনন্ত সিংহ, সুর্য সেনের স্বপ্ন ও সাধনা, কলকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ ৯৫-৯৯।

১০৯ মৈত্রেয়ী দেবী, বাইরের আহ্বান, জয়শ্রী, ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা (১৯৩১-৩২)।

১১০ এ চক্রবর্তী, 'নারীত্বের আদর্শ', বঙ্গলক্ষ্মী, ৫ বর্ষ ৪ সংখ্যা, (১৯২৯-৩০)।

১১১ কামিনী রায়, ঠাকুমার চিঠি, কলকাতা, ১৯২৪।

১১২ কে. এন. পানিক্কর মত প্রকাশ করেছেন যে নারী জাতির সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশের ফলে "নারীসমাজ ক্রমেই নিজেদের বন্দীভাব

সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে এবং তাঁরা পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় রত।" দ্রঃ পানিক্করের 'ভূমিকা', স্টাডিজ ইন হিস্টরি, ৩ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃ ৭।

১১৩ ভারতীয় সাহিত্যে ঔপনিবেশিক প্রভুদের প্রতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনোভাবের প্রতিফলনের জন্য দ্রষ্টব্য সুধীর চন্দ্রের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা, "লিটারেচার অ্যাণ্ড দ্য কলোনিয়াল কোশ্চেন", তাঁর স্ব-সম্পাদিত সোশাল ট্রানস্‌ফরমেশস অ্যাণ্ড ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন গ্রন্থে (নতুন দিল্লী, ১৯৮৪)।

১১৪ যোগমায়া দেবী (জন্ম ১৯০২), উষাবালা দেবী (জন্ম ১৯০৫) এবং জ্যোতির্ময়ী দেবী (জন্ম ১৮৯৮)-এর সঙ্গে লেখিকার সাক্ষাৎকার।

১১৫ সুনীলকুমার সেন, দ্য ওয়ার্কিং উইমেন এণ্ড পপুলার মুভমেন্টস্‌ ইন বেঙ্গল ; ফ্রম গান্ধী এরা টু দ্য প্রেজেন্ট ডে, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ ৮৯।

বাংলাদেশের প্রথম যুগের (১৯২০-৪০) শ্রমিক আন্দোলনে মহিলা নেতৃত্ব

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

১

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ভারতবর্ষের সবচেয়ে শিল্পোন্নত প্রদেশগুলির অন্যতম ছিল বাংলা। বাংলা দেশে চটকল, কয়লাখনি, চা বাগিচা, বন্দর ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও বহু ছোটবড় কলকারখানা গড়ে ওঠে। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য শ্রমিক-শ্রেণীও গড়ে ওঠে।

গোড়ার দিকে এই শিল্পে মুখ্যতঃ বাঙালী শ্রমিকই নিয়োগ করা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে কলকারখানার এত প্রসার লাভের ফলে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে) চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিক যোগান না থাকায়, বাইরে থেকে শ্রমিক আমদানী করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর কতকগুলি অন্য কারণও ছিল। শিল্পে অধিক মুনাফার জন্য শ্রমিকদের উত্তরোত্তর পরিশ্রম বাড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে শোষণও বাড়তে থাকে। বাঙালীরা অতখানি দৈহিক পরিশ্রম করতে রাজী ছিল না। তাছাড়া বাঙালীদের অল্প-স্বল্প জমি থাকায় তারা অনেকেই পরিশ্রমের চাপ বাড়ায় কারখানা ছেড়ে চলে যেতে থাকে। কলে শ্রমিক যোগান দিত সর্দাররা। এদের সঙ্গে মালিকের একটা বোঝাপড়াও ছিল। এইসব সর্দাররা ভিনদেশী শ্রমিক সংগ্রহ করতে শুরু করে। প্রচণ্ড দারিদ্র্যের ফলে সস্তায় শ্রম ও শ্রমিক পাওয়া সম্ভব হয়। এইসব শ্রমিক সংগ্রহ করা হত প্রধানত বিহার, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, ইউ পি, রাঁচী, সাওতাল পরগণা এমনকি তেলেঙ্গানা থেকেও। জাতি, ধর্ম, ভাষা এবং আচার-আচরণ ভিন্ন হওয়ায় এইসব শ্রমিকরা কোন দাবীদাওয়া নিয়ে জোটবদ্ধ হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে পারবে না, এটাও মালিকপক্ষের একটা নিশ্চিন্ততা ছিল।

এইসব শ্রমিকের মধ্যে মেয়ে শ্রমিকের সংখ্যা কম ছিল না। বন্দর শ্রমিকদের মধ্যেই শুধু কোন মেয়ে মজুর থাকত না। তিরিশ, চল্লিশের দশকে বাংলার কয়েকটি শিল্পে মেয়ে মজুরের একটা হিসাবও পাওয়া যাচ্ছে ঃ

বাংলার শিল্প	মেয়ে-মজুর
চা বাগান (দার্জিলিঙ, ডুয়ার্স, তেরাই)	৮১, ৭১১ (মোট মজুর সংখ্যার অর্ধেক)
কয়লাখনি — — — —	১৫, ৪৯৮
১০১টি চটকলে — — —	৩৬' ০০৫ (মোট মজুরের শতকরা ১৩ ভাগ)
৩৯২টি ধানকলে—	৮'০০০ (মোট মজুর সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী)

সূত্র ঃ ছবি রায়, বাঙলার নারী আন্দোলন সংগ্রামী ভূমিকায় দেড়শ বছর।

এছাড়াও পটারী, সিল্ক, বিড়ি তৈরী, মজদুর ইত্যাদি ছোটখাটো শিল্পে মেয়ে মজুরের সংখ্যা প্রায় দশ হাজারের মত।

সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিকভাবে অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত হত এই-সব মেয়ে শ্রমিকরা, কুলি-কামিনরা। চটকল এলাকায় অসামাজিক জীবন-যাপনের জন্য শতকরা একশজন মেয়েই যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হত। আবার দেখা গেছে একটানা কিছুদিন কাজ করার পর অনেক মেয়েই বন্ধ্যাত্ব-প্রাপ্ত হত। বিশেষজ্ঞরা বলেন, অনেক সময় একটানা আট ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কাজ করার ফল এটা।

এইসব কলকারখানার মেয়ে-পুরুষ সব শ্রমিকদেরই বেতন ছিল খুবই সামান্য। এদের কাজের কোন স্থায়িত্ব ছিল না, তাই কাজ রাখার জন্য শ্রমিকদের সব সময়ই সর্দারদের ও মালিককে খুশী রাখতে হত মাইনের একটা অংশ সর্দারকে দিয়ে। তবুও সব সময় শ্রমিকরা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত ছাঁটাইয়ের ভয়ে।

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকরা শুধু ভিনদেশী নয়, তারা সমাজের নীচুতলার মানুষ। শ্রমিকদের একটা বেশ বড় অংশ আসত মুসলমান পরিবার থেকে। অধিকাংশ শ্রমিকই ছিল তফসিল সম্প্রদায়ভুক্ত বা আদিবাসী। মেয়ে শ্রমিকদের মধ্যে এ সংখ্যাটা বেশী। এই শ্রমিকদের

শতকরা ১০ জনের জমিজমা ছিল কিনা সন্দেহ। যাদেরও ছিল তাও খুব অল্প পরিমাণ। ফলে এরা প্রকৃত অর্থেই সর্বহারা। মেয়ে শ্রমিকরা তো প্রায় সবাই নিরক্ষর, ছেলেদের কিছু কিছু অক্ষর পরিচয় ছিল, তবে তাও সামান্য অংশের। সুতরাং জাতিগত অর্থে, সম্পত্তির দিক থেকে এবং শিক্ষার দিক থেকে এরা বঞ্চিত। এদের উপর নির্যাতন, নিষ্পেষণ সহজেই চালানো যেত।

দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিশের দশকের আগে এই শ্রমিকদের সম্বন্ধে কিছু ভেবেছে বলে মনে হয় না। শ্রমিকদের দাবীদাওয়া, মানুষের মত বাঁচার অধিকার এসব নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসে বা বাংলার প্রাদেশিক সম্মেলনে কখনও আলোচনা পর্যন্ত হয় নি। অর্থাৎ শ্রমিক আন্দোলন যে জাতীয় আন্দোলনের অংশ হতে পারে নেতৃত্ব কখনও তা মনে করেন নি।

শ্রমিকদের মধ্যে মেয়ে, পুরুষ ও শিশু শ্রমিক সবই ছিল। চটকলে, সুতাকলে এবং ধাঙড়দের মধ্যে অনেক মেয়ে ও বাচ্চা কাজ করত। চটকলের মেয়ে শ্রমিকরা বেশ সাহসী এবং জঙ্গী ছিল।

সব রকম শিল্প শ্রমিকরাই ছিল তখন অসংগঠিত। ভদ্রলোকদের কিছু কিছু সংগঠন গড়ে উঠলেও সাধারণ শ্রমিকদের কোন ইউনিয়ন ছিল না। স্বদেশী যুগে শ্রমিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া ছাড়াও কিছুটা রাজনৈতিক চেতনা আসে। তবে যেহেতু কোন স্তরের রাজনৈতিক নেতারাই শ্রমিকদের সংগঠিত করার কথা ভাবেন নি, তাই গোড়ার দিকের শ্রমিক আন্দোলনগুলি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও বিক্ষিপ্ত। আন্দোলন মূলত অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া নিয়েই হত, দেশের রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে তার যোগও বিশেষ থাকত না। অনেক সময় দেখা গেছে শ্রমিকরা প্রথমে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে, এমনকি ধর্মঘট শুরু করে দিয়েছে, পরে তাদের ডাকেই রাজনৈতিক নেতারা ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন, দাবীপত্র রচনা করে দিয়েছেন, অনেক সময় নেতৃত্বও দিয়েছেন। এই সময় অধিকাংশ কারখানায় খবর পাওয়া যাচ্ছে: শ্রমিকরা সারাদিন বা কয়েক ঘণ্টা কাজ বন্ধ করেছে, আবার পরদিন বা সেদিনই কাজে যোগ দিয়েছে। দাবীগুলিও স্পষ্ট নয়, দাবী মেটেও নি, তবু কাজে যোগ দিয়েছে। এটাই ছিল প্রতিবাদের ধরন। ধর্মঘট বেশী দিন চালাবার মত সাংগঠনিক শক্তিও ছিল না, আবার ধর্মঘট করলেই দাবী মিটবে এমন আশাও তারা করত না। তবে এ রকম বারবার ধর্মঘট করেই শ্রমিক চেতনা বেড়েছে, সাহস বেড়েছে পরে সাংগঠনিক বুদ্ধিও এসেছে।

১৯২০ সালে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের জন্ম হয়। জাতীয় নেতাদের কেউ কেউ শ্রমিকদের সংগঠিত করা, বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলনে তাদের সামিল করার কথাও ভাবেন। এই দশকের মাঝামাঝি দেশে বামপন্থী চিন্তাভাবনাও দানা বাধতে থাকে। যত ছোটই হোক বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়। তাঁরা প্রথম থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার কথা ভাবেন।

খুব কম লোকই শ্রমিক আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন, তাই খুবই আশ্চর্য লাগে যখন দেখি এই দশকের গোড়ার দিকে সন্তোষকুমারী দেবী এবং শেষের দিকে প্রভাবতী দাশগুপ্ত শ্রমিক আন্দোলনের কাজে এগিয়ে এসেছেন। সন্তোষকুমারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি ছাড়া আর কোন মহিলা তখন শ্রমিক সংগঠনের কাজে এসেছিল কি? দৃপ্তকণ্ঠে বৃদ্ধা জবাব দিয়েছিলেন, 'মর্দ্দানা নেহি মিলা, জেনানা কাঁহাসে মিলেগী'? তাহলে কোন আকর্ষণে বা কোন রাজনৈতিক বোধ থেকে সন্তোষকুমারী শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন? শুধু তো সন্তোষকুমারী নন, ১৯২০ থেকে ১৯৪০-৪২ এমনকি স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়কাল যদি ধরি, তবে এ রকম আরও কয়েকজন মহিলার সাক্ষাৎ মেলে যাঁরা শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজেই আত্মনিয়োগ করেছেন।

সন্তোষকুমারী কাজ করেছেন প্রধানত চটকলের মজুরদের মধ্যে। প্রভাবতী দাশগুপ্ত কলকাতার জমাদার, ধাঙড়দের মধ্যে এবং চটকল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছেন। জমাদার, মেথর ও ধাঙড়দের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন অভিজাত মুসলমান পরিবারের উচ্চশিক্ষিতা মহিলা সাকিনা বেগম। বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছেন কমিউনিস্ট কর্মী সুধা রায় এবং ডঃ মৈত্রেয়ী বসু। শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করা, তাদের সংগঠিত করার কাজে এই সময়ই আরও কয়েকজন মহিলার নাম পাওয়া যাচ্ছে, যেমন বিমলপ্রতিভা দেবী, বীণা দাস, পদ্মিনী সেনগুপ্ত প্রমুখ। জাতীয় আন্দোলন যেখানে শ্রমিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিল সেখানে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে এরা শ্রমিকদের সম্বন্ধেই ভাবনা-চিন্তা করে, তাদের সংগঠিত করে, আন্দোলনের দিকে পরিচালনা করার সঠিক কাজ নিয়ে এগিয়ে এলেন। কেন এরা এ কাজে এসেছেন তার যে কোন যুক্তিযুক্ত সদুত্তর সবাই দিতে পেরেছেন তাও নয়, তবে এদের লেখা পড়ে বা কারুর কারুর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে যে খুব স্বাভাবিকভাবেই এ কাজে তাঁরা এসেছেন। মনে হয় দুটো

জিনিসই এক সঙ্গে করেছে। প্রথমত জাতীয় আন্দোলনের বিপুল স্রোতের সঙ্গে এই বিশাল শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিকে যুক্ত করতে পারলে আন্দোলন অনেক জোরালো হবে; অন্যদিকে যেভাবে দেশে শ্রমিক দলন ও শোষণ চলছে তাতে মানবিকতাবোধ থেকেও মনে হয় এরই নির্যাতীত শ্রমিকদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করতে চেয়েছেন। আবার এই ত্রিশের দশকেই স্বরাজ্য দল শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করা বাদ দিয়ে জাতীয় আন্দোলন হতে পারে না এই চিন্তাভাবনা, রাজনৈতিকভাবেই শুরু করল। সব মিলিয়ে আমাদের দেশে বিংশ শতাব্দীর বিশেষ দশক থেকেই আস্তে আস্তে শ্রমিক আন্দোলন দেশের মুক্তির আন্দোলনে নিজেদের জায়গা করে নিল। আর তারই নেতৃত্বে গোড়ার দিকে পুরুষের পাশাপাশি মহিলা নেত্রীরাও এলেন।

২

সন্তোষকুমারী দেবী এক অর্থে ভারতবর্ষে, বাংলাদেশে তো বটেই, শ্রমিক আন্দোলনে প্রথম মহিলা নেত্রী। সচ্ছল শিক্ষিত পরিবারে তাঁর জন্ম ১৮৯৭ সালে। বাবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, কিছুটা সরকার ভক্ত। দেশপ্রেমের হাতেখড়ি মা এবং বৃদ্ধ দাদামশাইয়ের কাছে। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে রেঙ্গুনে। মৌলমিনে আমেরিকান মিশনারী স্কুলে তিনি পড়াশুনা করেছেন। এই সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ "স্কুলে আমাদের রোজ পিয়ানোর সঙ্গে Rule Britania rules the waves। গাইতে হত। আমার মন কিছুতেই এ গান গাইতে চাইত না। একদিন আমি আপত্তি জানালাম ঃ এ গান গাইবো না। আমার গানের শিক্ষয়িত্রী প্রিন্সিপালকে নালিশ জানালে, তিনি আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করেন কেন আমি গান গাইব না। আমি উত্তর দিলাম ঃ I will be no slave উনি আমায় সমর্থন করলেন। বাড়ি আসতে সব শুনে বাবা আমার ধমক দিলেন, কিন্তু মা আমাকে পূর্ণ সমর্থন করলেন। আর কখনও আমি এ গান গাই নি। তখন আমার বয়স ১২ বছর।" (সাক্ষাৎকার ২৫. ৬. ৮২, কলকাতা) ৮৫ বছর বয়সে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করি তখনও তাঁর কথাবার্তা, রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার মধ্যে এই দৃপ্ত ভাব আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। আজ তিনি ৯২ বছরের বৃদ্ধা। এক বছর আগেও সমান আবেগের সঙ্গে পুরোনো দিনের কথা তিনি প্রায় নির্ভুল বলতে পারতেন। সন্তোষকুমারীর কর্মজীবনের কথা প্রধানত ওঁর মুখেই শুনেছি। ওঁর কাছে শ্রমিক

পত্রিকার একটি মাত্র সংখ্যা ছিল, তাছাড়া ছিল ও'র লেখা কিছু স্মৃতি-চারণ। সে সবই তিনি আমায় দেখতে ও ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

শ্রমিক-কৃষকের লড়াইকে আর জাতীয় আন্দোলনের আওতার থেকে সরিয়ে রাখা যাবে না—এ সত্য তখনকার সব মানসিকতার নেতৃবৃন্দই বুঝতে পারছিলেন। শ্রমিক জাগরণে ইংরেজ সরকারও বিচলিত বোধ করল। তখনকার একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকায় লেখা হল "সরকার বাহাদুর বেশ হুঁশিয়ার হয়ে পড়েছেন। এ জ্ঞান তাদের বিলক্ষণ আছে যে, দু-পাঁচ হাজার ছেলে-ছোকরা খেপলে তাদের ঠাণ্ডা করতে বেশী বেগ পেতে হবে না। কিন্তু দেশের চাষা-ভুষো, কুলি-মজুর যদি দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে দাঁড়ায় তাহলে অনেক কাঠখড় পোড়াবার দরকার হবে।" (আত্মশক্তি, ১৩ আগস্ট ১৯২২, শাসকশ্রেণী এবং জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ভাবতে বাধ্য হলেন যে, হয় এই আন্দোলনকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে আইনসঙ্গত পথে নিয়ে যেতে হবে, নতুবা শ্রমিক আন্দোলন প্রচলিত আইন-শৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করবে শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে, শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে। রাশিয়ায় সদ্যঘটিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা অস্পষ্ট হলেও, দেশের নেতাদের তা অজানা ছিল না।

১৯২১-২২ সাল, শ্রমিক আন্দোলন এই সময় সবচেয়ে বেশী হয় বোম্বাই ও বাংলাতে। এই সময় মোট ধর্মঘট হয় ৬৭৪টি, তার মধ্যে এই দুই প্রদেশে হয় ৫৪০টি।

কলকাতায় শুধু চটকলে ধর্মঘট হয়ঃ

সময়	সংখ্যা	শ্রমিকসংখ্যা	কাজের দিন নষ্ট
১৯২১	৩৯	১,৮৬,৪৭৯	৭,০৬,২২৯
১৯২২	৪০	১,৭৩,৯৫৯	১০,৭৯,৬২৭

সূত্র ঃ কার্ণিক, স্ট্রাইকস ইন ইণ্ডিয়া, এবং মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, শ্রমিকনেত্রী সন্তোষকুমারী, কলকাতা, ১৯৮৪।

এই সময়েই গৌরীপুর চটকলে শ্রমিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় সন্তোষকুমারীর নেতৃত্বে।

১৯২২-এ গয়া কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সাধারণ শ্রমিক কৃষকের আন্দোলনকে সমর্থন করে বললেন, "কংগ্রেস যদি নিজ কর্তব্য

পালনে অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষককে সংঘবদ্ধ করতে অক্ষম হয়, তাহলে দেখবেন ভবিষ্যতে শ্রমিক-কৃষক আপনাদের স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলবে। ফলে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পরিবর্তে শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণীগত স্বার্থ কায়েম করার প্রয়াসই প্রাধান্য পাবে।''

(ভি. ভি. বালাভুসেভিচ ও এ. এম ভিয়াকভ কনটেম্পোরারি হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৬৪)

শ্রেণীসংগ্রাম নয়, শ্রেণীসমন্বয়—এ চিন্তাই সন্তোষকুমারী দেবীরও ছিল। গৌরীপুর চটকলে ধর্মঘট মীমাংসার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন "আমরা চেয়েছিলাম ধনিকশ্রেণী ও শ্রমিকদের মধ্যে একটা ভাল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে" (সন্তোষকুমারী দেবী ঃ অপ্রকাশিত রচনা) তাঁর মতে শ্রমিক আন্দোলন হবে নিয়মতান্ত্রিক পথে, জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে পা মিলিয়ে, শ্রমিক নেতৃত্বে দেশে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসুক এটা তাঁর কাম্য ছিল না। তাই শ্রমিক আন্দোলনকে দেখেছেন তিনি ভিন্ন চোখে।

স্বরাজ সাধনার মুল ধারা অর্থাৎ গান্ধী আন্দোলনের সঙ্গেই গোড়া থেকে যুক্ত ছিলেন সন্তোষকুমারী। ১৯২১-র আমেদাবাদ কংগ্রেসে যোগদানের পর বার্মার পাঠ তুলে চলে আসেন বাংলাদেশে। নৈহাটির কাছে গরিফাতে তাঁর পৈত্রিক বাড়ি। এইখানেই গৌরীপুর চটকল। সন্তোষকুমারী বললেন, "আমরা থাকতাম গরিফায়। একদিন দেখলাম বাগানে বেশ কিছু চটকল শ্রমিক জমা হয়েছে, আর একজন সর্দার গোছের বয়স্ক লোক তাদের কিছু বলছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে তাদের মিলের ম্যানেজার প্রচণ্ড অত্যাচারী। তাছাড়াও আছে সর্দারের জুলুম। মাইনে তাদের খুবই কম। কাজের কোন স্থায়িত্ব বা নিরাপত্তা নেই। এইসব কারণে তারা ধর্মঘট করেছে। কিন্তু মিল মালিকরা তাদের সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনা করতে রাজী নয়, ফলে এখন কি করবে ? এভাবে ধর্মঘট চালানো ঠিক হবে কিনা ?—এসব তারা বুঝতে পারছে না। কারণ ধর্মঘট করে কিছু না পাওয়ায় তাদের মধ্যে হতাশা এসেছে।

আমি তাদের কথা দিলাম তাদের অভাব অভিযোগ, দাবীদাওয়া গুছিয়ে ইংরেজীতে লিখে মিলের ম্যানেজারের কাছে পাঠাব এবং তার সঙ্গে দেখা করব। ততদিন তারা ধর্মঘট চালিয়ে যাক।"

সহজেই শ্রমিকরা সন্তোষকুমারীর নেতৃত্ব মেনে নিল। শ্রমিকদের কোন নেতৃত্ব না থাকায় সন্তোষকুমারীর নেতৃত্বে আসাও সহজ হল।

ভি. বি. কার্ণিক স্ট্রাইকস ইন ইণ্ডিয়াতে লিখছেন, ১৯১৭-১৮তে প্রচণ্ড রকম ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী হওয়ায় প্রায় ২ লাখ লোক মারা গেল এবং বহু গরীব শ্রমজীবী শহর ছেড়ে ভয়ে গ্রামে পালিয়ে গেল। শ্রমিক অভাবে কলকারখানা প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। সেই সুযোগে শ্রমিকরা বেশী মজুরী দাবী করার সাহস দেখাতে পারল। তবে মিল মালিকরা চেষ্টা করল অল্প শ্রমিক দিয়ে, মুনাফা বাড়াতে। ফলে লড়াই প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠল। (ভি. বি. কার্ণিক ঃ স্ট্রাইকস ইন ইণ্ডিয়া. বোম্বাই, ১৯৬৭, পৃ ৬১)

গৌরীপুর চটকলের ধর্মঘটী শ্রমিকদের হয়ে সন্তোষকুমারী চটকল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চারদিনব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ সিদ্ধান্তে আসেন ঃ

—যাদের ধর্মঘটের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের ছেড়ে দিতে হবে।

—যাদের চাকুরী থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে তাদের কাজে পুনর্বহাল করতে হবে।

মালিকপক্ষ দাবী মানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে কাজে ফিরে যায়।

এরপর সন্তোষকুমারী গৌরীপুর শ্রমিক সমিতি নাম দিয়ে ২৪ পরগণার গৌরীপুরে একটি শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনের সভাপতি হলেন সন্তোষকুমারী দেবী। সহ-সভাপতি হলেন বঙ্কিম মুখার্জী এবং কালিদাস ভট্টাচার্য হলেন সম্পাদক। এদের ছাড়াও সন্তোষকুমারী দেবী এ কাজে সাহায্য পেলেন ব্যারিষ্টার সুরেন হালদার এবং পুরোন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক মুকুন্দলাল সরকার এবং ব্যারিষ্টার নিশীথ সেনের কাছ থেকে।

বিলেতের পার্লামেন্টের শ্রমিক দলভুক্ত (লেবার পার্টি) সদস্য টমাস জনস্টন ও জন সাইম বিলেতের চটকল শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে কলকাতার ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার চটকলগুলি পরিদর্শনে আসেন। ১৯২১-২২-এর চটকল ধর্মঘটের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁরা লিখছেন "যদিও এখন পর্যন্ত সেরকম কার্যকরী কোন ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের নেই, কিন্তু নিতান্ত অসহ্য হয়েই তারা বারবার ধর্মঘট করেছে। গত দুবছরে বেঙ্গল ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন মোট ৮টি ধর্মঘট পরিচালনা করেন। তার মধ্যে গৌরীপুরের ধর্মঘটটি তিন মাস ধরে চলে।

…শ্রমিকরা সেখানকার অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ স্কট অফিসারকে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য করে। ধর্মঘটের সময় ৩০০০ ছাঁটাই শ্রমিককে সন্তোষকুমারীর বাড়িতে খাওয়ানো হয়েছে।

...ধর্মঘটের শেষে গৌরীপুরেই সবচেয়ে ভাল কাজের অবস্থা ও ভাল মাইনে দেবার কথা ঘোষণা করা হল। (কার্ণিক, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১০৩)

হয়ত মানবতাবোধ থেকেই সন্তোষকুমারী দেবী শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, কিন্তু একবার জড়িয়ে পড়ে আর ফিরতে পারলেন না। সন্তোষকুমারীর কর্মবহুল জীবনের সূত্রপাত হল।

যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়ে সন্তোষকুমারী দেবী বজবজ থেকে কামারহাটি, বাউড়িয়া থেকে গৌরীপুর চটকল শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি লিখছেনঃ "২৪ পরগণার নানান জায়গা থেকে শ্রমিকরা আমার কাছে আসত সংগঠন গড়ার কাজে সাহায্যের জন্য, আমরা প্রতি সপ্তাহে শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনায় বসতাম।...প্রত্যেক শ্রমিকের আলাদা আলাদা দায়িত্ব দিয়ে কাজ ভাগ করে দিতাম। এতে তাদের নিজেদের উপর ভরসা বাড়ল, সাহস বাড়ল এবং সচেতনভাবে সংগঠন গড়ার প্রয়োজনীয়তাও বুঝতে শিখল। আমরা সমস্ত চটকল এলাকায় শ্রমিকদের জন্য রাতের স্কুল করলাম। স্থানীয় লোক ও শ্রমিকের উৎসাহে আমরা এ কাজ করতে পারলাম।" (সন্তোষকুমারী দেবীঃ স্মৃতিচারণ)।

১৯২৩-এ আত্মশক্তিতে সন্তোষকুমারী লিখছেনঃ "বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত কলকারখানার শ্রমজীবীদের উন্নতির জন্য যে বিশেষ চেষ্টা ও আন্দোলন চলিতেছে, শ্রমিকদের উচিত তাহাতেই যোগদান করিয়া নিজেদের ও দেশের উন্নতির জন্য তাহাতে সাহায্য করা। গৌরীপুর কোম্পানীর শ্রমিকগণ যাহাতে এই উদ্দেশ্যে একত্র হইয়া পরস্পরের জন্য চিন্তা ও পরামর্শের আদান-প্রদান করিবার সুবিধা পান, সেই উদ্দেশ্যে এখানে 'গৌরীপুর শ্রমিক সমিতি' নাম দিয়া একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ দেশের অন্যান্য সমগ্র জুট মিলের কর্মচারী ও ভ্রাতা-ভগিনীদের অনুরোধ করিতেছি তাহারাও তাহাদের নিজ নিজ কারখানায় এলাকাধীন স্থানে এরূপ সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের একতা ও বলবৃদ্ধি করবার চেষ্টা করুন।" (আত্মশক্তিঃ ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩)

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে জানা যায়, "নৈহাটী, হাজিনগর পাটের কলে প্রায় ৬ হাজার শ্রমিক গত ৮ জানুয়ারী তারিখে ধর্মঘট করে। তাহাদের অভিযোগ এই যে, বয়নবিভাগে কাজ পাইতে হইলে সর্দার রহমতুল্লাকে বরাবর ঘুস দিতে হইত। ধর্মঘটের পূর্বে শ্রমিকরা উক্ত সর্দারকে অপসৃত করিবার জন্য ম্যানেজারকে অনুরোধ করে। ম্যানেজার তাহাতে কর্ণপাতও করে নাই। তখন তাহারা গৌরীপুর শ্রমিক সমিতির প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী সন্তোষকুমারী দেবীর নেতৃত্বে এক সভায় সমবেত হয়। সভানেত্রী

তাহাদিগকে কার্যে যোগদান করিতে উপদেশ দিয়া বলেন, তাহারা সংঘবদ্ধ না হইলে এসব ধর্মঘটে কোন ফল হইবে না। হাজিনগরের শ্রমিকগণকে লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ জানুয়ারী, ১৯২৪)

সন্তোষকুমারী দেবীর চিন্তার ও কাজের এদিকটি উল্লেখ করার মত। শ্রমিকদের উত্তেজিত করার চেয়ে, সংঘবদ্ধ করে আন্দোলনের পথে চালিত করাটাই তিনি সঠিক পথ বলে মনে করেছেন। বহু জায়গায় শ্রমিকরাও সন্তোষকুমারীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলকারখানায় ছোট ছোট ইউনিয়ন গড়ে তুলেছেন।

শ্রমিকদের আপদে-বিপদে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, ধর্মঘটে পরামর্শ দিয়েছেন, শ্রমিকসভায় মালিকের গুণ্ডা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চোখ রাঙানীকে উপেক্ষা করে বক্তৃতা করেছেন। সেই সঙ্গে একথা ভেবেছেন যে শ্রমিকদের জন্য একটি পত্রিকা চাই, যে পত্রিকা শ্রমিকরা নিজেদের বলে মনে করবে। এই উদ্দেশ্যে প্রায় সমস্ত দায়িত্ব নিয়েই তিনি প্রকাশ করলেন **শ্রমিক** পত্রিকা।

সন্তোষকুমারী লিখেছেন "ঠিক করলাম কাগজ বার করব। তাতে থাকবে নানান জায়গার শ্রমিক আন্দোলনের খবর, বিভিন্ন ধর্মঘটের সাফল্য বা ব্যর্থতার খবর, যাতে তারা বুঝতে পারে সৎপথে পরিশ্রম করলে, কারখানার উৎপাদন বাড়লে এবং মুনাফা বাড়লে তাদের লাভ। পুঁজিপতিদের অর্থাৎ মিল-মালিকদেরও বুঝতে হবে যে শ্রমিক ছাড়া কারখানা অচল! শ্রমিকদের পরিশ্রমেই মুনাফা বাড়ে, অতএব মুনাফায় তাদেরও অংশ আছে। এই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হল **শ্রমিক** পত্রিকা।" (সন্তোষকুমারী দেবী—"শ্রমিক এ লেবার অরগ্যান" অপ্রকাশিত রচনা)

বলা বাহুল্য সন্তোষকুমারীর এই সহজ সরল চিন্তা অনুযায়ী মালিকরা চিন্তা করবে না বা মালিক-শ্রমিক সম্পর্কও গড়ে উঠবে না। সম্পর্কের জটিলতা সম্বন্ধে হয়ত তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন না, বা তাঁর চিন্তাটাই ছিল এরকম এক সমঝোতার চিন্তা।

পত্রিকার দাম হল এক পয়সা। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক, সম্পাদিকা সন্তোষ-কুমারী দেবী। ১৯২৪-এ বাংলা, উর্দু ও হিন্দি এই তিন ভাষায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। **শ্রমিক** পত্রিকার একটিমাত্র সংখ্যাই সন্তোষকুমারী দেবীর কাছে আছে (১ম বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫)। পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে সন্তোষকুমারী লেখেন "শ্রমিক যে ধনিকের চেয়ে কিছুমাত্র হীন নয়, কৃষক ব্যতীত জমিদার প্রতাপ যে অসম্ভব সকল প্রকারে তা তাদের বুঝিয়ে

দিতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণীকেই তাদের বিভিন্ন ধারানুযায়ী চিন্তবিকাশ করতে যথাসম্ভব সুযোগ দিতে হবে।"

সন্তোষকুমারী দেবী সাম্যবাদী নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং স্পষ্টই বলতেন, আমি কমিউনিস্ট নই। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন করতে এসে অনিবার্য-ভাবে তিনি প্রথম যুগের কমিউনিস্ট ভাবাপন্নদের সঙ্গে কাজ করেছেন, কোনও রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে সরাতে পারে নি। তাঁর লেখা নানান প্রবন্ধেও তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা প্রকাশ পায়।

তিনি লিখেছেন "সমগ্র পৃথিবীজুড়ে ধনী ও শ্রমিকে একটা সংঘর্ষ চলছে। ধনী চায় শ্রমিককে পশুরও অধম করে অথচ কোনরকমে বাঁচিয়ে রেখে দিন দিন নিজের উৎকৃট বাবুয়ানার বহর বাড়াতে, আর শ্রমিকরা চায় নিজের ন্যায্য অধিকার বুঝে নিয়ে ও আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়ে জগতে মনুষ্যসমাজে মনুষ্য বলেই গণ্য হয়ে থাকতে। কাজেই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠছে......আজ আহ্বান এসেছে আমাদের জাগতে হবে, আজ আর বসে থাকলে চলবে না। (সংহতি, মে ১৯২৩ ; আত্মশক্তি, ৬ জুন, ১৯২৩)

কিছুদিন পরে আরেকটি প্রবন্ধে সন্তোষকুমারী লেখেন : "বর্তমান শ্রমিক সম্প্রদায়কে ছলে বলে চাপিয়া দাবিয়া রাখিবার জন্য ধনী কলওয়ালাদের পৃথিবীব্যাপী বিরাট আয়োজন চলিতেছে, তাহার পরিচয় আর কোথায়ও অপ্রকাশ নাই। বলা বাহুল্য এরূপ হওয়া নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত হইলেও আদৌ অস্বাভাবিক নয়।" (সংহতি, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৯২৩)

শ্রেণী সমন্বয় নিঃসন্দেহে সন্তোষকুমারীর কাম্য ছিল, কিন্তু ক্রমেই তাঁর এ যুগের লেখায় প্রকাশ পাচ্ছে যে শ্রেণীসংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। মালিকপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা তিনি করতেন, কিন্তু মালিকপক্ষের কোন অন্যায়ের সঙ্গে আপস তিনি করেন নি।

মালিকপক্ষের শোষণের নানান অপকৌশলের জবাবে সন্তোষকুমারী লেখেন : "কর্তৃপক্ষের কেহ কেহ বলেন যে আজকাল আর তাঁহাদের ব্যবসায় পূর্বের ন্যায় লাভ হইতেছে না বলিয়া বাধ্য হইয়াই তাঁহারা শ্রমিকদের খোরাকি দেওয়া বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—যুক্তি অসাধারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা এই যে, আজ যখন আর পূর্বের ন্যায় লাভ হইতেছে না বলিয়া দরিদ্র শ্রমজীবীদের ক্ষুদ-কুড়ায় পর্যন্ত টান পাড়িতে তোমরা লজ্জাবোধ করিতেছ না—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, তখন তোমরা সৃষ্টিছাড়া বাবুয়ানীর কতটুকু পর্যন্ত কমাইতে পারিয়াছ বা তাহার জন্য তোমরা কি চেষ্টা করিতেছ? তাছাড়া ধনীর দল পূর্বে তোমরা যখন তোমাদের প্রকাশিত হিসাব মত

সমস্ত খরচপত্র বাবদ শতকরা অনূ্যন ৩৭৫ টাকা পর্যন্ত লাভ বণ্টন করিয়া লইয়াছ, তখন যাহাদের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে তোমরা সেই লাভ পাইয়া চূড়ান্ত নবাবী করিয়াছ এবং আজও করিতেছ, সেই দরিদ্র শ্রমজীবীদের তোমরা সেই লাভের অংশ কি পরিমাণ দিয়াছ? তোমরা স্বেচ্ছায় কখনও শ্রমজীবীদের প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর নাই এবং আজও করিবে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণই উপস্থিত হয় নাই।" (সংহতি, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৯২৩)

শ্রমিকদের সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা নিয়ে সন্তোষকুমারী দেবীর সঙ্গে জাতীয় নেতৃত্বের অনেকেরই মতের অমিল হয়েছে। এমনকি দেশবন্ধুও বক্তৃতায় যতখানি শ্রমিক-কৃষকের সপক্ষে বলেছেন বাস্তবে কার্যক্ষেত্রে তা করার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না। জাতীয় আন্দোলন থেকে শ্রমিক আন্দোলনকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং শ্রমিক আন্দোলনকে কোন সাহায্য না দেওয়াই তখনকার জাতীয় নেতৃত্বের অনেকের অভিমত ছিল। সন্তোষকুমারী এই মতকে ভ্রান্ত মনে করেছেন এবং জাতীয় আন্দোলনের স্বার্থেও শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক তা জোরের সঙ্গে বলেছেন। ১৯২৪-এর ২৮ সেপ্টেম্বর শ্রমিক পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে সন্তোষকুমারী লিখছেন: "জাতীয় নেতারা অনেকেই বলছেন শ্রমিক আন্দোলন যেহেতু মূলত ব্রিটিশ মূলধনের বিরুদ্ধে পরিচালিত, সুতরাং এখন তা জাতীয় আন্দোলনকেই দুর্বল করবে।... আমি মনে করি এই ভাবনাটা সম্পূর্ণভাবেই দেশের মঙ্গলের পরিপন্থী। কারণ বিদেশীয় আমলাতন্ত্রের জায়গায় দেশীয় আমলাতন্ত্র এসে আমাদের কোন লাভই হবে না। আমরা চাই গণতন্ত্র, যা দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সহায়তা ছাড়া বা তাকে বাদ দিয়ে আসতে পারে না। জাতীয় নেতৃত্বকে এটা বুঝতে হবে।" (শ্রমিক, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪)

মাত্র এক দশক (বিশের দশক) সন্তোষকুমারী শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি অসামান্য কর্মক্ষমতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও সাহস দেখিয়েছেন।

প্রবীন কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম। গল্পটা তাঁকে বলেছেন বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার যুগের নেতা বঙ্কিম মুখার্জী। একদিন চটকল শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে সন্তোষকুমারী ঘোড়ার গাড়িতে চেপে কামারহাটি গেছেন। একে তো মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগঠিত করা, তার উপর মহিলা—সুতরাং ফেরবার পথে তাঁকে চটকল মালিকদের ভাড়াটে গুণ্ডারা ঘিরে ফেলে। এতটুকু বিচলিত

না হয়ে তিনি দুদিকে চাবুক মারতে মারতে পথ করে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বেরিয়ে গেছেন। শ্রমিকরা বিস্ময়ে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল, আর গুণ্ডার দল হতভম্ব হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ঘটনাটি অসামান্য। (সোমনাথ লাহিড়ী : 'সাক্ষাৎকার', ৮ আগস্ট, ১৯৬৭)

১৯২৪-এর ২৪ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় সন্তোষকুমারী সম্বন্ধে একটি মিথ্যা কুৎসা প্রকাশিত হওয়ায় সন্তোষকুমারী সোজা পত্রিকা অফিসে গিয়ে সম্পাদককে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে আসেন এবং কলেজ স্কোয়ারের প্রকাশ্য জনসভায় তাঁকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন। পরের ২ দিন (২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর) আনন্দবাজার পত্রিকায় বিস্তৃতভাবে খবরটি ছাপা হয়। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪, ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪)। তখন পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

আর একটি ঘটনা। বন্দর শ্রমিক ও নৌকার মাঝিরা একবার ধর্মঘট করে। তাদের এক সহকর্মী জাহাজে চায়ের বস্তা তুলতে গিয়ে নদীতে ডুবে মারা যান। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নির্বিকার। শ্রমিকরা বালিগঞ্জ ময়দানে এক সভা ডাকে। সভায় উপস্থিত ছিলেন তুলসী গোস্বামী, দেওয়ান চমনলাল, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুরেন হালদার এবং সন্তোষকুমারী দেবী।

সন্তোষকুমারী বক্তৃতা শুরু করেন। হঠাৎ জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য। এক গোরা মাতাল গাড়ি নিয়ে সভা ভাঙতে এসেছে, পিছনে দাঁড়ান পুলিশ কমিশনার টেগার্ট। টেগার্ট লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠে সন্তোষকুমারীর দিকে রিভলবার তাগ করে চিৎকার করে বলে এখুনি সভা বন্ধ করে নেমে এস। অন্যরা প্রতিবাদ করলেন, সন্তোষকুমারী শ্রমিকদের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়ভাবে বলেন : 'শ্রমিক ভাইরা আমাকে মেরে ফেলার আগে তোমরা কেউ সভা ছেড়ে যেও না, সভা হবেই।' সন্তোষকুমারীর সাহস শ্রমিকদের ভরসা দিল। টেগার্টের উপস্থিতি সত্ত্বেও সভা চলল।

এ ঘটনাগুলি শুধু সাহসিকতার পরিচয়ই দেয় না, শ্রমিকদের সঙ্গে যে এক গভীর আত্মীয়তার বন্ধনে তিনি আবদ্ধ হয়েছিলেন এগুলি তারই পরিচয় বহন করে।

এই বিশের দশকের একটি বড় শ্রমিক ধর্মঘট হল ১৯২৭-এর বেঙ্গল নাগপুর রেল ধর্মঘট। সন্তোষকুমারী এই ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এটাই বোধহয় শ্রমিক ধর্মঘটের সঙ্গে তাঁর শেষ যোগাযোগ।

১৯২৭-এর ২ ফেব্রুয়ারি খড়্গপুরের ২৫,০০০ রেল শ্রমিক ধর্মঘট করে। প্রায় ৬ মাস চলে এই ধর্মঘট। ধর্মঘটী শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ অথচ দৃঢ়তার

সঙ্গে লড়াই করার বর্ণনা দিতে গিয়ে সন্তোষকুমারী দেবী বলেনঃ "যদি কেউ আমাকে সাক্ষ্য দিতে বলেন তাহলে আমি শপথ নিয়ে বলতে রাজি আছি, যে ধর্মঘটী শ্রমিকদের শান্ত, দৃঢ়, সহনশীলতা ও আত্মত্যাগের মনোভাব আমার মনে এক অসামান্য ছাপ রেখেছে।"

প্রবীন কমিউনিস্ট নেতা গোপেন চক্রবর্তী এক সাক্ষাৎকারে বলেন "বেঙ্গল নাগপুর রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের পর লিলুয়ার রেল শ্রমিকরাও ধর্মঘট করে। ধর্মঘট চলে ৩ মাস। ধর্মঘটী শ্রমিকরা শেষপর্যন্ত পরাজিত হয়। এই ধর্মঘটের সমর্থনে এক বড় শ্রমিক মিছিল বি. টি. রোড ধরে কাঁচড়াপাড়ার পথে হাজিনগর পৌঁছলে বিশিষ্ট শ্রমিকনেত্রী সন্তোষ-কুমারী দেবী তাঁর বাড়িতে সবাইকে ভাল করে খাওয়ান।" (গোপেন চক্রবর্তী ঃ সাক্ষাৎকার, ১৯৬৮)

এ রকম অজস্র ঘটনাবহুল জীবন সন্তোষকুমারী দেবীর। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত থেকেছেন, তবে আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে। চিন্তা-ভাবনায় দুর্বলতা তো ছিলই। শ্রমিকদের রাজনৈতিক-ভাবে সচেতন করার চেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন তাঁর নিজের উপর ভরসা করতে। অবশ্য তিনিই আবার শ্রমিক সংগঠন গড়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছেন। নেতৃত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদি দ্বারা খানিকটা আচ্ছন্ন ছিলেন বলে মনে হয়। তবে এর অনেকটাই তো তখনকার রাজনৈতিক জীবনেরও চেহারা। বড় কথা হল সন্তোষকুমারীর আগে আর কোন মহিলা, শ্রমিকদের কথা এমন করে ভেবেছেন বলে মনে হয় না। দু-এক বছর আগেও যে ওর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, তখন আশ্চর্য লেগেছে যে এখনও কথা বলতে বলতে যখন তিনি বলে যান ১৯২২-২৩ কি ১৯২৬-২৭-এর ঘটনার কথা তখন ও'র মুখের দিকে তাকালে মনে হয় উনি এ সময়ে নেই, শরীর ও মনে সম্পূর্ণ ফিরে গেছেন সেই যুগে। চোখে সেই প্রতিজ্ঞা, ঠোঁটে দৃঢ়তা, কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ান, একই সঙ্গে হিন্দি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী সব ভাষাতেই কথা বলেন। মনে হয় ও'র সামনে রয়েছে অগণিত চটকল শ্রমিক আর তাদের সামনে বক্তৃতাকরছেন, তাদের বোঝাচ্ছেন সন্তোষকুমারী—তাদের "মাইরাম"—শ্রমিকদের দেওয়া ভালবাসার সেই নাম।

৩

ঝাড়ুদার, মেথর, ধাঙড়রা সংঘবদ্ধ হবে, তারা ধর্মঘট করবে, তাদের কোন দাবীদাওয়া থাকতে পারে—শহর বা শহরতলীর ভদ্রলোকেরা তো একথা

ভাবতেই পারতেন না। আর কলকাতায় এসব নীচু কাজ কোন বাঙালী করতই না। জমাদার, ঝাড়ুদার আসত প্রধানত উড়িষ্যা, বিহার ইত্যাদি অঞ্চল থেকে। বলা বাহুল্য এরা আসত নীচু জাতি থেকে। সুতরাং এদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চলত নির্বিকারভাবে। কেউ কোনদিন এদের কথা ভাবেন নি, ভাবতে পারেন একথাও মনে হয় নি। সাধারণভাবে এরা খুব ভীতু, ভদ্রলোকের দিকে চোখ তুলে কথা বলতে সাহস পায় না। কিন্তু দেশের মানুষের চোখে এরা ঘৃণ্য (প্রায় অস্পৃশ্য) নীচু জাতি, সম্ভবত সে কারণেই একটা জাতিগত ও ধর্মীয় ঐক্য এরা নিজেদের মধ্যে অনুভব করত। এ ঐক্য যে কত লৌহদৃঢ়, কোন প্রলোভনেও পা হড়কায় না তা বোঝা গেল ১৯২৮ থেকে ১৯৪০-৪৫-এর মধ্যে ধাঙড়দের ধর্মঘটে। আর এই ধর্মঘটে নেতাদের সঙ্গে দুজন অসম সাহসী এবং এক আশ্চর্য ধরনের মহিলা নেত্রীর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। তাঁরা হলেন ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্ত এবং বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মোয়াজ্জেদা। আশ্চর্য এই কারণে এই দুই মহিলাই উচ্চ শিক্ষিতা, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়েছেন এবং একজন মুসলমান পরিবারের মহিলা। আর এরা কাজ করতে এসেছেন ধাঙড়-জমাদারদের মধ্যে যাদের কেউ মানুষ মনে করে না।

ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্ত ১৯২৭-২৮-এর শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। মনে হয় যেন সন্তোষকুমারী সরে গেলেন আর শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়ালেন প্রভাবতী দাশগুপ্ত। যদিও এ শ্রমিকরা ভিন্ন। প্রভাবতী সেণ্ট পলস কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন ; মনোবিজ্ঞানে এম. এ. পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যান এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন ও জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফেরেন ১৯২৭-এ। জার্মানীতে থাকাকালীন এম. এন. রায় ও ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। এদের চিন্তাভাবনা তাকে বেশ খানিকটা প্রভাবিত করে। যদিও তিনি কমিউনিস্ট নন, তবুও মনে হয় সাম্যবাদী প্রভাব থেকেই দেশে ফিরে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। তাছাড়া দেশেও যে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে তিনি যুক্ত হলেন তাঁরাও সাম্যবাদী ভাবধারায় তখন প্রভাবিত এবং শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন করার কথাই ভাবছেন।

প্রভাবতীর বাবা তারকনাথ দাশগুপ্ত দর্শনের প্রখ্যাত পণ্ডিত, মা মোহিনীদেবী কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বাড়িতে একটা রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল। যাঁরা মাঝে মাঝেই এ বাড়িতে আসতেন তাঁদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মাখন সেন, ভূপতি মজুমদার, ধরনীকান্ত গোস্বামী প্রমুখ। এ রাজনৈতিক যোগসূত্র সম্ভবত প্রভাবতী দাশগুপ্তরই।

মণি সিংহ তাঁর জীবন সংগ্রাম বইয়ে লেখেন "প্রভাবতী দাশগুপ্ত কমিউনিস্ট ছিলেন না, তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল নেত্রী"। (মণি সিংহ ঃ জীবন সংগ্রাম, ঢাকা, ১৯৮৩) নানান তথ্যে এবং জওহরলাল নেহরু মিউজিয়ামে রাখা প্রভাবতী দাশগুপ্তর এক সাক্ষাৎকারে মনে হয় শেষের দিকে তিনি কমিউনিস্ট বিরোধীই হয়ে গিয়েছিলেন, বিশেষ করে ১৯২৯-এ চটকল সাধারণ ধর্মঘটের মীমাংসাকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে তাঁর তীব্র বিরোধ হয়, এমনকি তিনি এই সময় থেকেই ক্রমশঃ শ্রমিক আন্দোলন থেকেও সরে যেতে লাগলেন। সেদিক থেকে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি খুব বেশী দিন যুক্ত ছিলেন তা বলা যায় না, তবে শ্রমিক আন্দোলনে উত্তাল বছরগুলিতে—বিশেষ করে দুটো উল্লেখযোগ্য শ্রমিক ধর্মঘটের সঙ্গে (১৯২৮-এ ধাঙড় ধর্মঘট এবং ১৯২৯-এ চটকল সাধারণ ধর্মঘট) তিনি যুক্ত ছিলেন। আর এসময় তিনি কাজ করেছেন প্রধানতঃ মুজাফ্‌ফর আহমদ, ধরণীকান্ত গোস্বামী, মণি সিংহ, বঙ্কিম মুখার্জী প্রমুখদের সঙ্গে, যাঁরা সবাই কমিউনিস্ট বলেই নিজেদের ঘোষণা করেছেন।

১৯২৮ সালে কলকাতায় এক বিখ্যাত ধর্মঘট হল—ধাঙড় ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য তিনটি নাম হল ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্ত, মুজাফ্‌ফর আহমদ এবং ধরণীকান্ত গোস্বামী।

কর্পোরেশনে তখন প্রায় ১০-১২ হাজার ধাঙড় নানান বিভাগে কাজ করত, অপরিসীম শোষণ আর দারিদ্র্য ছিল এদের নিত্যসঙ্গী। এদের চাকুরীর স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা কোনটাই ছিল না। মাসে এরা মাইনে পেত ১২ টাকা। এদের কোন সাংগঠনিক বা রাজনৈতিক বুদ্ধি ছিল না, কেউ এদের সংগঠিত করার চেষ্টাও করে নি। চাকুরী পাওয়া এবং চাকুরী বজায় রাখার জন্য সর্দারের হাতে এক মাসের মাইনে তুলে দিতে হত।

১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেন, তখন ধাঙড়রা মাইনে বাড়াবার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করলে, তিনি ২ টাকা মাইনে বাড়াবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়নি। জমাদার, মেথররা সে কথা ভোলে নি।

২-১ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেনে তখন ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেণ্টস পার্টির অফিস। কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী মুজফ্‌ফর আহমদ, ধরণীকান্ত গোস্বামী প্রমুখরা তখন শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার কথা ভাবছেন।

ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেনে তখন তাঁরা নিয়মিত বসেন এবং অসংগঠিত সবচেয়ে নির্যাতিত কর্পোরেশনের ধাঙড়দের মধ্যে কাজের কথা ভাবেন। সেই সূত্রে ধাঙড়-বস্তিতে যাতায়াত এবং তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা। ধরণী গোস্বামী ও মুজফ্‌ফর আহমদের চেষ্টায় ধাঙড়দের নিয়ে এক ইউনিয়নও গড়ে উঠল। তার নাম হল "দি স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অব বেঙ্গল।" সংগঠনের সভানেত্রী হলেন ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্ত, ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন মুজফ্‌ফর আহমদ এবং সম্পাদক হলেন ধরণীকান্ত গোস্বামী। প্রভাবতী অবশ্য শ্রমিক-কৃষক দলের সদস্যা ছিলেন না। (মুজফ্‌ফর আহমদ : **আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি**—১৯২৯-৩৪, ২য় খণ্ড)

এই শ্রমিকদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে দেবনাগরী হরফে হিন্দিতে একটি ইস্তাহার ছাপানো এবং সমস্ত এলাকায় বিলি করা হয়। ১৯২৭-এর শেষের দিকে ধাঙড়দের নিয়ে ছোট ছোট গ্রুপ মিটিংও এরা করেন। ধরণী গোস্বামী এবং মুজফ্‌ফর আহমদ তো বটেই এমনকি প্রভাবতী দাশগুপ্তও এদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেলেন যে ধাঙড়দের নেতৃত্বের উপর আস্থা খুব বেড়ে গেল। প্রভাবতী শ্রমিকদের আপনলোক হয়ে গেলেন, তিনি সমস্ত এলাকাগুলিতে মাইজী বা মাতাজী নামেই পরিচিত ছিলেন।

ধাঙড়দের নিয়ে প্রথম বড় সভা হল মনুমেন্টের নীচে ২৯ জানুয়ারী ১৯২৮'এ। সভায় বিভিন্ন নেতৃবর্গ বক্তৃতা করেন। এই সভায় ধাঙড়দের দাবীদাওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় এবং ধাঙড়দের এইসব দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানানো হয়। এই সভায় অত্যাচারিত ধাঙড়দের পক্ষ সমর্থন করে বক্তৃতা করেন রাধারমণ মিত্র এবং আন্দোলন করেই দাবী-দাওয়া আদায় করতে হবে—এ পরামর্শও দেন। উৎসাহিত ধাঙড়রা ফিরে যায় নিজ নিজ এলাকায়।

কলকাতার গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন রিপোর্টেও এই সময়কার বহু সভা ও ধাঙড় ধর্মঘটের উল্লেখ আছে। ১৯ ফেব্রুয়ারী এক সভার বর্ণনায় জানা যাচ্ছে মোমিনপুরের কাছে এক ময়দানে ধাঙড়দের নিয়ে এক সভা হয়। সভায় ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্ত সভানেতৃত্ব করেন। মূল বক্তব্য রাখেন স্বামী কুমারানন্দ। তিনি ঝাড়ুদার মেথরদের সংঘবদ্ধ হয়ে রাশিয়া, জার্মানী ও চীনের শ্রমিকদের মত নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য লড়াইয়ে নামতে আহ্বান জানান। প্রভাবতী দাশগুপ্ত বলেন, আমরা কর্পোরেশনকে ধাঙড়দের জন্য ভাল মাইনে, বাড়ি ঘরের সুবিধা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার জন্য আবেদন করছি। আবেদন মঞ্জুর না হলে তিনিও শ্রমিকদের ধর্মঘট করার আহ্বান জানান। সভায় মুজফ্‌ফর

আহমদ, ধরণী গোস্বামী এবং আব্দুল হালিম উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১,০০০ ধাঙড় সভায় উপস্থিত ছিল। এই সভায় তলব কি তরণি (Talab ki Tarni) নামে এক ইস্তাহার বিলি করা হয়। পুলিশ কমিশ্নার মন্তব্য করছেন, ধাঙড়দের ধর্মঘট প্রায় নিশ্চিত, কারণ কমিউনিস্টরা তাই চায় এবং ধাঙড়দের তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছে। (কলকাতার গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন রিপোর্ট থেকে, ফেব্রুয়ারি ১৯২৮)

৪ মার্চ ১৯২৮, ধাঙড়রা ইউনিয়ন অফিসে এসে জানায় যে তারা সেদিন থেকে ধর্মঘট শুরু করেছে। একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, ডাক দিয়েছে ধাঙড়রাই, নেতারা নন। কর্পোরেশনকে ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া হয় নি, দাবী-পত্র পেশ করা হয় নি, নেতারা বিচলিত, ধাঙড়রা নেতাদের পরামর্শে দ্রুতগতিতে এলাকায় এলাকায় খবর পাঠিয়ে ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত কলকাতায় খবর ছড়িয়ে পড়ল এবং সমস্ত ধাঙড়রা একজোট হয়ে শুরু করল বিখ্যাত ধাঙড় ধর্মঘট।

গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন রিপোর্ট বলা হচ্ছে ৪ মার্চ কলকাতা কর্পোরেশনের মেথর ও ঝাড়ুদাররা ধর্মঘট শুরু করে ৬ তারিখের মধ্যে প্রায় ৯,০০০ ধাঙড় এতে যোগ দেয়। কলকাতায় দারুণ আতঙ্ক। যদিও মুজফ্‌ফর আহমদ, ধরণী গোস্বামী, প্রভাবতী দাশগুপ্ত ও স্বামী কুমারানন্দ প্রমুখ কমিউনিস্টরাই আন্দোলনের প্রস্তুতি চালিয়েছেন, কিন্তু এ ধর্মঘট একেবারেই শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করেছে, বরঞ্চ তারাই নেতৃত্বের হাত শক্ত করেছে।

ধর্মঘটের ৬দিন অতিক্রান্ত হতে চলল। কলকাতার জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। রাস্তায় জমা-করা নোংরা, সমস্ত কলকাতায় দুর্গন্ধ। আনন্দ-বাজার পত্রিকা লেখে : "কলকাতায় ঝাড়ুদার ও মেথর ধর্মঘট : শহরে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার : গড়ের মাঠে ধাঙড় মেথরদের বিরাট সভা"।

গত ২৯ জানুয়ারী গড়ের মাঠে কলকাতার ঝাড়ুদার ও মেথরদের এক সভা হয়। ঐ সভায় "ধাঙড় সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হয় এবং ২/১ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেনে সমিতির অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সমিতি মেথর ও ঝাড়ুদারদের পক্ষে কর্পোরেশনের নিকট প্রত্যেক ঝাড়ুদার ও মেথরের জন্য মাসিক ৩০ টাকা (কম নয়) বেতন, ভাল বাসস্থান, বিনাব্যয়ে চিকিৎসা ও ঔষধপত্র, বেতনসহ ছুটি, ঘুষ গ্রহণ বন্ধ করা ও ছেলেমেয়েদের জন্য বিনাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি কতকগুলি দাবী জানায়। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ মার্চ ১৯২৮)

একই দিনের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় "গতকল্য বৈকাল বেলা

দেশবন্ধু পার্কে সমিতির প্রেসিডেণ্ট প্রভাবতী দাশগুপ্তার সভানেতৃত্বে উত্তর বিভাগের মেথর ও শ্রমিকদের এক সভার অধিবেশন হয়। প্রায় দেড় হাজার মেথর ও ঝাড়ুদার সভায় যোগদান করিয়াছিল। সভায় শ্রমিকগণ দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট করিয়া থাকিবে বলিয়া দৃঢ়তা প্রকাশ করেন।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ মার্চ, ১৯২৮)

ধর্মঘটী শ্রমিকরা প্রচারে বার হলে বহু জায়গায় পুলিশ তাদের মারপিট করে এবং হাতিবাগানে ৫ জন ধাঙড়কে গ্রেপ্তার করে।

৫ মার্চ গড়ের মাঠে ধাঙড়দের একসভা অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃত্ব সভায় ধাঙড়দের দাবীগুলিকে আবার জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন। আনন্দবাজারে "ধাঙড়দিগের সভা ঃ কোন কোন বিষয়ে প্রয়োজন ঃ সভায় গৃহীত দাবীসমূহ"—

ক) বাংলার ধাঙড় সমিতিকে সরকার কর্তৃক অনুমোদন, খ) প্রতি মাসে ৩০ টাকা মাহিয়ানা, গ) আলো বাতাস খেলে এমন বাসগৃহ এবং সেই সমস্ত বাসগৃহে রান্নাঘর, কল ও পায়খানার ভিন্ন বন্দোবস্ত থাকা চাই, ঘ) বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, ঙ) সমস্ত প্রকার ঘুষ বন্ধ করা, চ) পূর্ণ বেতনসহ ১৫ দিনের ছুটি, পূর্ণ বেতন সহ দৈবদুর্ঘটনার জন্য ছুটি, পূর্ণ বেতনসহ "প্রিভিলেজ লিভ", ছ) একমাসের নোটিশ না দিয়া কাহাকেও বরখাস্ত করা যাইবে না, জ) প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতির সুবিধা থাকা চাই, ঝ) ধাঙড় বালক-বালিকাদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও অসময়ে ধাঙড়দিগের ঋণ দিবার জন্য একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ মার্চ, ১৯২৮) সব দাবীগুলিই ২৯ জানুয়ারীর সভার দাবীগুলির পুনর্ঘোষণা। বলা বাহুল্য এসব দাবীপত্র রচনা করেছেন ইউনিয়নের নেতারাই।

ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে আনন্দবাজার সম্পাদকীয় লেখেন—"প্রকাশ ধাঙড় ও মেথররা কর্পোরেশনের নিকট বারবার তাহাদের অভিযোগ জানাইয়াছে, কিন্তু কোন প্রতিকার না হওয়াতে অবশেষে ধর্মঘট করিয়াছে। যদি কর্তৃপক্ষ একটু সহানুভূতির সঙ্গে ধাঙড় ও মেথরদের অভাব অভিযোগ শুনিয়া মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন তাহলে সহজেই ধর্মঘট মিটিয়া যাইবে আশা করা যায়।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ মার্চ, ১৯২৮)

৬ মার্চের আনন্দবাজারে খবর প্রকাশিত হয় "কলকাতায় মেথর ও ধাঙড়দের ধর্মঘট—৮ হাজার শ্রমিকের যোগদান—গড়ের মাঠে বিরাট সভা।"

২ দিন পরে ঐ একই পত্রিকায় লেখা হল, "ধর্মঘটের চতুর্থ দিন, ধর্মঘট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি—শহরের রাস্তাসমূহের দুরবস্থা—কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার—

বাহির হইতে লোক আনাইবার চেষ্টা। সম্পাদকীয় লেখা হয় "দায়িত্ব কাহার?" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ মার্চ, ১৯২৮)

কর্পোরেশন মীমাংসার কোন চেষ্টা না করে পুলিশ দিয়ে ধরপাকড় শুরু করে। ছাত্র ভলান্টিয়ার দিয়ে শহর পরিস্কার করার চেষ্টা করে। কংগ্রেসী নেতৃত্বও ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। শহরের মানুষের চাপও রয়েছে প্রচণ্ড। লোকের ধারণা কর্পোরেশনের মেয়র ধাঙড়দের কাজে যোগ দিতে বললেই তারা কাজে যোগ দেবে। তখন মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তিনি ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে অনুরোধ করলে শ্রমিকরা জানায় দেশবন্ধু ২ টাকা মাইনে বাড়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আপনারা তা রক্ষা করেন নি। দাবী না মিটলে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেবে না। মেয়র এতে অপমাণিত বোধ করলেন, তবে একটা মীমাংসা করতে হবে তাও স্বীকার করলেন।

কংগ্রেসী নেতৃত্ব স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরী করে শহর পরিস্কার করিয়ে ধর্মঘট ভেঙ্গে দেবার ভয় দেখালে নেতৃত্ব জবাব দেন we accept the challenge. শ্রমিকরাও ভয় পায় না। উল্লেখযোগ্য যে এ ধর্মঘট ছিল সর্বাত্মক। কোন শ্রমিক কোনরকম প্রলোভনে পা দেয় নি, বা ভয় পেয়ে কেউ কাজে যোগ দিয়ে ধর্মঘট ভাঙ্গে নি। এমনকি সাহেব বাড়িতে যেসব জমাদাররা কাজ করত (তারা মাইনে বেশী পেত) তারাও পরিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করে। কোনরকম উত্তেজনা পূর্ণ বা হঠকারী কাজ করে ধর্মঘটকে দুর্বল করার চেষ্টাও এরা করে নি। নেতৃত্বের উপর পরিপুর্ণ আস্থা থেকে তাদের নির্দেশ মতই এরা কাজ করেছে। মেথর ও ঝাড়ুদারদের এমন লৌহদৃঢ় ঐক্য এবং অসম সাহস দেখে কর্পোরেশন ও কংগ্রেসী নেতৃত্ব চিন্তিত হল।

কর্পোরেশন বুঝতে পারছে শ্রমিকদের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসা দরকার কিন্তু তা নিয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রচণ্ড মতপার্থক্য হল। মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মীমাংসার পক্ষে, কিন্তু চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জে. সি. মুখার্জী ধাঙড়দের কোন দাবী মানতেও রাজী নয়। আসলে স্বাধীনতার লড়াই, আর গরীব মানুষের বাঁচার লড়াই, এ দুইয়ের মধ্যে তারা কোন সামঞ্জস্য করতে পারেন নি। পায়ের তলার মানুষও দাবী করবে, এটা তাঁরা চিন্তাও করতে পারতেন না।

এবারে ধর্মঘটের নেতারা কর্পোরেশনের মতপার্থক্যের সুযোগ নিয়ে মীমাংসার উদ্যোগ নিলেন। আলোচনার জন্য ডেকে পাঠানো হল ধরণীকান্ত গোস্বামী, ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্ত, মুজাফ্ফর আহমদ, মৃণালকান্তি বসু

ও কিশোরী লাল ঘোষকে। ধাঙড়দের কোন প্রতিনিধিকে ডাকা হল না। নেতৃত্বও এ ব্যাপারে বিচলিত বলে মনে হল না। ধাঙড়দের মধ্যে সে-রকম কোন নেতৃত্বের সৃষ্টি হয় নি ঠিকই, তবে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সংগ্রামী ঐক্য তাদের গড়ে উঠেছে, তাতে তারা কিছুটা সচেতন হয়েছে নিশ্চয়ই।

দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হল ঃ মেথর ও ঝাড়ুদার প্রত্যেকের ২ টাকা করে মাইনে বাড়বে। ধর্মঘট করার জন্য কারুর চাকরী যাবে না। ধর্মঘট করার সময়ের বেতন কাটা হবে। কর্পোরেশনের তরফে মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং ধর্মঘটীদের তরফে ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্ত, ধরণীকান্ত গোস্বামী ও মুজাফ্‌ফর আহমদ সই করেন। ঠিক হয় অভাব অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি সোশ্যাল কমিটি গঠন করা হবে। শ্রমিক নেতাদের প্রতিনিধিও তাতে থাকবেন। (মুজফ্‌ফর আহমদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড)

মেয়র অনুরোধ করলেন আজই (৯ মার্চ, ১৯২৮) তাহলে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হোক।

নেতারাও বিভিন্ন যায়গার খবর পাঠালেন এবং মুখে মুখে মিটমাটের খবর ছড়িয়ে পড়ল। ঠিক হল শ্রমিকরা সব রাতে ময়দানে জমায়েত হবে। প্রায় ৯,০০০ শ্রমিক মীমাংসার কথা শোনার জন্য সেদিন উপস্থিত ছিল। ধরণী গোস্বামী শ্রমিকদের কাছে সব ব্যাখ্যা করে বললেন। নেতৃত্বের নির্দেশে সেই রাতেই শ্রমিকরা কাজে ফিরে গেল এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যে অমানুষিক পরিশ্রম করে কলকাতাকে আবার পরিচ্ছন্ন করে তুলল। তবে আশ্চর্য এই যে কর্পোরেশন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও বেতন বৃদ্ধির দাবী শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করল না। যে শৃঙ্খলাবোধ, যে ঐক্য জমাদাররা এত বড় একটা আন্দোলনে দেখাতে পারল, কর্পোরেশনের ভদ্রলোক নেতৃত্ব কিন্তু তাদের সম্মান রক্ষা করতে পরলেন না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন।

১৪ মার্চ আনন্দবাজারে লেখা হল ঃ ধাঙড় ধর্মঘটে মেয়রের কার্য, কর্পোরেশনের সভায় তুমুল বাকযুদ্ধ, মেয়র ও চীফ এক্সিকিউটিভে সংঘর্ষ, ধাঙড়দের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত।

দাবী মিটল না। শ্রমিক ও নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ হলেন তবে দমে গেলেন না। শ্রমিকরা আবার ধর্মঘটের জন্য তৈরী হতে লাগল। সাড়ে তিন মাসের মধ্যে ২৪ জুন, ১৯২৮ দ্বিতীয়বার মেথর ও ঝাড়ুদাররা ধর্মঘট করে। এই তিন মাস নেতৃত্ব, বিশেষভাবে প্রভাবতী দাশগুপ্ত প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন।

ধাঙড় বস্তিতে বস্তিতে তিনি ঘুরেছেন। অনায়াসে তাদের বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন। পুলিশের হুমকিকে অগ্রাহ্য করে নানান জায়গার জমাদারদের সভায় সভানেত্রীত্ব করা বা বক্তৃতা করেছেন। অর্থ সাহায্য দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের মনোবল বাড়িয়েছেন।

সরকারী গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন রিপোর্টে বহু সভার খবর আছে যার অনেকগুলিতেই প্রভাবতীর উপস্থিতির বা বক্তব্যের উল্লেখ আছে। প্রভাবতী দাশগুপ্ত জোরালোভাবে প্রচার করতে থাকেন দাবী না মিটলে আবার ধর্মঘট করতে হবে। হিন্দি ভাষায় লেখা বেশ কিছু ইস্তাহারও বিলি করা হয়। প্রায় সব সভাতেই প্রভাবতীর পাশে একজন মেথরাণী থাকতেন। ধাঙড়দের মধ্য থেকে মেয়ে বা পুরুষ এই সময় কেউ নেতৃত্বে আসতে পেরেছে বলে মনে হয় না। মনে হয় মেথর-ঝাড়ুদারদের আবার ধর্মঘটে সামিল করার জন্যই প্রভাবতী ঐ মহিলাকে নিজের পাশে রাখতেন—সম্ভবত তার ধাঙড়দের উপর কিছুটা প্রভাব ছিল। এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে যে ধর্মঘট করানোতে প্রভাবতী প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন, পিকেটিং করেছেন, বুঝিয়ে ধর্মঘটে যোগ দিতে সাহায্য করেছেন। ধর্মঘট যাতে না ভেঙ্গে দিতে পারে তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন এবং সর্বত্র শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। এর জন্য প্রভাবতী দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার বরণ করতেও হয়েছে। তাতেও তিনি পিছু হটেন নি। তাই সহজেই শ্রমিকদের বিশ্বাস অর্জন করে প্রভাবতী তাদের মাতাজীতে পরিণত হয়েছেন।

কমিউনিস্টদের এই কাজ, বিশেষ করে একজন মহিলা—প্রভাবতী দাশগুপ্তর, এভাবে ধাঙড়দের উত্তেজিত করে আন্দোলনে সামিল করার কাজকে দেশের মানুষই ভাল চোখে দেখে নি। একটা বড় কারণ অবশ্য শহরের যারা সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং নিরীহ, ভীতু চরিত্রের মানুষ, সেই জমাদার মেথররা দাবী করবে, আন্দোলন করবে এটাই ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা বিত্তবানদের কাছে এক অভাবিত জিনিস। ফলে ধাঙড় ধর্মঘট নিয়ে শুধু রাজনৈতিক মহলে নয়, সাহিত্য জগতে, শিক্ষিত মহলেও বেশ সাড়া পড়ে যায়। আনন্দবাজার ছাড়া আর কোন জাতীয়তাবাদী কাগজই ধাঙড় সহানুভূতি প্রকাশ করে নি। শনিবারের চিঠিতে শুধু ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধেই খবর প্রকাশিত হয় না, প্রভাবতীর ব্যঙ্গচিত্রও ছাপা হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসীও বিদ্রূপ করে ধাঙড় ধর্মঘটের খবর প্রকাশ করে। ধর্মঘটীদের অন্যতম এক নেতা ধরণীকান্ত গোস্বামী অবশ্য কাগজে তার উত্তরও দিয়েছেন। তবে সব কিছু আলোচনার মধ্যমণি ছিলেন প্রভাবতী দাশগুপ্ত।

ধাঙড় ধর্মঘটের মধ্য দিয়েই প্রভাবতী শ্রমিকদের সঙ্গে এক নতুন বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। তখন বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। কেশোরাম কটন মিলের শ্রমিক ইউনিয়নেরও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন প্রভাবতী দাশগুপ্ত। এই বেঙ্গল টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফ থেকে প্রভাবতী দাশগুপ্ত মালিকের কাছে শ্রমিকপক্ষ থেকে ধর্মঘটের নোটিশ দিলেন। এখানেও দাবী—মজুরী বৃদ্ধি, কাজের ঘণ্টা নির্দিষ্ট করে দেওয়া ও বাসস্থানের সুবিধা। মালিকপক্ষের সঙ্গে প্রভাবতী আলাপ আলোচনাও করেন কিন্তু কোন মীমাংসায় পৌঁছতে পারেন না। শ্রমিক ধর্মঘটও হয় না।

কিন্তু ১৯২৮-'২৯এ শ্রমিক আন্দোলনে ইতিহাসে এক বড় ঘটনা হল চটকলের সাধারণ ধর্মঘট—যে ধর্মঘটের সঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত ছিলেন প্রভাবতী দাশগুপ্ত, তিনিই ছিলেন চটকল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট।

১৯২৮-এর জুলাই মাসে বাউড়িয়ার চটকল শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। ধর্মঘটীদের সমর্থনে আরও অনেকগুলি চটকলেও শ্রমিক ধর্মঘট হয়।

দেখতে দেখতে সমস্ত বাংলায় এই ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। এই চটকল ধর্মঘটের সঙ্গে যাঁদের নাম বিশেষভাবে যুক্ত তাঁরা হলেন—প্রভাবতী দাশগুপ্ত, বঙ্কিম মুখার্জী. কালী সেন, রাধারমণ মিত্র, আবদুল মোমিন, ফিলিপ স্প্যোট, গোপেন চক্রবর্তী, আবদুর রেজ্জাক খাঁ, মণি সিংহ প্রমুখ।

এতকাল পর্যন্ত যেসব শ্রমিক আন্দোলন বা স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে তাতে ইংরেজ সরকার বা ইংরেজ মালিক অথবা জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব খুব একটা বিচলিত হতেন না, তবে এবারের ধর্মঘটের ব্যাপক বিস্তারে তারাও একটু ভয় পেলেন। ১৯২৯-এ চটকলে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হবার আগেই সরকার সারা ভারতের শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে শুরু করে বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়।

বাংলাদেশ এর আগে কোন সাধারণ ধর্মঘট দেখে নি। রয়াল কমিশন অব লেবারের কাছে বাংলা সরকার এক বিবৃতিতে বলে "এই চটকল ধর্মঘট-গুলি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। একটা হচ্ছে এদের বিশালতা। বাংলা দেশের ইতিহাসে এর আগে কখনও সাধারণ ধর্মঘট গোছের কিছু সংগঠিত করার চেণ্টা করা হয় নি। ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সর্বসমেত ২,৭২,০০০ জন শ্রমিক ধর্মঘট করে।"

ধর্মঘট চালানোর জন্য প্রভাবতী শুধু দৈহিক পরিশ্রমই করেন নি, এতদিন-ব্যাপী ধর্মঘট চালানোর যে বিপুল খরচ তার অনেকটাই জুগিয়েছেন তিনি। ধর্মঘটী পরিবারগুলির খাওয়াদাওয়ার জন্যও প্রচুর অর্থ তিনি দিয়েছেন।

ধর্মঘট চলাকালে প্রায় লাখখানেক ইস্তাহার ছাপানো হয়েছে তিনটি ভাষায়। শ্রমিকদের মধ্যে ইস্তাহার বিলি করা, তাদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সভা করা, এসবই প্রভাবতী অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে করেছেন। তখন তিনি প্রায় চটকল শ্রমিকদের এক অবিসংবাদী নেত্রী।

ধর্মঘট যখন পুরোদমে চলছে তখন মিল মালিকরা ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হিসেবে প্রভাবতী দাশগুপ্তকে ডাকিয়ে নিয়ে প্রস্তাব দিলেন শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া তারা মোটামুটি মেনে নেবে এবং যা তারা দাবী করে নি Maternity Benefit অর্থাৎ প্রসূতি ভাতাও দেবে যদি প্রভাবতী কালই শ্রমিকদের ধর্মঘট তুলে নেন। নেতৃত্বের সঙ্গে কোনরকম আলাপ আলোচনা ছাড়া এবং ধর্মঘটী শ্রমিকদেরও কিছু না জানিয়ে প্রভাবতী মালিকপক্ষকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের কথা দিয়ে এলেন। স্বভাবতই এ নিয়ে নেতৃত্বের সঙ্গে প্রভাবতীর বিরোধ বাধল। এ কাজটা যে অন্যায় তা তিনি মানতে রাজী হলেন না এবং নানান জায়গায় শ্রমিকদের সভা ডেকে তাদের ধর্মঘট তুলে নিতে বললেন। শ্রমিকরা খানিকটা বিভ্রান্ত এবং বিচলিত। প্রভাবতী সরে দাড়ানোর নেতৃত্বের পক্ষে অর্থের অভাবে ধর্মঘট চালানো অসম্ভব। তাছাড়া নানান জায়গায় ধর্মঘট ভাঙ্গতেও শুরু করল।

একটা প্রায় জিতে যাওয়া আন্দোলন রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবে হেরে গেল। নেতৃত্বের মধ্যে ভাঙ্গন ধরল। তখন কোথায়ও খুব সংগঠিত ইউনিয়ন না থাকায় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে বিরাট শ্রমিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল, হঠাৎ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় তাতেও ফাটল ধরল। আসলে শ্রমিকদেরও একটা স্পষ্ট মত থাকতে পারে অথবা নেতৃস্থানীয় হলেও নেতৃত্বের অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা না করে যে এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া এত বড় একটা গণসংগ্রামে অন্যায়—সে চিন্তাই প্রভাবতী দাশগুপ্তার ছিল না।

ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হল, তিনি কিছুদিন পাল্টা ইউনিয়ন করে শ্রমিকদের ধরে রাখার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না। চটকল শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠার যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল তা তখনকার মত ব্যর্থ হল। শ্রমিক আন্দোলন নেতৃত্বের বিরোধে ক্ষতিগ্রস্ত হল। প্রভাবতী দাশগুপ্তও আর বেশীদিন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রইলেন না। কমিউনিস্টদের সঙ্গেও তাঁর বনিবনা হল না। কার্যতঃ তিনি আন্দোলন থেকে সরে গেলেন। তবে কোথাও একটা শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল। প্রবীন কমিউনিস্ট নেতা ধরণীকান্ত গোস্বামী এবং

কমল সরকার দুজনেই ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেছেন প্রভাবতী শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরে গেলেও, শ্রমিকদের উপর তাঁর প্রভাব সরে গেল না।

৪

শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এ যুগের (ত্রিশের দশক) আর একজন মহিলা নেত্রীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও তাঁর সময়কাল প্রভাবতী দাশগুপ্তর ঠিক এক দশক পরে তবুও তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের ধাঙড় ধর্মঘটের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তাই এইখানেই তাঁর আলোচনা প্রাসঙ্গিক। এ নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তার কারণ এ মহিলা নেত্রীর নাম—বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মোয়াজ্জেমা। মুসলমান মেয়েরা তখনও অল্প-স্বল্প লেখাপড়া শিখলেও পর্দানসীন। সুতরাং প্রকাশ্য আন্দোলন করা তখন মুসলমান মেয়েদের পক্ষে একেবারেই অকল্পনীয়। তাও জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে নয়, একেবারে কর্পোরেশনের জমাদার ঝাড়ুদারদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন।

সাকিনা বেগমের বাবা পারস্যে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি পারস্য থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতবর্ষে আসেন, এবং কলকাতায় থেকে গোপনে পারস্যের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করতে থাকেন। সাকিনার চরিত্রে ব্রিটিশ-বিরোধিতা তাই খানিকটা সহজাত। যদিও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বা জাতীয় আন্দোলনের মূল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

তবে এই যুগে শ্রমিক আন্দোলনে এঁরা অনিবার্যভাবেই কমিউনিস্ট ভাবাপন্নদের সঙ্গেই কাজ করেছেন। সাকিনা বেগম উচ্চশিক্ষিতা এবং অভিজাত পরিবারের সন্তান। বিয়েও হয় আই. সি. এস. অফিসার মিঃ মজিদের সঙ্গে। যে কোন কারণেই স্বামীর সঙ্গে তাঁর বনিবনার অভাব হওয়ায় তিনি কলকাতায় চলে আসেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্র্যাকটিসরতা মুসলিম মহিলা এ্যাডভোকেট।

১৯৪০-এর মার্চ মাসে সুভাষচন্দ্র বসুর (তিনি তখন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত) দল ফরোয়ার্ড ব্লক, মুসলিম লীগের সঙ্গে নির্বাচনী মৈত্রী করে কর্পোরেশনে জয়লাভ করে। নির্দল প্রার্থী হয়ে, কমিউনিস্টদের সমর্থনে সাকিনা বেগম কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। এখানেই তাঁর কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার, জমাদার, মেথরদের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় হয়।

এক দশক আগে প্রভাবতী দাশগুপ্তর সময়ে ধাঙড়দের যে অবস্থা ছিল,

তখনও তাই। দুবার ধর্মঘট করে, কিছু পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েও তাদের কোন দাবী মেটে নি। সুতরাং স্বাভাবিক বিক্ষোভ রয়েই গেছে। অত্যাচার অনাচারের মাত্রাও কমে নি, বরং বেড়েছে। তার উপর যুদ্ধ এনেছে বিপর্যয়। বাজারে জিনিষপত্র দুষ্প্রাপ্য এবং পাওয়া গেলেও তার অগ্নিমূল্য সাধারণ মানুষের জীবনে দুর্ভোগের সৃষ্টি করেছে। বারবার মজুরী বৃদ্ধির দাবী করা সত্ত্বেও কর্পোরেশনের নেতৃবৃন্দ এই তলার দিকের কর্মচারীদের কোনরকম বেতন বৃদ্ধি করে নি। তদুপরি কর্পোরেশনে এই সময় নির্বাচনের আগে, চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমিক ছাড়া বাকি কর্মচারীদের মাইনে বাড়িয়ে দেয়। এই বৈষম্যমূলক আচরণে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়। তারা বোঝে আন্দোলন ছাড়া কোন পথ নেই। আবার তারা ধর্মঘটের পথে পা বাড়ায়।

১৯৪০-এর ২৬ মার্চ শুরু হল ধাঙড় ধর্মঘট। ২৬ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত চলে এ ধর্মঘট। প্রায় আঠারো হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিল।

এবারে গোড়া থেকেই সরকার দমনপীড়নের পথ নেয়। কর্পোরেশনের নেতৃবৃন্দও এ ধর্মঘটকে সমর্থন করেন না, তারাও ধর্মঘটকে দরকার হলে বলপ্রয়োগে ভেঙ্গে দেবার পক্ষপাতী। শুরু হল ব্যাপক ধরপাকড়, কাশীপুর গোখানাতে গুলি চলে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকদের দমনপীড়ন কিছুই টলাতে পারে না। যদিও তখন পর্যন্ত তাদের কোন সবল সংগঠন (ইউনিয়ন) ছিল না।

ধাঙড় ধর্মঘট প্রসঙ্গ ওঠে কর্পোরেশনে। শুরু হয় তুমুল বাকবিতণ্ডা। সাকিনা বেগম মেয়র ও অন্যান্য কাউন্সিলারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন: "কর্পোরেশনর শ্রমিকরা বারবার তাদের অভাব অভিযোগের কথা বলেছে, বেতন বৃদ্ধি ও কাজের অন্যান্য সুবিধা দাবী করেছে। বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কর্পোরেশন এখন পর্যন্ত কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নি। শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ক্রমশ দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। আজ (২৬ মার্চ) থেকে শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেছে। আমাদের অবিলম্বেই কিছু করা উচিত, বার-বার সমস্যাটা এড়িয়ে গেলে চলবে না। কাউন্সিলার হিসাবে আমি মনে করি কর্পোরেশন শ্রমিকদের স্বার্থ আমাদের দেখা উচিত।" (মিনিটস অব দি প্রসিডিংস অব ক্যালক্যাটা কর্পোরেশন: ২৬.৩, ১৯৪০, পৃ ১৯৩৩)

৩০ মার্চ সভায় আবার আলোচনা ওঠে। ধর্মঘট অব্যাহত। কলকাতার রাস্তাঘাট নোংরা আবর্জনাপূর্ণ। প্রশাসন কলকাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তিত। তবে ধর্মঘটীদের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই। চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বলছেন, ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য বাইরের ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা যাচ্ছে না,

ধর্মঘটীরা তাদের প্রবলভাবে আক্রমণ করে হটিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং আমরা বাধ্য হচ্ছি পুলিশের সাহায্য নিতে। (প্রসিডিংস : ৩০. ৩. ১৯৪০ পৃ ৩০৮১)

সাকিনা বেগম পুলিশ ব্যবহারের বিরোধিতা করে বলেন, "পুলিশ জুলুম করে ধর্মঘটীদের ধর্মঘট ভাঙ্গার চেষ্টা করছে, শ্রমিককে জোর করছে কাজে যোগ দেবার জন্য। লোকের উপর উৎপীড়ন করছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, আমরা কোনও সুস্থ সরকারের অধীনে বাস করছি না আমাদের দেশে নাৎসী রাজত্ব চলছে?" (প্রসিডিংস : ৩০. ৩. ৪০, পৃ ৩০৮৬) তিনি বারবার বলেন, ধর্মঘট স্বতস্ফূর্ত এবং সর্বাত্মক। শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ। তাদের অভিযোগ ন্যায্য। কর্পোরেশনের প্রশাসন কোনদিনই তাদের সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে নি। এমনকি নিজেদের প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করে নি।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হবে। আলোচনার দায়িত্ব নেন সুভাষচন্দ্র বসু। খুবই আশ্চর্যের কথা সুভাষচন্দ্র ধাঙড়দের প্রায় কোন দাবী মানতেই রাজী হন না। কিন্তু শ্রমিকদের লৌহদৃঢ় ঐক্য এবং স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী ও আরও অনেকের দাবীতে শেষ পর্যন্ত আপস হয় : ৩০ টাকা পর্যন্ত বেতনভুক্ত সমস্ত কর্মচারীদের ১ টাকা মহার্ঘভাতা মঞ্জুর করা হবে। ২ এপ্রিল চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। বলা হল ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হলে ৩ এপ্রিল থেকে এই চুক্তি কার্যকরী হবে। (সাক্ষাৎকার : বীরেন রায়, ১৯৮৬)

জয়ী এবং উৎসাহিত শ্রমিকরা যোগ দিয়ে আবার কলকাতাকে জঞ্জালমুক্ত করল। এ কাজ তারা ১৯২৮-এর ধর্মঘটের পরও দ্রুততার সঙ্গেই সম্পন্ন করে তাদের দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিল।

নতুন নির্বাচিত কর্পোরেশনে মেয়র হলেন মুসলীম লীগ নেতা এ. আর. সিদ্দিকি। সুভাষচন্দ্র বসু অন্যতম অল্ডারম্যান নির্বাচিত হলেন। শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ বিবেচনার জন্য একটি কমিটিও তৈরী হল।

ধর্মঘটে জয়ের ফলে শ্রমিকদের উৎসাহ ও ভরসা দুই-ই বাড়ল। স্ট্রাইক কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে এবারে শ্রমিক ইউনিয়ন করার কথা ভাবা হল। অনেকে শ্রমিক ইউনিয়নে যোগ দিতে চাইল। দেখতে দেখতে ইউনিয়নের সভ্য-সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় দশ হাজার। এই কমিটির সভাপতি হন সাকিনা বেগম। সহ-সভাপতি শিবনাথ ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জী, যুগ্ম সম্পাদক ঋষি ব্যানার্জী ও দেবেন্দ্রবিজয় সেনগুপ্ত, কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন

বীরেন রায়, অনিল বসু, প্রভাত বসু, নগেন মজুমদার, মহম্মদ আলী ও মানিক রাম। উল্লেখযোগ্য শেষোক্ত দুজন ছিলেন শ্রমিকদের নিজস্ব প্রতিনিধি। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এরা নেতৃত্বে এসেছেন। (সাক্ষাৎকার ঃ বীরেন রায়)

সাকিনা বেগমের সঙ্গে শ্রমিকদের এক আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। তার বাড়ি ছিল সব ধাঙ্গড়দের জন্য খোলা। ইউনিয়ন অফিসও ছিল সেটাই। অনেক সময় শ্রমিকরা তার বাড়িতেও ঘুমিয়েছে। শ্রমিকদের কাছে তিনি ছিলেন মাতাজী। শ্রমিক বস্তিতে গেছেন, অকুণ্ঠভাবে পরিবারের সঙ্গে মিশেছেন। বীরেন রায় বলেছেন, "নেতৃত্বের মধ্যে এত জনপ্রিয় তখন বেগম সাকিনার মত আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। যখনই তিনি জমাদার পল্লীতে গেছেন তখনই তাঁর সঙ্গে দেড়শ-দুশোজন জমাদার থেকেছে। তাঁকে বলা হত ধাঙ্গড় রাণী।" মহম্মদ ইসমাইল এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "তার মিডল রোডের বাড়িই ছিল জমাদারদের ইউনিয়ন অফিস।"

কর্পোরেশন এবারেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। শ্রমিক অসন্তোষ ব্যাপক-ভাবে বৃদ্ধি পায়, নেতৃত্বও কি করবে ঠিক করতে পারে না। যুদ্ধে গতি-প্রকৃতিও জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। অপ্রতিহত গতিতে ফ্যাসীবাদ এগিয়ে চলছে পৃথিবীর বুকের উপর তাণ্ডব চালিয়ে। এ পরিস্থিতিতে কোন আন্দোলনের ঝুঁকি নিতে নেতৃত্ব দ্বিধা করছেন। কিন্তু শ্রমিকরা আবার ধর্মঘটের জন্য চাপ দিতে থাকে। যুদ্ধ ছাড়াও কতকগুলি বাস্তব সমস্যা ছিল। প্রথমত সংগঠন থাকলেও তা তখনও দুর্বল। হয়ত সংগঠনের নেতৃত্বের অধিকাংশই কমিউনিস্ট, তাদের অনেকে হয় জেলে না হয় আত্মগোপন করে আছেন, তাই এ অবস্থায় একটা বড় রকমের আন্দোলন পরিচালনা করা কঠিন।

কিন্তু শ্রমিকরা আবার ২৬ আগস্ট, ১৯৪০ ধর্মঘটের ডাক দেয়। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট গোড়া থেকেই ভেঙ্গে দিতে চায়। ধর্মঘটের পরদিনই সাকিনা বেগমকে পুলিশ তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে এবং শ্রমিক ও সংগঠক মিলিয়ে আরও ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করে। ফলে শুরু থেকেই আন্দোলন প্রায় নেতৃত্ববিহীন। এ ধর্মঘটের সামনের সারিতে এসে দাঁড়াল খবরবাহিত গাড়ির গাড়োয়ানরা, তারা খুব জঙ্গী স্বভাবের। বহু জায়গায় গোখানাগুলিতে গুলি চলে, লাঠিচার্জ হয়। হাজরার মেথর বস্তিতে, গ্রে স্ট্রীটের জমাদার বস্তিতে এবং আরও অনেক জায়গায় প্রচণ্ড লাঠিচার্জ হয়। চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পুলিশের সহায়তায় ধর্মঘট ভাঙ্গার চেষ্টা করেন।

কর্পোরেশন কোন আলাপ আলোচনা করতে রাজী নয়। তাছাড়া

কমিউনিস্ট নেতারা অনেকেই জেলে। বেগম সাকিনার যদিও অল্প দিনের মধ্যেই মুক্তি হয় কিন্তু মেয়র তাকে কলকাতা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন এবং কিছুদিন অন্তরীন অবস্থায় তাঁকে কার্শিয়াং কাটাতে হয়। সুতরাং ধর্মঘট চালাবার মত কেউ নেই। কর্পোরেশন নোটিশ দিল ২৮ আগস্টের মধ্যে কাজে যোগ না দিলে শ্রমিকদের বরখাস্ত করা হবে।

শ্রমিকরা কেউ কাজে যোগ দিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট ভেঙ্গে গেল। ৫ সেপ্টেম্বর মেয়রের সাথে আলোচনার পর শ্রমিকরা ধর্মঘট তুলে নিয়ে কাজে যোগ দেয়। প্রায় ১২০০ গাড়োয়ানের চাকুরী চলে যায়, যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মিটমাটের পর যদিও তাদের মুক্তি দিল কিন্তু তারা চাকরী ফেরৎ পেল না। (আনন্দবাজার পত্রিকাঃ ২২ আগস্ট, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ এবং সাক্ষাৎকারঃ বীরেন রায়, ১৯৮৬)

ধর্মঘট ভাঙ্গায় এবং বিপুলসংখ্যক কর্মী ছাঁটাই হওয়ায় ধাঙড়দের মধ্যে এক হতাশার সৃষ্টি হল। ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে লাগল। সাকিনা বেগমও এই সময় ধাঙ্গড়দের পাশে এসে দাঁড়ালেন না, সমস্ত পরিস্থিতি তাঁর কাছে এমন অপমানজনক যে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। আন্দোলনের জোয়ারে যিনি ছিলেন ধাঙ্গড়দের শ্রদ্ধার ও আস্থার পাত্রী এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেত্রী, আন্দোলন ধাক্কা খাওয়ায় সেই ভেঙ্গে যাওয়া আন্দোলনকে আবার গড়ে তুলে তাকে নেতৃত্ব দেবার মত ক্ষমতা সাকিনা বেগমের ছিল না বলেই মনেহয়। সম্ভবত তাই তিনি শ্রমিক আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন, কারণ শ্রমিকদের বা সহকর্মীদের আস্থা কোনটাই তিনি হারান নি। মানবতা ও আদর্শবাদের সঙ্গে বাস্তবতার সমন্বয় না হলে এরকম ঘটনা ঘটা সম্ভব। তাই সাফল্যকে এরা গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে পারেন না।

৫

উত্তাল ত্রিশের দশকে শুধু চটকল ও কর্পোরেশনের ধাঙ্গড়রা বা সুতাকল শ্রমিকরাই আন্দোলনের পথে পা বাড়ায় নি, আন্দোলনে নেমেছে বন্দর শ্রমিকরাও। এ দেশকে যতরকমভাবে পারে শোষণ করেছে সাম্রাজ্যবাদ। এ দেশের সম্পদ জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে গেছে নিজের দেশে। শুরু থেকেই চলেছে বাণিজ্য। পরে আর বাণিজ্য নয় প্রায় একতরফা লুণ্ঠন চলেছে।

এই বন্দরগুলিতে কাজ করত ভারতবর্ষের নানান প্রদেশ থেকে আসা অনেক অভাবী মানুষ। তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের

দোসররা এদের উপর নানাভাবে শোষণ চালিয়েছে। এই শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামল বন্দর শ্রমিকরা ১৯৩৪-এ। এই বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে এলেন কমিউনিস্ট কর্মী সুধা রায় এবং পরে ডঃ মৈত্রেয়ী বসু।

প্রবীন বিপ্লবী এবং কমিউনিস্ট কর্মী কমলা মুখার্জী বলেছিলেন, "তখন কমিউনিস্টদের উপর নির্দেশই ছিল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে হবে। খিদিরপুর মেটেবুরুজে বন্দর শ্রমিক এলাকায় গেলাম তাদের মধ্যে কাজ করতে। এক একদিন কাজ সেরে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। আমরা পারলাম না ওখানে কাজ করতে। ফিরে এলাম কলকাতায়। এন্টালী গড়পার, শিয়ালদা অঞ্চলে ধাঙড় বস্তিতে বস্তিতে কাজ করতে শুরু করলাম ১৯৩৭-৩৮ সালে। তখন ধাঙ্গড়দের অসম্ভব জনপ্রিয় নেত্রী হলেন সাকিনা বেগম। ডক এলাকায় সুধা রায় বেশ কিছুদিন কাজ করেন, সম্ভব হয়েছে অনেকটা তাঁর অসাধারণ সাহস ও ব্যক্তিত্বের জন্য আর তাঁর দাদা শিশির রায়ের জন্য। ডঃ মৈত্রেয়ী বসুও দীর্ঘদিন তাঁদের মধ্যে কাজ করেছেন। বলতে দ্বিধা নেই আমরা যা পারি নি, ওঁরা তা পেরেছেন।" (সাক্ষাৎকার : কমলা মুখার্জী, ৭. ৬. ৮৯)

সমাজের নির্যাতিত মানুষের দুঃখে ব্যথিত হয়ে এবং এক আদর্শবাদ থেকে সন্তোষকুমারী, প্রভাবতী ও সাকিনা বেগম শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, সুধা রায়ের মধ্যে তার চেয়ে বেশী কিছু ছিল। নিম্ন-বর্গের মানুষের বিশেষ করে শ্রমিকের যন্ত্রণা তাকে শুধু ব্যথিত করে নি, এক জ্বালারও সৃষ্টি করেছে। তাই তিনি সাময়িক সুরাহার ব্যবস্থায় শুধু ভরসা না করে শ্রমিকশ্রেণীকে এক নতুন চেতনা ও বুদ্ধির স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। সুধা রায় বন্দর শ্রমিকদের ধর্মঘটের নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন না, শ্রমিকদের প্রকাশ্য জমায়তে বক্তৃতা করছেন এমনও শোনা যায় না, তবে ধর্মঘটের সময় প্রায় রোজই তিনি ওখানে যেতেন, শ্রমিকদের সঙ্গে নানাবিধ রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। মনে হয় কমিউনিস্ট মতাদর্শেই সুধা রায়কে এভাবে কাজ করতে সাহায্য করেছে।

কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী এমন অনেকেই যেমন—জ্যোতির্ময় নন্দী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, শিশির রায়, কমল সরকার প্রমুখরা লেবার পার্টিতে ও তার পিছনে গড়ে ওঠা বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেন। বৈঠকখানা বাজারের কাছে একটি ছোট ঘরে লেবার পার্টির অফিস ছিল। সুধা রায় তাঁর দাদা শিশির রায়ের প্রভাবে লেবার পার্টিতে যোগ দেন। তিনি নিজেকে একজন কমিউনিস্ট হিসেবেই গড়ে তুলেছিলেন। লেবার

পার্টির সদস্যরা আন্দোলন করতে এলেন বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে। বিক্ষুব্ধ বন্দর শ্রমিকরাই অবশ্য এদের সঙ্গে প্রথমে দেখা করে।

তখন বন্দর শ্রমিকরা আসত বাংলার বাইরে থেকে। অধিকাংশই উর্দুভাষী মুসলমান-হিন্দুস্থানী এবং ওড়িয়া। বাঙালী খুবই কম। কোন মহিলা শ্রমিক বন্দরে কাজ করত না। এমনকি শ্রমিকরা পরিবার নিয়েও এখানে থাকতেন না। উদয়াস্ত পরিশ্রম করলেও মাইনে পেত সামান্য, বাসস্থান মানুষের অযোগ্য, নানান স্তরের লোককে খুশী রেখে চাকরী বজায় রাখতে হয়, চাকরী বা জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। ফলে এরা জীবন কাটাতে অমানুষিক পরিশ্রম ও নির্যাতন সহ্য করে; এবং মদখেয়ে তা ভোলার চেষ্টা করত।

সুধা রায় এক কথায় এদের মধ্যে কাজ করতে রাজী হয়ে গেলেন। খিদিরপুর, মেটেবুরুজ, চুনাগলি অঞ্চলের কথা যারাই জানেন তাদের পক্ষে বোঝা কিছু শক্ত নয় যে এ অঞ্চলে রাতে এমনকি দিনেও একজন মহিলার পক্ষে ঘোরা কত কঠিন কাজ। বিশেষ করে ধর্মঘটের সময় যখন শত্রুপক্ষের লোকেরা ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য সন্ত্রাস চালিয়েছে। সুধা রায়ের সাহসের অভাব ছিল না। রোজ তিনি কলকাতা থেকে স্কুল ছুটির পর (তিনি কমলা গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন) ওখানে যেতেন, বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরতেন। এমনও হয়েছে যে কাজ করতে করতে রাত হয়েছে, সেদিন ওখানে রাতে থেকেছেন; একটা ছোট ঘরে ২-৩ জনের সঙ্গে। মনে হয় নি ওর তাতে কোন অসুবিধে হত। কোনদিন কোন শ্রমিক এলাকায় তিনি বিপদে পড়েন নি, অসম্মানিত হন নি। শ্রমিকরা তাদের 'সুধাদি'কে বিপদে আপদে রক্ষা করেছে। বিপদের সম্ভাবনা থাকলে ইউনিয়নের লোকেরা যখন গোলমেলে হতে শুরু করে তখন তারাই সুধাকে ওখানে যেতে না করে। (সাক্ষাৎকার ঃ জ্যোতির্ময় নন্দী, ১২. ৭. ৮৭)

ডক শ্রমিকদের মধ্যে তখন কাজ করছেন এম. এন. রায়ের অনুগামী রজনী মুখার্জীও। শ্রমিকদের নিয়ে একটা ইউনিয়ন তৈরী করার প্রয়োজন সবাই অনুভব করল। শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে মহম্মদ সেলিম, শের খাঁ, আব্দুল আজিজ সর্দার কিছু শ্রমিক নিয়ে লেবার পার্টি অফিসে আসে। আলাপ আলোচনা করে ঠিক হয় স্টিভেডোরদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে হলে ইউনিয়ন তৈরী করতে হবে এবং তার জন্য মনুমেণ্ট ময়দানে এক সভা ডাকা হল। সভায় খুব কম লোক এল। কিন্তু পার্টি অফিসে বহু লোক এল এবং ইউনিয়ন করার পক্ষে সই দিল।

১৯৩৪-এর মার্চে তৈরী হল পোর্ট এ্যাণ্ড ডক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। সভাপতি হলেন আব্দুল আজিজ। সম্পাদক শিশির রায় এবং যুগ্ম সভাপতি হলেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এবং রজনী মুখার্জী। নিশ্চয়ই এদের আন্দোলন মূলত অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া ও আনুসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার জন্য। তবে একধরনের রাজনৈতিক বোধও এদের ছিল। ১৯৪৪-এর পয়লা মে লালঝাণ্ডাকে অভিবাদন জানিয়ে এরা প্রথম মে দিবস পালন করে। একই সঙ্গে শ্লোগান দেয় 'লাল ঝাণ্ডা কি জয়', কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ, আবার 'আল্লা হো আকবর'। (অমৃতবাজার পত্রিকাঃ ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৪)। এরা ধর্মভীরু কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না।

ঐ একই দিনের কাগজে বলা হচ্ছে, মার্চ মাসে বন্দর শ্রমিকদের ইউনিয়ন তৈরী হয়। ২৯১ জন ইউনিয়নের সদস্য হয়। ইউনিয়ন তহবিলে সদস্য চাঁদা জমা হয় ৪৮ টাকা ৮ আনা। ইউনিয়নের প্রথম সমাবেশ হয় ২৯ এপ্রিল। সমাবেশে বিশ্ব শ্রমিকদের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয় এবং মে দিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইউনিয়নের উপর কমিউনিস্ট প্রভাব খুব স্পষ্ট। (অমৃতবাজার পত্রিকা ঃ ১৩. ১২. ১৯৩৪) একই কথা কমল সরকার লিখেছেন, "১৯৩৪ সালে কলকাতার ডক শ্রমিক ধর্মঘট—একটি পর্যালোচনা" প্রবন্ধে। (শ্রমিক আন্দোলন ঃ এপ্রিল ১৯৮৯)

১৯৩৪-এর নভেম্বর মাসে ডক ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে শুরু হল বন্দর শ্রমিক ধর্মঘট। ২৭ নভেম্বর থেকে থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন সপ্তাহ ধর্মঘট চলে। আন্দোলনে যে সব দাবীগুলি শ্রমিকরা রেখেছিল তা হল ঃ

* কাজের সময় ১১ ঘণ্টা কমিয়ে ৮ ঘণ্টা করতে হবে।
* দৈনিক মজুরীর হার ১২ টাকা ৮ আনা (৮ জন শ্রমিক ও ১ জন সর্দার—প্রতিদিন একজন ১ টাকা ৪ আনা হারে এবং একজন সর্দার ২ টাকা ৮ আনা হারে মজুরী পায়) থেকে বাড়িয়ে ১৬ টাকা ৮ আনা করতে হবে।
* কাজের চাপ কমাতে হবে।
* চাকরীর স্থায়িত্ব ও নিয়মকানুন প্রবর্তন করতে হবে।

২০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে ১৫,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। শ্রমিকরা তাদের সিদ্ধান্তে অটল, দাবী না মানলে কাজে যোগ দেবে না।

মেটেবুরুজ জাহাজ মেরামত কোম্পানীর ৫০০০ শ্রমিকের মধ্যে ২০০০ শ্রমিক বন্দর শ্রমিকদের সমর্থনে ধর্মঘট করে। সেদিনকার কলকাতা বন্দর

আজকের মত নয়, কর্মব্যস্ত জমজমাট। সেখানে ৫০টি জাহাজ অচল হয়ে বসে আছে। ধর্মঘট সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণ।

স্টিভেডোররা চেষ্টা করে চীনা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও কয়লাখনির শ্রমিক আনিয়ে ধর্মঘট ভাঙ্গতে। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক প্রতিরোধের সামনে দালালরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

ধর্মঘটের কতকগুলি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার মত। কোন সাময়িক উত্তেজনা বা আবেগে ধর্মঘট হয় নি। ধর্মঘটের ডাক দেবার আগে, শ্রমিকদের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার কাজে জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনার মান বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা নেতৃত্ব করেছে। যে কোন আন্দোলনেই এটা একটা বড় সম্পদ। ধর্মঘটের আগেই কোন কোন দিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে শ্রমিকদের লৌহদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্য থেকে বাছাই করা কর্মী নিয়ে স্ট্রাইক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সমস্ত খবরাখবর রোজ দুপুরে সাধারণ সভা ডেকে ১৪০০০ শ্রমিককে জানানো হয়েছে। শ্রমিকরা আন্দোলনের প্রত্যেকটি গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বাছাই করা শ্রমিককে নিয়ে ভলাণ্টিয়ার বাহিনী তৈরী হয়েছে—যার ফলে দালাল আটকানো গেছে। ধর্মঘটের সময় ছোট ছোট গ্রুপ করে বহু কর্মী শ্রমিকদের চেতনার মানকে উন্নত করতে রাশিয়ার গল্প, কমিউনিজমের কথা বলা হয়েছে। ধর্মঘট হয়ে দাঁড়িয়েছে কমিউনিজমের শিক্ষালয়। (কমল সরকার: ১৯৩৪ সালে কলকাতার ডক শ্রমিক ধর্মঘট—একটি পর্যালোচনা, শ্রমিক আন্দোলন, এপ্রিল ১৯৮৯)

এই শিক্ষালয়ের একজন অন্যতম শিক্ষিকা ছিলেন সুধা রায়। "হাজরা লেনের বাসা থেকে প্রতিদিন খিদিরপুরের ডক অঞ্চলের শ্রমিক বস্তিতে গিয়ে রুশ দেশে মহান লেনিনের নেতৃত্বে কি করে সেখানকার শ্রমিকেরা দু-দুবার বিপ্লব করে, সে কথা সুধা ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন। তাছাড়া কি করে সে দেশের শ্রমিকদের মধ্যে শ্রমিক-রাজত্ব অর্থাৎ সোভিয়েত ধরনের রাজত্ব গঠন করতে পেরেছে তার সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করতেন। অন্যান্য দেশেও যে কমিউনিস্ট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে তার কথাও বলতেন।… সুধা রায়ই প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী, যিনি সচেতনভাবে রাজনীতিকে শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে প্রসারিত করতে সচেষ্ট ছিলেন।" (কমল সরকার: কমরেড সুধা রায়, শ্রমিক আন্দোলন, আগস্ট ১৯৮৭)

সন্তোষকুমারী দেবী বা প্রভাবতী দাশগুপ্তর সঙ্গে এখানেই সুধা রায়ের বড় পার্থক্য ছিল। সুধা রায়ের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল তার সততা, নিষ্ঠা, রাজনীতি সচেতনতা ও কর্মপ্রীতি।

"সুধাদি ছিলেন ডক মজদুর ইউনিয়নের একজন কর্মী। তিনি ডক লেবার বোর্ডে প্রথম মহিলা সদস্যা হিসাবে নির্বাচিত হন। যখন আমরা রাজনীতি করতে নেমেছি তখন সুধাদিকে আমরা দেখেছি একজন প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নিস্ট হিসাবে।" (রেণু চক্রবর্তী : "সুধাদি স্মরণে", কালান্তর, ১১ জুন, ১৯৮৭)

ডকের পর সুধা রায় তার কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন বারাকপুরের চটকল শ্রমিকদের মধ্যে, তখন তার প্রধান কর্মস্থল ছিল হাজিনগর। সরকারি গোপন রিপোর্টেও বলা হচ্ছে : "সুধা রায় লেবার পার্টির একজন উল্লেখযোগ্য কর্মী ছিলেন। তিনি বারাকপুর ও শহরতলীর শ্রমিক এলাকায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। বস্তিতে বস্তিতে ছোট ছোট গ্রুপ মিটিং করতেন। তিনি স্টাডি গ্রুপ তৈরী করে নিয়মিত পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বোধ জাগাবার জন্য পড়াতেন।" সে যুগে সুধা রায় যে সাহসিকতার সঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিজমের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন তা পরবর্তীকালে অন্যের কাছে পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে।

এর তাৎক্ষণিক প্রভাবও লক্ষ্য করা গেল। ডক শ্রমিকদের ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে গেল। ধর্মের জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ায় উত্তপ্ত করে, শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টায় যখন সরকারপক্ষ বদ্ধপরিকর, তখন শ্রমিক ঐক্য রক্ষার তাগিদে কয়েকটি প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে তিন সপ্তাহের মাথায় ১৬ ডিসেম্বর ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হল। প্রতিশ্রুতিগুলি হল :

১) ধর্মঘট করার জন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

২) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অর্থ-সদস্য স্যার জন উডহেড ও সিপিং এজেন্টদের পক্ষে ইলিয়ট লকহার্ট আর্থিক বিষয় বিবেচনা করবেন। যদিও কোন দাবীই পরবর্তীকালে বিবেচিত হয় নি। সাম্প্রদায়িকতার বিষে বিষাক্ত হল একাংশ শ্রমিক। পাল্টা ইউনিয়ন তৈরী হল।

এই ধর্মঘট আবার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। এই ধর্মঘট থেকে যে শ্রমিকরা বেরিয়ে এসেছিল, যারা আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে এসেছে—হাফিজ জালালুদ্দিন, মহম্মদ ইউসুফ, আহম্মদ হোসেন, আবদার রহমান খান, মাজার খান, শ্রীনারায়ণ রেড্ডী, জুমরাত আলির মত দৃঢ়চেতা শ্রমিক-নেতা যে কোন সময়ের শ্রমিকনেতার উদাহরণ হয়ে থাকবে। (সাক্ষাৎকার :

কমল সরকার ও জ্যোতির্ময় নন্দী ১৯৮৭) পরবর্তীকালে এরা কমিউনিস্ট পার্টিতেও যোগ দিয়েছেন।

ধর্মঘটের মাসটা ছিল রোজার মাস। কিন্তু শ্রমিকরা পথসভা করেছে, রাস্তায় মিছিল করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করেছে, বস্তিতে বস্তিতে সংগঠনকে জোরদার করার আলাপ আলোচনা চালিয়েছে আবার রাতে হয় ইউনিয়ন অফিসে নয়ত পার্টি অফিসে সারাদিনের কাজের মূল্যায়ন করা, আন্দোলনের খবরাখবর সংগ্রহ করা—এসবও করেছে। মাঝে মাঝেই সমস্ত ধর্মঘটী শ্রমিক জমায়েতের সামনে নেতৃত্ব ঘটনা খোলাখুলি ব্যাখ্যা করতেন। কোন অবস্থাতেই স্টিভেডোরদের হুমকির কাছে মাথা নোয়াবে না, আন্দোলনে অটল থাকবে—এই প্রতিজ্ঞা করে সবাই বাড়ি গেছে। শ্রমিকদের এই জঙ্গী ও রাজনৈতিক চরিত্র উল্লেখযোগ্য। শ্রমিকরা ধর্মভীরু কিন্তু অসাম্প্রদায়িক মনোভাব স্পষ্ট ব্যক্ত করেছে। তাই তারা দাঙ্গা রুখেছে, অনেক সময় দাঙ্গা বাধতেই দেয় নি। শ্রমিকশ্রেণী যে রাজনৈতিক লড়াই লড়তে পারে, রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা রুটি-রুজির লড়াইয়ে এসেছে। এই রাজনৈতিক চেতনা ছিল বলেই ধর্মঘট ভেঙ্গে গেলেও ইউনিয়ন ভাঙ্গল না।

আর এ কাজ প্রধানত করেছেন সুধা রায়। শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়ানোয়, তাদের সাহস ও মনোবল বাড়ানোয় তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, যা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে সামিল হতে সাহায্য করেছে।

প্রথম পর্বের (প্রায় তিন দশক) শ্রমিক আন্দোলনের ও সেই আন্দোলনে মহিলা নেতৃত্বের ভূমিকার কিছু মূল্যায়ন, কিছু প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা হয়ত এখানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

স্বাধীনতা উত্তর যুগে আগের চেয়ে অনেক বেশী বেশী মেয়ে নানান ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে। বহু কলকারখানায় এখন ইউনিয়ন আছে ফলে শ্রমিকরা এখন সংগঠিত। কিন্তু আমাদের দেশে অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যাও কম নয়। এদের মধ্যে আবার মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশী। এ কথা ঠিকই আগের চেয়ে সব স্তরেই রাজনৈতিক চেতনা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, আন্দোলন করা, দাবীদাওয়া আদায় করা এবং ট্রেড ইউনিয়নের জোরে বহু মানবিক আইনকে মালিকপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়া—এ সব এখন হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্প, কারখানার অবস্থা আজও খুব আশাব্যাঞ্জক নয়। বহু কারখানায় কুলুপ বন্ধ। শ্রমিক ছাঁটাই নির্বিচারে এখনও হয়ে চলছে। মেয়েদের চাকরী দিলে তাদের নানান রকম সুযোগসুবিধা দিতে হবে, ফলে মেয়েদের চাকরী না দেওয়ার চেষ্টা, বিশেষ করে অবিবাহিত মেয়েদের বহু

কোম্পানীর মালিকরাই চাকুরী দিতে চায় না। এ সব ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়নগুলি নিশ্চয়ই সজাগ, তবে মনেহয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে এ ব্যাপারে আরও সতর্ক, সজাগ এবং তৎপর হতে হবে। একটা প্রশ্ন মনে জাগে এখন ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বের মধ্যে মহিলাদের নাম প্রায় চোখেই পড়ে না। অথচ মহিলারা তো এখন অনেক সচেতন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকে আমরা তো বেশ কয়েকজন মহিলা নেত্রীর নাম এবং তাদের অনেকের কার্যকলাপেরও বেশ কিছু তথ্য পেয়েছি। এ রকমটা কেন হল ?

যে যুগে জাতীয় আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনকে গুরুত্ব দেয় নি, যে যুগে খুব কম পুরুষই শ্রমিক আন্দোলনে এসেছেন, সেখানে সন্তোষকুমারী দেবী, প্রভাবতী দাশগুপ্ত, সাকিনা বেগম, সুধা রায়, বিমলপ্রতিভা দেবী, মৈত্রেয়ী বসু, বীণা দাস—এ সব নাম আমাদের একটু অবাক করে বৈকি।

কেন এরা ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত থেকে বা না থেকেও শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে এলেন—তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য স্পষ্ট উত্তর এখনও পাই নি। সন্তোষকুমারী বলছেন, স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে এসেছেন। অন্যান্যরা কোন কারণ দেখান নি। মনেহয় প্রধানত মানবতাবোধ থেকে এবং রাজনৈতিকভাবে বিশেষ কোন কোন ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরা শ্রমিক আন্দোলনে এসেছেন। তখন কমিউনিস্ট হলেই তাদের শ্রমিক আন্দোলন করতে হত। এইভাবে বঙ্কিম মুখার্জী, ধরণী গোস্বামী, মুজফ্‌ফর আহমদ, গোপেন চক্রবর্তী প্রমুখ শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে এসেছেন। প্রভাবতী এদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত বলে মনেহয়। সাকিনা বেগম কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হিসাবে শ্রমিকদের অনেক কাছাকাছি আসেন—কিন্তু এখানেও বামপন্থী নেতাদের সঙ্গেই তিনি কাজ করেছেন। সুধা রায় লেবার পার্টিতে আসেন প্রধানত দাদা শিশির রায়ের প্রভাবে, এবং একই সূত্রে তিনি মার্কসীয় রচনাসমূহ পড়ার সুযোগ পান, যা তাকে কমিউনিস্ট করেছে। তাঁর শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ কমিউনিস্ট হিসেবেই।

সন্তোষকুমারী বা প্রভাবতী জানাতে কুণ্ঠা করেন নি যে তারা কমিউনিস্ট নন, কিন্তু কমিউনিস্টদের সঙ্গে তারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন, কোন রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা বা ছুৎমার্গ তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয় নি। পরে অবশ্য কমিউনিস্ট বিরোধিতা এদের কাজের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাজে, কথায় বা লেখায় সন্তোষকুমারীর যে একটা রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে তা বোঝা যায়। সুধা রায় তো প্রথম থেকেই লেবার পার্টি এবং কিছু পরে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্যা ছিলেন। তিনি নিঃসন্দেহে এদের মধ্যে অন্যতম ব্যতিক্রম। প্রভাবতী বা সাকিমা বেগম মানবিকতা ও ইংরেজ বিরোধিতা ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন বলে মনে হয় না। তাই একটা সঙ্কটের মুহূর্তে বা ব্যক্তিগত মনোমালিন্যকে কেন্দ্র করে প্রভাবতী এবং সাকিনা বেগম আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেলেন—এক অর্থে ইতিহাস থেকেও হারিয়ে গেছেন। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত সন্তোষকুমারীর রাজনৈতিক চেতনা আজও স্বচ্ছ। তাই তিনি আকস্মিকভাবে শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরে গেলেও নানান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রইলেন। সুধা রায় তো কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে শ্রমিক আন্দোলনে এলেন এবং আমৃত্যু আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে গেলেন। নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন নানান আন্দোলনের মধ্যেই।

এই মহিলা নেত্রীদের আমিত্ব (ego) বোধটা ছিল প্রবল। হয়ত সে সময়ে এটাই স্বাভাবিক ছিল। কমলা মুখার্জী বলছেন, তখন শ্রমিকরা যে কোন কারণেই হোক মহিলাদের উপর বেশী আস্থাশীল ছিল। তাদের একজন মাতাজী দরকার, যার উপর তারা সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে। (সাক্ষাৎকার ঃ ৭. ৬. ৮৯) তাই সন্তোষকুমারী, প্রভাবতী, সাকিনা বেগম, সুধা রায় বা মৈত্রেয়ী বসু অনায়াসেই তাদের 'মাইরাম', 'মাতাজী' বা 'বহিনজী'তে পরিণত হয়েছেন। এর একটা অন্য কারণও আছে। পুরোনো কালের এই মহিলা নেত্রীরা সবাই উচ্চশিক্ষিত এবং অনেকেই উচ্চবিত্তের মানুষ। অথচ অনায়াসে চটকল, ধাঙ্গড় বা বন্দর শ্রমিকদের বস্তিতে বস্তিতে এরা ঘুরেছেন। এদের সঙ্গে অকৃত্রিমভাবে মিশেছেন। বাড়ির মেয়েদের আস্থা অর্জন করেছেন, পুরুষরাও সম্পূর্ণভাবে এদের উপর নির্ভর করেছে। ফলে নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে হয়ত কিছুটা অতিরঞ্জিত-ভাবেই ভেবেছেন। নেত্রী হতে ভালবেসেছেন, অন্যের হাতে কখনও নেতৃত্ব ছাড়তে হবে এটা ভাবতে পারেন নি। এটা একটা বড় দুর্বলতা, একটা বড় সমস্যাও।

বিশ-ত্রিশের দশকে শ্রমিক আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে এদের নাম মুখে মুখে ফিরত, কিন্তু পরে যখন রাজনীতির পরিবর্তন হল, পরিস্থিতি দ্রুত-গতিতে পাল্টাল, নেতৃত্ব ও আন্দোলনের গতি পরিবর্তনের প্রয়োজন হল, তখন সেই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে এরা খাপখাওয়াতে পারলেন না।

নেতৃত্বের আসন থেকে নেমে আসতে হল—এর সঙ্গে মনেহয় এরা মানিয়ে নিতে পারলেন না। শ্রমিকদের ভালবাসা রইল এদের জন্য, তবে আস্থা কমে গেল। শ্রমিক আন্দোলনে নতুন চরিত্রের সঙ্গে শ্রমিকরাও আর এদের নেতৃত্ব মানতে পারল না।

এ দুর্বলতা সত্ত্বেও কতকগুলি উল্লেখ করার মত দিক চোখে পড়ে, যা আজও কিন্তু প্রাসঙ্গিক। যেমন শ্রমিকরা তো আসত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে, তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ধর্মের। অনায়াসে এরা তাদের সঙ্গে মিশেছেন, জাতপাত ধর্ম এটা কোনদিনই এদের কাছে সমস্যা বলে মনে হয় নি। কারখানা এলাকায় বিশেষ করে আন্দোলনের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একেবারে যে হয় নি তা বলা যায় না, তবে এ রকম ঘটেছে খুবই কম। বরঞ্চ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য মালিকপক্ষের সমর্থক ভদ্রলোকরা অনেক সময় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি শ্রমিকদের মধ্যে উস্কে দিয়েছেন। সব কটা দাঙ্গাই এর ফলে হয়েছে। নেতৃত্বের এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং জাতপাতের সমস্যায় ভেসে না যাওয়া—এটা কি সে যুগে গান্ধী নেতৃত্বের প্রভাব? না সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব? এ প্রশ্ন ভেবে দেখার দরকার আছে। বিশেষ করে আজ যখন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আবার উস্কানি পেয়ে প্রগতি-শীল আন্দোলনের পথরোধ করার চেষ্টা করছে।

কোন সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার চিন্তা দ্বারা এরা আচ্ছন্ন হন নি। কত অঞ্চল থেকে শ্রমিকরা এসেছে। আঞ্চলিকতা নয় শ্রমিক সত্তাই তারা বড় করে দেখেছেন। নেতৃত্বের এই মানসিকতা সেদিন শ্রমিকদেরও প্রভাবিত করেছে। যে কোন যুগে রাজনীতিতে এটা একটা শিক্ষনীয় দিক।

বস্তিতে ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান এবং স্বাধীন অর্থনীতির সংস্থান করার জন্য এরা বারবার দাবী করেছেন। মেয়েদের কতকগুলি বিশেষ সুযোগসুবিধা আদায়ের জন্য লড়াই করতে শিখিয়েছেন। কিন্তু শ্রমিককে নেতৃত্বের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কোন চেষ্টাই এরা করেন নি। তাই শ্রমিকদের মধ্য থেকে কেউ নেতৃত্বেও আসে নি। এর ব্যতিক্রম দেখা গেল তাদের শ্রমিক ধর্মঘটের সময়। নেতৃত্বের একটা বড় অংশ শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই উঠে এল। যত প্রাথমিক স্তরের হোক না কেন একটা রাজনৈতিক শিক্ষা শ্রমিকদের হয়েছিল। ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিক চরিত্রেও পরিবর্তন আসতে শুরু করে। যেসব জায়গায় শ্রমিকরা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সঙ্গে নেতৃত্বে সমান জায়গা করে নিয়েছে, দেখা গেছে সেখানে আন্দোলন ভাঙ্গলেও ইউনিয়ন ভাঙ্গে না এবং আবার সুযোগ পেলেই অনায়াসে

আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছে। একটা ধর্মঘট থেকে একাধিক শ্রমিকের নেতৃত্বে উঠে আসা আজকের শ্রমিক আন্দোলনকেও প্রভাবিত করে। অবশ্য এই সময়কার সব আন্দোলন কিন্তু শ্রমিকদের নেতৃত্বে আসার সুযোগ করে দেয় নি। নেতৃত্ব থাকবে উচ্চবিত্তের উচ্চশিক্ষিতের হাতে—জাতীয় আন্দোলনের এই চিন্তা শ্রমিক আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছে। বামপন্থী চিন্তাভাবনা রাজনীতিতে আসায় অবস্থার রূপান্তর ঘটেছে।

সবশেষে একটা কথা বলা দরকার। এইসব প্রথম যুগের শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রীদের কাজেকর্মে ভুল, ত্রুটি, দুর্বলতা থাকতেই পারে, তবুও স্বীকার করতে হবে এরাই তো প্রথম যুগে অমন সাহস দেখিয়ে বহু বাধা অতিক্রম করে শ্রমিকদের সংগঠিত করা এবং নানান দাবীদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করার পথ দেখিয়েছেন। রাজনীতির সঙ্গে শ্রমিকদের যুক্ত না করেও আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিককে একাত্ম হতে শিখিয়েছেন। কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও কার্যপদ্ধতির সঙ্গে এদের বনিবনা না হওয়ায় এরা আন্দোলন থেকে সরে গেছেন। পরে যারা শ্রমিক আন্দোলনের সারথি হয়েছেন, তাদেরও কি কোন দায়িত্ব ছিল না এদের ধরে রাখার? তাতে আমাদের শ্রমিক আন্দোলন সফলই হত।

স্বাধীনতার ৪২ বছর অতিক্রান্ত। রাজনীতির সঙ্গে এখন কম বেশী অধিকাংশ মানুষই যুক্ত আছেন। বহু মহিলা আজ নানান ধরনের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। অথচ আজও ক'জন মহিলা ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রীর নাম পাই? সন্তোষকুমারী, প্রভাবতী, সুধা রায় এক নতুন পথের দিশারী ছিলেন, কিন্তু সে পথ আজ ক'জন মহিলা অনুসরণ করছেন?—এটাও ভাববার বিষয়।

'মেয়েদের ইতিহাস' ও সাহিত্যের সাক্ষ্য

মালিনী ভট্টাচার্য

ইতিহাসচর্চারও, যে কোন জ্ঞানচর্চার মতোই, একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আছে। মতাদর্শগত প্রাধান্য বা 'হেজিমনি'-কে (hegemony) জোরদার করার একটি মাধ্যম হিসাবে তার একটা ভূমিকা আছে। এতাবৎকালের ইতিহাসচর্চাকে পুরুষপ্রধান সমাজের বক্তব্য হিসাবে 'his story' বলে যদি দেখা হয় তাহলে তার উল্টোপিঠে এ পর্যন্ত উহ্য কোনো 'her story' আবিষ্কার করা সম্ভব কিনা—'মেয়েদের ইতিহাস' এই ধারণাটির সূত্রপাত এখান থেকে। ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তার মধ্যে একটা বিন্যাস এনেছেন, তার মালমশলাগুলিকে সাজিয়েছেন, এদিক থেকে অনেকের মতে ইতিহাস রচনার সঙ্গে সাহিত্যরচনার একটা সাযুজ্য আছে।[১] আবার সাহিত্যের মতোই ইতিহাস রচনার এই বিন্যাসও বিশ্লেষণযোগ্য, সে বিশ্লেষণে যা বলা হয় নি, যাকে চাপা দেওয়া হয়েছে বা রচনার মধ্যে যা অসঙ্গতি হিসাবেই দেখা দিয়েছে তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রচিত ইতিহাসকে না ভাঙলে তার মধ্যে যা অনুপস্থিত তার তাৎপর্য বোঝা যায় না। সাহিত্যে বিন্যাসটা স্বীকৃত এবং অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত সচেতন ; তার মধ্যে যা উহ্য তাকে আমরা অনুমান করে নিতে পারি। সাহিত্যিক অনুমানের এই আদলটি সেইসব ইতিহাসবিদ-দের কাজে লাগতে পারে যাঁরা ইতিহাস রচনারও শূন্যস্থান, তার নীরবতা, তার অসঙ্গতিগুলিকে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করছেন। মেয়েদের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টাটা এরই একটা অংশবিশেষ। তাই 'মেয়েদের ইতিহাস' কথাটি দিয়ে যা বোঝানো হয় তা কেবল সমাজ ও রাজনীতির বিবর্তনে মেয়েদের ভূমিকা নির্ণয়ের কাজ নয়, তাঁদের চোখে নিজেদের ভূমিকা কীরকমভাবে দেখা দিয়েছিল তারও বিশ্লেষণ। এই দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ইতিহাসের নীরবতা ও অসঙ্গতির একটা বড়ো দিক। এই নীরবতা সাহিত্যেও আছে ; কিন্তু সেখানে, যা আছে তার ভিত্তিতে যা নেই তার পঠন সম্ভব। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও যে পঠন সম্ভব, 'মেয়েদের ইতিহাসে'র এটা একটা প্রাক্‌ ধারণা।

যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' উপন্যাসে বঙ্কিম শেষপর্যন্ত ইন্দিরাকে স্বামীর সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। পুরুষপ্রধান সমাজে স্বামীগৃহই তার চাইবার বস্তু এবং তাই-ই সে পায়। কিন্তু যেখানে সে গৃহচ্যুত এবং অসহায় সেখানে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ, স্বামীর চরিত্র নিয়ে তার সমালোচনা, স্বামীগৃহে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তার স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত অভাববোধ এই সবই ব্যক্ত পাঠ্যবস্তুর পিছনে অন্য এক অব্যক্ত পাঠ্যবস্তুর সন্ধান দেয়।[২] বঙ্কিম পুরুষপ্রাধান্যের মতাদর্শের যে কাঠামো তার মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছেন, উপন্যাসের আপাতিক বিন্যাসে তাই স্বামীগৃহে যাবার পথে বাধা ও তার অপসারণ এটাই স্পষ্ট। কিন্তু এর থেকে আমরা অন্য এক ইন্দিরাকে অনুমান করে নিতে পারি যার অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া মূল্যবোধের একটা বিরোধ আছে। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও এরকম বিন্যাস আছে। যেমন, ঊনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলির উৎস বিচারে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব, পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ, পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের বিরোধ এই সবই আসে। কিন্তু এই আন্দোলনগুলির অনেক ক'টিই তো নারীদের কেন্দ্র করে। অথচ 'সতীদাহ' সম্বন্ধে সম্ভাব্য সতীদের কী মনোভাব ছিল, বা পুনর্বিবাহিত বিধবাদের জীবনটা কীরকম ছিল, তাঁদের চোখে নিজেদের বিবর্তনটা কীভাবে ধরা পড়েছিল ইতিহাসে তা লেখা নেই। যেখানে তা আছে, সেটা মেয়েদের সম্বন্ধে সমাজে প্রচলিত ধারণার পুনরাবৃত্তি। স্ত্রী-স্বাধীনতার ধারণা তাই কঠোর নীতিবাদী একটা আদর্শের গণ্ডিতেই ঊনিশ শতকে আবদ্ধ থাকে।[৩] এর সঙ্গে মেয়েদের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিরোধ কোথায় ছিল তার হদিশ ঐতিহাসিক দলিলের পুনর্পঠনের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায়। সাহিত্যেই হোক আর ইতিহাস রচনাতেই হোক মতাদর্শের বহুস্তর ও বহুমুখী mediation বাস্তবের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করে। দূরত্ব সৃষ্টি হবার প্রক্রিয়াটাকে বোঝার মধ্য দিয়েই পাঠ্যবস্তুর দর্পণে জ্ঞাতব্য বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। ইতিহাস রচনায় নারীর আত্মচেতনার ছবি কেন অনুপস্থিত, তার বিশ্লেষণ করলে এই আত্মচেতনার সম্ভাব্য রূপটি কেমন ছিল তা হয়ত অনুমান করা যায়। বর্তমান শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশক থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বহুসংখ্যক মেয়ে যোগ দেন, আবার চল্লিশের দশকে বাংলার কৃষক আন্দোলনে তাঁদের একটা ব্যাপক ও জরুরী অংশ আছে। আন্দোলনের সামগ্রিক ছবির মধ্যে প্রায়শই যা চাপা পড়ে যায়, কোণে যাকে ঠেলে দেওয়া হয় সেই খণ্ডাংশগুলিরও স্বকীয় বাস্তবতার দাবি আছে, মেয়েদের ইতিহাস রচনার

প্রচেষ্টামাত্রেই যাঁরা বৌদ্ধিক বিচ্ছিন্নতাবাদের আভাস দেখেন একথা তাঁরা ভুলে যান। যে মেয়েরা জাতীয় আন্দোলনে বা কৃষক আন্দোলনে এসেছেন তাঁদের আসার স্থানকালপাত্র-গত বিশেষ কতকগুলি কারণ আছে, এই আন্দোলনগুলিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জনগণের সামিল হাওয়ার সাধারণ কারণগুলি দিয়েই শুধু তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিভিন্ন ধরনের দলিলে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের mediation মেয়েদের অংশগ্রহণের এই ঘটনাকে একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই শুধু দেখায়। তার ভিতরের যুক্তিগুলিকে প্রায়ই প্রাধান্য দেয় না। মেয়েদের ইতিহাসের পদ্ধতিতে এই সামগ্রিকতাকে সমালোচনার আলোকে দেখার প্রসঙ্গ আসবেই। মেয়েদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে জাতীয় চেতনার আদর্শের যে ফারাক তা এই পদ্ধতিতে প্রাধান্য পাবেই। গান্ধী মেয়েদের বাইরে আসার আহ্বান জানিয়েও হিন্দু সতীত্বের মাপকাঠিতেই তাদের মেপেছেন, একথা মেয়েদের ইতিহাসে বিশ্লেষণের বিষয় হবে। তার কেন্দ্রীয় চরিত্র হবে 'কৃষাণসভার কর্মী' সেই মেয়েটি যে মিটিঙে দাঁড়িয়ে কিষাণসভার লোকাল কমিটির সদস্য তার স্বামীর বিষয়ে বলে, 'কমরেড, স্ত্রীকে স্বামী মারে কোন আইনের জোরে? আমার স্বামী আমাকে মারে কেন? আমি আপনাদের কাছে বিচার চাই।'[৪]

কিন্তু মেয়েদের ইতিহাস রচনার পদ্ধতি প্রসঙ্গে এটুকু বলাই বোধহয় যথেষ্ট নয়। এ ইতিহাস সবসময় তলায় চাপা পড়ে গেছে বলেই তা স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভর হবে এ দাবি বাস্তবতার পরিপন্থী। নারীবাদী ইতিহাস রচয়িতারা অনেক সময়ে মেয়েদের 'প্রকৃত' চৈতন্যকে ক্ষমতাসীনের প্রভাবের বাইরেকার একটা আচোট্ সত্তা বলে ধরে নেন। ক্ষমতাসীনের প্রভাব যেখানে খাটে সেটা তাঁদের কাছে নারীসত্তার বাইরেকার একটা খোসামাত্র। যেখানে তার সঙ্গে বৈপরীত্য তীব্র ও আপসহীন, সেখানেই কেবল সে স্বরূপে অধিষ্ঠিত এই রকম মনে করা হয়। মেয়েদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তথাকথিত 'নিম্নবর্গীয়' ইতিহাসচর্চার যুক্তির এই বিস্তার[৫] বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। প্রথমত, এ ক্ষেত্রে 'ক্ষমতাসীন' বলতে শ্রেণী ও লিঙ্গগত বিচারে যারা শাসনকারী তাদের উভয়কেই সমভাবে বোঝায়। 'নিম্নবর্গীয়' ইতিহাসে যেমন ক্ষমতাসীনদের মধ্যে স্তরভেদের কাজটা মুলতুবি থেকে যায়, এখানেও তেমনি রাজনৈতিক কাঠামোর অন্তর্গত শ্রেণীশোষণ ও পরিবারের ভিতর লিঙ্গগত বৈষম্য ও পীড়ন এই দু'য়ের মধ্যে কোন ভেদ করা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, এই ভেদকে বিশ্লেষণ করার কোন উপায় না থাকায় যে শাসিত তাকেও একটি আদর্শায়িত রূপ দিতে হয় ও এক বায়বীয় বিশুদ্ধতার মানদণ্ড স্থাপন করতে হয়। যেমন, উনিশ শতকে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে

সংঘঠিত নারী-জাগরণকে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরুষের অভিভাবকত্বে সংঘটিত একটি প্রক্রিয়া বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। বলা যায় এই আন্দোলনের পুরুষ-নেতারা মেয়েদের ঠিক যেভাবে যেখানে দেখতে চেয়েছিলেন, নারী-জাগরণের চেহারাটা তারই প্রতিবিম্ব। তার কোন স্বকীয়তা নেই। অর্থাৎ স্বকীয়তার একটা দেশকাল নিরপেক্ষ রূপ ধরে নেওয়া হয়।

কিন্তু ব্যাপারটাকে একটু অন্যদিক থেকে দেখা যায়। মেয়েদের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাদের নিজেদের চেতনা আসতে পারে ভাষার মাধ্যমে। এই ভাষা আকাশ থেকে পড়ে না, সমাজে প্রচলিত যে ভাষার পরিধি তার মধ্য থেকেই তার উপাদানগুলি সংগৃহীত হয়। উনিশ শতকে যে মেয়েরা তাঁদের নির্ধারিত ভূমিকার বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন, বিকল্প এক ভূমিকার ধারণাকে আশ্রয় করেই তা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল। পরিবর্তন যা ঘটে তা স্থানকাল-নিয়ন্ত্রিত গণ্ডির মধ্যেই ঘটে। উনিশ শতকে মেয়েদের বাইরে বেরোনোর ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম নীতিবাদী অবস্থান ছিল ঐ দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অবশ্যম্ভাবী হাতিয়ার! তার সীমাবদ্ধতা আজ আমাদের কাছে স্পষ্ট হতে পারে, কিন্তু একদিন তাই-ই মধ্যবিত্ত মেয়েদের সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনের বাইরে বেরোনোর একটা পথ ছ'কে দিয়েছিল। আমরা যদি বলি এই ভূমিকা তাদের স্বকীয় নয়, বাইরে থেকে তাদের পুরুষ-অভিভাবকদের চাপিয়ে দেওয়া জিনিস, তাহলে সাংস্কৃতিক শাসন বিস্তারের জটিল প্রক্রিয়া আমাদের চোখ এড়িয়ে যাবে। বাইরে থেকে চাপিয়ে-দেওয়া উপাদানও যে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সামাজিক চেতনার বিবর্তনের অঙ্গীকৃত হয়ে যায়, তাকে আশ্রয় করেই বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটতে থাকে, এই প্রাক ধারণা ছাড়া মেয়েদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের কাহিনীকে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ইতিহাসের যে কোন স্তরে মেয়েদের আত্মচেতনা দেশকালগত একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে আশ্রয় করেই বিবর্তিত হয়। জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্যে বা সমাজসংস্কারমূলক চেতনার মধ্যে যখন তাদের বিবর্তনের একটা জায়গা দেখা দেয়, তখন তার মধ্য দিয়েই তারা আত্মপ্রকাশের রাস্তা খুঁজে নেয়। অগ্রসর, মুক্তমনা, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম পুরুষ বা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ পুরুষের সঙ্গে তার বৈপরীত্যটা সেই বিশেষ পর্যায়ে গৌণ স্থান নেয়। মুখ্য বিরোধের কেন্দ্র এখানে অন্য জায়গায় সরে যায়। তার নিজের বিবর্তনের তাগিদেই এটা ঘটে, পুরুষ-অভিভাবকের নির্ধারিত পথের তাৎপর্য তার কাছে অন্য-রকম হয়ে দাঁড়ায়। তাই অনুপ্রেরণার উৎসটা নারীচেতনার বাইরে থেকে

আসলেও তার ব্যবহারে আপেক্ষিক স্বকীয়তা দেখা যেতে পারে। নারীর এই বিবর্তনশীল চেতনার চাপও সামগ্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মেয়েদের স্থানকে আরো প্রসারিত হতে সাহায্য করে।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' থেকে শুরু করে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাস পর্যন্ত সাহিত্যে আদর্শ প্রগতিশীল নারীচরিত্রের একটা ধারাবাহিকতা আমরা দেখতে পাই। সুশীলার মুখ দিয়ে লেখক আলোকপ্রাপ্ত, হিতবাদী, সমাজসংস্কারে আগ্রহী মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু যে সীমানার মধ্যে এই নতুন নীতির উচ্চারণ ঘটেছে তা হল গার্হস্থ্য জীবন। সুশীলার শিক্ষাদীক্ষা, তার আধুনিকতা, তার সচেতনতা সবই দেখা দিয়েছে তার গৃহধর্ম পালনের সহায়ক হিসাবে। যে নৈতিকতার সে ধারক ও বাহক, তার আলোকপ্রাপ্ত পুরুষ-অভিভাবকেরও তাতে সায় আছে, এবং সে তার কাজে সহায়তা পেয়েছে সহৃদয় ইংরেজ জেলাশাসকের স্ত্রীর। এই যে সীমানাগুলির মধ্যে তার আধুনিকতা কাজ করে, 'যুগান্তর'-এর আদর্শ নারী-চরিত্রগুলির ক্ষেত্রেও সেগুলিই দেখা যায়। সেদিক থেকে সুশীলার উপাখ্যান থেকে প্রায় চল্লিশ বছর পরে লেখা 'যুগান্তর'-এর দৃষ্টিকোণ তেমন পাল্টায় নি। কিন্তু সুশীলার চরিত্রটি যেখানে প্রথাগত হিন্দুসমাজের মধ্যে থেকেও প্রথম থেকেই তার থেকে আলাদা, শিবনাথ শাস্ত্রীর চরিত্রায়ণ সেখানে তুলনায় জটিল। 'যুগান্তর'-এর বিজয়ার সচেতনতা বিবর্তিত হয়, আর 'সুশীলার উপাখ্যানে' তা স্বতঃসিদ্ধ। সুশীলা যেখানে প্রথম থেকে লেখকেরই কণ্ঠস্বরকে ব্যক্ত করে, বিজয়া সেখানে অনেক দূর পর্যন্ত তার চরিত্রের আভ্যন্তরীণ যুক্তিতেই বিকশিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাকে পিছনে ঠেলে দেওয়া এবং কাহিনীর শেষে সমাজসেবায় লাগিয়ে দেওয়া এটাই প্রকাশ করে যে লেখকের হাতে বিকল্পগুলি কত সীমিত ছিল। কিন্তু বিজয়ার চরিত্রায়ণে অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় তা কি শুধু উপন্যাস-শৈলী কতটা অগ্রসর হয়েছে তারই উদাহরণ, না কি শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর অভিজ্ঞতায় নতুন যুগের মধ্যবিত্ত নারীর যে বিবর্তন প্রত্যক্ষ করছিলেন সেই অভিজ্ঞতার চাপও এখানে কাজ করছে? এই প্রভেদগুলি সম্বন্ধে যদি আমরা সচেতন না থাকি, উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষ-অভিভাবকত্বের একটা সাধারণীকৃত ধারণার মার্কা মেরেই মনে করি মেয়েদের ইতিহাস রচনার কর্তব্য সম্পন্ন হল, তাহলে কাজে ফাঁকি থেকেই যাবে।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন উঠছে। নারী-আন্দোলনের এটা একটা অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ যে মেয়েদের ইতিহাস তারা নিজেরাই লিখবে, এবং লিখবে

নিজেদের মতো করে নিজেদের বিবর্তিত ভাষায়। সে ভাষা প্রথাগত ইতিহাস রচনার শৈলীকে অনুসরণ না-ও করতে পারে, কেননা যে দলিলগুলির উপর ভিত্তি করে প্রথাগত ইতিহাস ঘটনাবলীকে সাজায় সেসব দলিল একদেশদর্শী হতেই পারে। দলিল মানেই যে বিশুদ্ধ তথ্য নয়, কে রচনা করছে তার উপর নির্ভর করে তারও নির্ধারিত দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে, একথা 'নিম্নবর্গীয়' ইতিহাসবিদ্‌রা ইদানীং অনেকবার বলেছেন।[৬] 'নিম্নবর্গের' ইতিহাসের বেলায় যেমন, মেয়েদের ইতিহাসের বেলাতেও তেমনি প্রথাবহির্ভূত দলিলের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। ডায়েরি, চিঠিপত্র, আত্মকথা, সাক্ষাৎকার, স্মৃতি-নির্ভর সাক্ষ্যপ্রমাণ—এইসবই সেখানে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথাগত দলিলপত্রে যারা বোবা, এই ধরনের সরঞ্জামের মধ্যে তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এই কণ্ঠস্বরকে মেয়েদের ইতিহাস রচনার পরিপ্রেক্ষিত থেকে সঠিকভাবে পাঠ করার নিশ্চয়ই একটা প্রক্রিয়া আছে। পাঠক নিজে একজন নারী এইটুকুই নিশ্চয়ই তাঁর পঠনের যাথার্থ্য প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অন্যদিকে তিনি যদি নিজে নারী না হন, তাহলে কি সেই কারণে তাঁর পঠনের গুরুত্ব নাকচ হয়ে যায়? অর্থাৎ এই ইতিহাস রচনার পদ্ধতির বিবর্তনে মেয়েদের নিজেদের উপস্থাপিত নানা দলিলের বিশেষ তাৎপর্য থাকলেও, তা যদি স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে যেই তাকে আয়ত্ত করবে তারই ব্যবহার্য না হয়, তাহলে তাকে জ্ঞানের পদ্ধতি কিভাবে বলা যাবে? জ্ঞানচর্চার মধ্যেও মতাদর্শগত ঝোঁক থেকে যায়, একথা দিয়েই এ প্রবন্ধ শুরু করেছি। কিন্তু তার পদ্ধতির মধ্যেই যদি এই বিশেষ ঝোঁককে অনবরত চিনে নেবার উপায় না থাকে তাহলে বাস্তবের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে আবদ্ধ না হয়ে সেই অন্বেষণ কেবল বাস্তব থেকে দূরেই সরে যাবে। তাছাড়া বিশেষিত শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গির একটা তাত্ত্বিক আদল তৈরি করা সম্ভব, কিন্তু সেইভাবে লিঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির কোন আদল তৈরি করা যায় না, কারণ শ্রেণীর ধারণার মধ্যে যে স্থানকালের বিচার ও ইতিহাসের বোধ নিহিত আছে, 'নারী'—নিছক এই ধারণাটির মধ্যে তেমন কোন বিশেষিত বিশ্লেষণের হাতিয়ার নিহিত নেই। আমি যখন বলি বুর্জোয়া শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি বা সর্বহারার শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি এইরকম, তখন তা ঐতিহাসিক বিচারের জায়গা তৈরী করে। কিন্তু লিঙ্গগত দৃষ্টিভঙ্গির বিবরণ দিতে গেলে তা নিছক অনুমানের স্তরেই থেকে যায়। অনেকে বলেছেন, অভিজ্ঞতার যে স্তর একান্ত ও ব্যক্তিক সেটাই বিশেষভাবে মেয়েদের। এটা কি নেহাৎই একটা চাপিয়ে দেওয়া তত্ত্ব নয়, বা মেয়েদের জ্ঞাতব্য বিষয়কে একটা পূর্বনির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে সব কিছু থেকে আলাদা করে রেখে দিতে

চায় ? অন্যদিকে মেয়েদের ইতিহাসচর্চায় পাঠক্রম যদি শুধু মেয়েদের লেখা ও কথায় সীমিত থাকে, তাহলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিলকে আমাদের বাদ দিতে হবে যেহেতু সেগুলি পুরুষের লেখা।

পুরুষ ছিলেন বলে অমুক লেখক নারীর উপস্থাপনায় যথেষ্ট নিরপেক্ষ হতে পারেন নি এই তত্ত্ব আজকাল কোন কোন লেখিকার বক্তব্যে, বিশেষত সাহিত্য সমালোচনায় পাওয়া যাচ্ছে যেমন, রবীন্দ্রনাথ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে এমন সমালোচনা উঠেছে। তাঁদের বিভিন্ন লেখায় এরকম ত্রুটি থাকা খুবই সম্ভব। একজন লেখকের সব লেখাই সমানভাবে সফল হয় না। কিন্তু আসলে প্রশ্নটা হল এই, যে পুরুষ বলেই এই অসম্পূর্ণতা এসেছে এই সিদ্ধান্তটিও মেনে নেওয়া যায় না। আর এই তাত্ত্বিক অবস্থান নিলে রবীন্দ্রনাথ থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত লেখকদের যেসব কাজ পুরুষশাসিত সমাজের নীতিকে অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে আক্রমণ করছে, সেগুলিকেও বাদ দিয়ে দিতে হয়। বস্তুত সাহিত্য রচনার বা সাহিত্য সমালোচনার রীতিতে এক ধরনের নিরপেক্ষতা রক্ষা করতেই হয়। নিজের মতাদর্শগত ঝোঁককে চেনা ও তার সম্বন্ধে অবহিত থাকা—পদ্ধতির নিরপেক্ষতা বলতে আমি এইটুকুই বোঝাতে চেয়েছি। একটি কোন চরিত্রের উক্তি লেখকের বক্তব্য বলে তুলে ধরা, লেখাটি যে সময়ের তার স্থানকালগত সীমানাগুলির কথা ভুলে যাওয়া—এইসব অতি সাধারণ পদ্ধতিগত ভুল তখনই ঘটে যখন আমরা রচয়িতা পুরুষ বলে পাঠ্যবস্তুকে আগেভাগেই অযথার্থ বলে মনে করে বসে থাকি। অর্থাৎ পদ্ধতি যে নিরপেক্ষ হতে পারে, একথা যখন আমরা অস্বীকার করি।

ইতিহাস রচনার বিন্যাস বা সাহিত্যের বিন্যাসের একটা নিজস্বতা থাকে, তা বাস্তবের হুবহু অনুকৃতি নয়। কিন্তু তা বাস্তবের বিভিন্ন দিকগুলির জটিল সম্পর্ককে কোনভাবে আভাসিত করে, এবং সেই আভাসন কীভাবে ঘটছে তার একটা ইঙ্গিতও ঐ বিন্যাসের মধ্যেই আছে—এই প্রাক্-ধারণা ছাড়া কোন বিন্যাস সিদ্ধ হতে পারে না। এই মাপকাঠিতেই ইতিহাস বা সাহিত্যরচনার পদ্ধতি নিরপেক্ষতা বাচাই হয়। তাই মতাদর্শগত দায়বদ্ধতা এবং নিরপেক্ষতা সবসময় পরস্পরবিরোধী নয়। দায়বদ্ধতার যুক্তি বাস্তবের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটাই এখানে মানদণ্ড। মেয়েদের ইতিহাস রচনা করতে যাঁরা দায়বদ্ধ তাঁদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। এই ইতিহাস একটা নির্দিষ্ট স্থানকালের ; সামাজিক সম্পর্কগুলি সামগ্রিক টানাপোড়েনের একটা বিশেষ চেহারা তার থেকে বার করা যেতে পারে। এই জটিল ও সূক্ষ্ম বুনুনির মধ্যে একজন নারীর জীবনের চেহারা কেমন ছিল তা যদি

আমরা ধরতে চাই, তাহলে সেই জীবনের উপর দিয়ে অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, পারিবারিক, সামাজিক সূতোগুলি পরস্পরকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে কীভাবে একটা নক্‌শা রচনা করেছে তা না জানলে হবে না। তার বাস্তব জীবনের এই সমগ্রতা, জীবনের একটা দিকের সঙ্গে অন্য একটা দিকের নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগই প্রত্যেকটি অংশের বিশেষ চেহারা কীরকম হবে তা নির্ধারণ করে। নারীর নারীত্বের উচ্চারণও এই শরীরী (concrete) সমগ্রতার মধ্যে থেকেই তার নির্দিষ্ট রূপ পায়। ১৯৪৬-৪৭-এর বাংলায় তেভাগা আন্দোলনে যে মেয়েরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আমরা একই সঙ্গে দু'রকম জিনিস দেখতে পাই ঃ (১) কৃষকদের দাবিগুলির সঙ্গে তাদের একাত্মতা ও (২) তীব্র লড়াইয়ে যুক্ত থাকার ফলে মেয়ে হিসাবে তাদের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তাদের সচেতনতা। মেয়েদের ইতিহাস লিখছি বলেই কি আমাকে বলতে হবে (১) নম্বর ব্যাপারটি তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া এবং (২) নম্বর ব্যাপারটিতেই তাদের আদি ও অকৃত্রিম নারীসত্তার প্রকাশ ?[১] কৃষক নারীর সঙ্গে পুরুষের (সে কৃষকই হোক, জোতদারই হোক) বিরোধকে এক্ষেত্রে মূল বিরোধ বলে ধরে নেওয়া মানে এই লড়াইতে তার বিশেষ ধরনের অংশগ্রহণের ব্যাপারটিকে দেখতে না পাওয়া। এক্ষেত্রে তার শ্রেণীচরিত্র দিয়েই তার নারীত্ব বিশেষিত হচ্ছে, এই প্রাক্‌-ধারণাটি না রাখলে ঐ শ্রেণীগত কাঠামোর মধ্যে আবার তার নারীত্ব যে অভিজ্ঞতার একটা নির্দিষ্ট স্তর সৃষ্টি করছে, এটা বোঝা যাবে না। সাহিত্যের বিন্যাসেও নারীর চরিত্র যে আদল নেয়, তা তাকে ঘিরে সামাজিক সম্পর্কগুলির নক্‌শা দিয়েই নির্ধারিত হয়। ইতিহাসের মতোই সাহিত্যের পঠনেও তাই পারম্পর্যের প্রশ্নটা জরুরী হয়ে ওঠে। নারীত্বকে দেশকালের অতীত বিশুদ্ধতায় রেখে দিলে মেয়েদের ইতিহাসের মালমশলাগুলিও চোখের আড়ালেই থেকে যায়।

সূত্রনির্দেশ

১ গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক, ইন আদার ওয়ার্ল্ড্‌স্‌ ঃ এসেস ইন কালচারাল পলিটিকস্‌, নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৭, পৃ ২১৫-২১। লেখিকা এখানে মিশেল ফুকো-বিবৃত 'narrativizations of history are structured and textured like what is called literature' এই তত্ত্বটিতে সায় দিচ্ছেন।

২ এই বিষয়টি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় তাঁর "রিয়ালিটি অ্যাণ্ড রিয়েলইজম্ : ইণ্ডিয়ান উয়োম্যান অ্যাজ প্রোটাগনিস্টস্ ইন ফোর নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি নভেলস্", দ্রঃ সুধীর চন্দ্র (সম্পা.), সোশাল ট্রানস্ফরমেশন অ্যাণ্ড ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন, নতুন দিল্লী, ১৯৮৪।

৩ সুমিত সরকার, "দ্য উইমেনস্ কোয়েশ্চন ইন নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি বেঙ্গল", দ্রঃ এ ক্রিটিকি অফ কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ ৭৫।

৪ রেণু চক্রবর্তী, কমিউনিস্টস্ ইন ইণ্ডিয়ান উইমেনস্ মুভমেণ্টস্, নতুন দিল্লী, ১৯৮০, পৃ ৮৯।

৫ 'This was an autonomous domain, for it neither originated from elite politics nor did its existence depend on the latter'. 'নিম্নবর্গীয়' চেতনার জগৎ সম্বন্ধে এ-কথা বলেছেন রণজিৎ গুহ। উৎস : সাবঅলটার্ন স্টাডিজ ১ : রাইটিংস অন সাউথ এশিয়ান হিষ্ট্রি অ্যাণ্ড সোসাইটি (সম্পা. রণজিৎ গুহ). দিল্লী, ১৯৮২, পৃ ৪।

৬ রণজিৎ গুহ, "দ্য প্রোজ অফ কাউন্টার ইনসারজেনসি", দ্রঃ তৎ সম্পাদিত, সাবঅলটার্ন স্টাডিজ ২, দিল্লী, ১৯৮৩.

৭ এই মতের একজন প্রবক্তা পিটার কাস্টারস। দ্রঃ তার উইমেন ইন দ্য তেভাগা আপরাইজিং : রুরাল পুওর উইমেন অ্যাণ্ড রেভোলিউশনারী লিডারশিপ, ১৯৪৬-৪৭, কলকাতা, ১৯৮৭।

নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য : দু' চারটি কথা

যশোধরা বাগচী

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে এই আলোচনাটির সূত্রপাত করতে চাই। মেয়েদের অবদান বিষয়ে সারা পৃথিবীর ইতিহাসেই এক আশ্চর্য মৌনতা লক্ষ্য করা যায় এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-মুখর হয়ে উঠতে শুরু করেছে গত কুড়ি বছর ধরে। তার মানে এই নয় যে, আধুনিক ইতিহাসে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এই প্রথম। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে অত্যন্ত সচেতনভাবে এই প্রতিবাদী চেতনা ইতিহাসের মূল ধারাটিকে নানা দিক থেকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। ইতিহাস সংসদ আয়োজিত এই আলোচনাচক্রটি এই বৃহত্তর আন্দোলনের অংশ মনে করা যেতে পারে। আমার আগের বক্তারা এই নারীবাদী চেতনার আলোতে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও সাম্প্রতিককালের জাতীয় আন্দোলনের অনেক উপেক্ষিত দিক তুলে ধরেছেন।

এই আলোচনাচক্রের উদ্যোক্তাদের আরও একটি বিষয়ে আমার অভিনন্দন জানাই—সাহিত্যকে এই ইতিহাসের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। নারীবাদী আলোচনায় সাহিত্য সত্যিই ইতিহাসের পরিপূরক। ইতিহাসের যে গতানুগতিক পরিচয়ে আমরা অভ্যস্ত সেখানে সাধারণত বহির্বিশ্বের, বিশেষ করে শাসককেন্দ্রিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা হয়ে থাকে। এই ক্ষমতার লড়াইয়ে যেহেতু মেয়েদের প্রত্যক্ষ দান খুবই কম, সেহেতু ইতিহাসে তারা প্রায়শই অনুপস্থিত। কিন্তু পৃথিবীর এই অর্ধ-শতাংশ তাহলে গেল কোথায়? অনেক সময়েই তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে সাহিত্যে। বিশেষ করে, আধুনিক জগতের কথাসাহিত্য এক ধরনের বাস্তবানুগতার প্রতি দায়বদ্ধ। আমাদের সমাজজীবনের দৈনন্দিন ঘটনার ঠাসবুনুনি এবং নরনারীর প্রেম ও বিবাহ/ বিচ্ছেদ এর অন্যতম উপাদান। অতএব সঙ্গতভাবেই আধুনিক সাহিত্যে নারীচিত্রণ ঐতিহাসিকের পক্ষে একটি উর্বর ক্ষেত্র। সম্প্রতি তরুণ ঐতিহাসিক তনিকা সরকারের লেখাতে আমরা দেখছি যে সাহিত্যের জবানীতে

ইতিহাসের ঝোঁক কীভাবে বেরিয়ে আসে।[১] জাতীয়তাবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের নারীচিত্রণ আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।[২] (তবে ঐ ব্যাপারটা সম্ভব হয় তার কারণ মালিনী ভট্টাচার্য তাঁর নারীচিত্রণের সম্পর্ক মনোজ্ঞ আলোচনাটিতে খুব ভালো করে দেখিয়েছেন) উপন্যাসে শৈল্পিক উপকরণ এবং বিষয়গত তথ্য—উভয়েই পরিবেশিত হয় মতাদর্শের মাধ্যমে। এই মাধ্যমটিকে ভুলে গিয়ে সাহিত্যের বাস্তবতা বিচার করতে গিয়ে নারীবাদী আলোচনা কিন্তু যান্ত্রিক বাস্তববাদের গাড্ডায় গিয়ে পড়তে পারে। সাহিত্যে বা অন্যান্য গণমাধ্যমে নারীচিত্রণের সমস্যাটি তাই মতাদর্শগত ক্ষমতার লড়াইয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেই কারণেই অবশ্য নারীবাদী আলোচনা সাহিত্যে নারীচিত্রণের উপরে বিশেষভাবে জোর দিয়েছে।[৩]

নারীমুক্তিবাদী আলোচনায় বাস্তববাদের প্রসঙ্গটির ভূমিকা মালিনী এর আগের বক্তৃতায় খুব পরিস্কারভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। আমি অন্য কয়েকটি দিক থেকে আধুনিক সাহিত্যের নারীবাদী আলোচতায় সূত্রপাত করতে চাই। বলা বাহুল্য এই স্বল্প পরিসরে কয়েকটি সুত্র ধরিয়ে দেওয়ার বেশী আর কিছু করা সম্ভব নয়।

আধুনিক যুগের সাহিত্যে নারীপ্রসঙ্গটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য এতই গভীর যে সম্ভবত তার পূর্ণ রূপটি এখনও আমাদের কাছে ফুটে ওঠে নি। আমাদের ইতিহাসের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্যায়ে আধুনিকতার যে কটি আধার নিয়ে সরকারের আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে, 'সাহিত্য'কে সাধারণত তার মধ্যে ধরা হয় না। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই নজরে পড়বে যে আধুনিকতার যে প্রগতিবাচক সংকেতগুলি উনিশ শতকে অর্থবহ হয়ে উঠেছিল, সাহিত্যে, বিশেষ করে নয়া রীতির কথাসাহিত্যে সেগুলি বিশেষভাবে বিদ্যমান। যে সমাজব্যবস্থাকে হটিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ তত্ত্বাবধানে 'আধুনিক' সমাজ প্রবর্ত্তনের কাজ শুরু হয় তার অর্বাচীনতার একটি প্রধান নির্দেশনা ছিল যুক্তিকেন্দ্রিক মানবিক সাহিত্যের অভাব। একদিকে মঙ্গলকাব্যের ধর্মীয় অনুশাসন, অন্যদিকে ভারত-চন্দ্রের রতিলীলা, এই দুইয়ের মধ্যে সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নি বলে 'আধুনিকতা'র পর্বে মানবকেন্দ্রিক যুক্তিবাদী সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে ওঠা অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছিল। গার্হস্থ্য মতাদর্শের অভিভাবকত্বে নরনারীর প্রেমকে কেন্দ্র করে যে উপন্যাস রচনাশৈলী তৈরি হল, আধুনিকতার যাথার্থ্যবোধে সে গৌরবান্বিত। এর নান্দনিক সম্ভাবনা সম্পূর্ণ প্রকাশ পেল বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে। পুরোনো জমানার অলৌকিকত্বকেও এই পরিশীলিত উপন্যাসশৈলী নিজের আয়ত্তাধীন করে ফেলেছিল।

আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস সাধারণত এই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মার্জিত-রুচি সাহিত্যের পরম্পরার সূত্র ধরে আধুনিক মানসিকতার প্রগতির জয়গানে মুখর হয়ে ওঠে। পশ্চিমী রেনেসাঁসের মডেলটি তাই প্রায়শই উনিশ শতকের ইতিহাসে বেসুরোভাবে লাগানো হয়ে থাকে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের এই সংজ্ঞাটির মধ্যে কিন্তু জটিলতার অবকাশ থেকে যায়। কারণ সমাজের দুটি বিরাট অংশ এর থেকে বাদ পড়ে যায়। উচ্চশিক্ষিত সমাজের বহির্ভূত যে বিশাল লোকজীবন—তার সাংস্কৃতিক রূপগুলি—অন্যদিকে মধ্যবিত্ত সমাজেরই লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা নারীসম্প্রদায়। আমার বক্তব্যের তাগিদে আমি দ্বিতীয়টি নিয়েই কথা বলব যদিও প্রথমটির গুরুত্ব দ্বিতীয়টির থেকে কম নয়। সমাজের মূল ধারা এবং তার মতাদর্শের বহির্ভূত হওয়াতে দুটির মধ্যে কোথাও কোথাও সাযুজ্যও রয়েছে।

উপন্যাস-সাহিত্য সম্পর্কে যে দিকটা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এবং সমালোচনা-সাহিত্যে অসহনীয়ভাবে উপেক্ষিত তা হল এই আধুনিকতম সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে মেয়েদের অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ—প্রথমে পাঠিকা হিসাবে, পরে স্রষ্টা হিসাবে। নতুন শিক্ষার ঢেউ অন্দরমহলে পৌঁছেছিল কিন্তু ইংরেজি শিক্ষাযজ্ঞ চলত যেসব স্কুল-কলেজে, সেখানে মেয়েদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। অথচ ছাপাখানা শুরু হবার পরেই বটতলায় যে সাহিত্য জনপ্রিয়তা লাভ করে তার বিরাট এক অংশ যে অন্দরমহলের চিত্তবিনোদনের কাজে লাগত সেটি সহজেই অনুমেয়। সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিক সৌমেন মুখার্জির গবেষণাতে তার আভাষ পাই।[৪] আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে কিছু তথ্যাভিত্তিক এবং কিছু তাত্ত্বিক কাজ আরও এগুলে হয়ত মেয়েদের অবদান সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও স্বচ্ছ হতে পারে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে দুটি কাজ শিক্ষিতা মধ্যবিত্ত ভদ্রমহিলাদের কর্ম ও মনোজগতের উপরে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে সেখানেও সাহিত্যপঠন ও সৃষ্টির উপরে কোনও আলোকপাত নেই।[৫]

একটি বিশেষ সমস্যার কথা এই প্রসঙ্গে না এনে উপায় নেই, তা হল উনিশ শতকে সাহিত্যের একটি বিশেষ ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয় যাকে ইংরেজ সমালোচক De Quencey 'Literature of Power' আখ্যা দিয়েছেন। ধর্মের অনুশাসনকে হটিয়ে দিয়ে নতুন বুর্জোয়াশ্রেণী যে আধ্যাত্মিক শক্তি-সাধনায় নেমেছিল সাহিত্যকে তার মধ্যে এক বিশেষ জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। উনিশ শতকে বাংলায় যে পরিমার্জিত সাহিত্য সৃষ্টি হল খুব তাড়াতাড়ি তার একটি নতুন ঐতিহ্যমণ্ডিত পরম্পরা (canon building)

আমরা পেতে শুরু করি। এই পিছনেও কাজ করছে (মালিনী ভট্টাচার্যের বক্তৃতায় উল্লিখিত) মতাদর্শের খেলা। পরুষকেন্দ্রিক সমাজের ঝোঁকে এই পরম্পরার থেকে প্রথমেই বাদ পড়ে যায় মহিলা সাহিত্যশিল্পীরা।

আজকের দিনে আধুনিক সাহিত্যে, বিশেষ করে আধুনিক যুগের শুরুতে বাংলা কথাসাহিত্যে, নারীবাদী আলোচনাতে মেয়েদের লেখার মূল্যায়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতদিন কয়েকটি বাছাই করা মহিলা সাহিত্যিকের জন্য বিশেষ সংরক্ষিত আসন তৈরি করে একরকম নমো নমো করে কাজটি সারা হত। 'অমুক তো' মহিলা-সাহিত্যিক নন, তিনি সাহিত্যিক—এরকম কথা বলতে প্রগতিশীল সাহিত্যপ্রেমীও ঠেকে যাবেন না। কারণ আমাদের প্রচলিত মতাদর্শের রায় হচ্ছে যে 'মহিলা-সাহিত্যিক' হচ্ছেন দু নম্বরি পঙক্তিভুক্ত—যখন তিনি স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন তখন স্ত্রীলিঙ্গের প্রশ্নটি অবান্তর। নিজেদের এই ধরনের কথা শুধু পুরুষরাই নন একাধিক মহিলা চিত্রশিল্পীর কাছ থেকে শোনার অভিজ্ঞতা আমার আছে। শিল্পীকে ভুলে যেতে হবে যে তিনি নারী, কেননা তার নারীত্ব এখানে শুধু অবান্তর নয় শাস্ত্রবহির্ভূত (apocryphal)।

সাম্প্রতিককালে কিছু উৎসাহী সাহিত্যকর্মীর দৃষ্টি নারীমুক্তির আলোতে খানিকটা স্বচ্ছতালাভ করেছে। এক লুপ্ত অধ্যায়ের পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে মহিলাদের লেখা দিয়ে। এই কাজ আমাদের আজকের আলোচনায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ এই কাজে ইতিহাস এবং সাহিত্য সমালোচনা হাত মিলিয়েছে। ভবিষ্যতে এই জুটি আরও বিশেষ ফলপ্রসূ হবে বলে আশা রাখি।

নারীমুক্তিবাদী ইতিহাস প্রত্যেক সমাজকেই নতুন করে তৈরি করতে হয়েছে। যে উপাদানগুলি ইতিহাসে লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল সেগুলিকে টেনে বার করে তাদের পুনর্মূল্যায়ন করা নারীবাদী ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার যৌথ উদ্যোগ। পশ্চিমের বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার একটি বড় উপাদান ছিল বহির্জগত (public sphere) এবং অন্দরমহলের (private sphere)-এর পৃথকীকরণ। পুরুষ এবং নারীর শ্রমবিভাজন হল তাই নয়, শ্রমের সংজ্ঞাও ক্রমশ পুরুষকেন্দ্রিক হয়ে পড়ল। সামাজিক ইতিহাসের যে বিকৃতি এতে ঘটেছে নারীমুক্তি আন্দোলন তার শোধনের কাজ অনেকাংশে করতে পেরেছে। একটা উদাহরণ দিই। ১৭৯১ সালে Tom Paine-এর "Rights of Man" ছাপা হল এবং বুর্জোয়া মানবের অগ্রগতির এই জয়ধ্বনি এমনই সাড়া জাগালো যে শোনা যায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীশাসিত এক সুদূর বন্দর শহর কলকাতাতে নাকি জাহাজ থেকে নামানো মাত্র বইটি ১০,০০০ কপি বিক্রী

হয়ে গিয়েছিল। যদি কিংবদন্তীও হয় তাহলেও লক্ষ্যণীয় যে মোট Tom Paine-এর বইয়ের বিষয়েই ছড়ানো হয়েছিল। তার পরের বছরে বের হল আর একটি যুগান্তকারী বই Mary Wallsfoncerept-এর Vindication of the Rights of Women. উপনিবেশ তো দূরে থাক তার নিজের সমাজেই বইটি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল প্রায় দেড়শ বছরের উপর। নারীমুক্তি আন্দেলনের ধাক্কায় বইটি আবার পৌঁছাল পাঠক-পাঠিকার কাছে বুর্জোয়া সমাজে নারীমুক্তির দিশারী রূপে।

বাইরে থেকে আনা এক বিদেশী সংস্কৃতি গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে আধুনিক ভারতবর্ষে যে শ্রেণীবিন্যাসের সৃষ্টি হল নারীর সামাজিক মূল্যায়ন তার একটি অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। প্রগতির পক্ষে এবং বিপক্ষে, আধুনিক এবং সাবেকি—দু' ধরনের চিন্তাধারাতেই নারীর অবস্থান খুব জরুরী হয়ে পড়ে। এই জন্যই আমি মনে করি যে, নারীমুক্তিবাদী আলোচনা আমাদের সাহিত্যে এবং ইতিহাসে পশ্চিমের চাইতে অনেক বেশি তাৎপর্যবহ। যে কটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলনের মারফত আধুনিক ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর উপযুক্ত মতাদর্শ প্রস্তুত হচ্ছিল সব কটির মধ্যেই মেয়েদের একটা বিশিষ্ট জায়গা করে দেওয়া হয়েছে—যেমন সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবাবিবাহ, Age of Consent সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি। অনেক সময়েই এগুলি আনা হয়েছে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের উপযুক্ত পুরুষদের আত্মমূল্যায়নের তাগিদেই। কিন্তু এর মধ্য দিয়েই প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে তৈরি হয়েছে মেয়েদের নিজস্ব ইতিহাস, কখনও মূল ধারার সঙ্গে সংঘর্ষে কখনও বা সমঝোতায়। সাহিত্যে নারীবাদী ধারাটিকে টেনে বার করে আবার নতুন করে তাকে বুঝতে হলে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই ধারাটির পাশাপাশি তাকে দেখতে হবে।

এই প্রচেষ্টা একটি প্রতিবাদী ও সংগ্রামী প্রয়াস বলে আমি বিশ্বাস করি এবং এই সংগ্রামের পথে আমরা আর কেউ একা নই। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই চেষ্টা শুরু হয়েছে, ধারাটি এখন ক্ষীণ দেখালেও ক্রমশ এটি একটি মহানদীতে পরিণত হবে। সাম্প্রতিক একটি সর্বভারতীয় যৌথ উদ্যোগ এই নতুন সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে। হায়দ্রাবাদের একটি নারীমুক্তিবাদী গবেষক সংস্থা অন্বেষী ডাঃ Susie Tharu-র পরিচালনায় ১৮৫০ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে মেয়েদের লেখার একটি সর্বভারতীয় সংকলন ইংরাজি অনুবাদে তৈরি করেছেন—এই বিশাল যৌথ উদ্যোগটির সঙ্গে যুক্ত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যতদূর জানি ভারতবর্ষের কোনও ভাষাতে অথবা অনুবাদে এ রকম ব্যাপক কোনও সংকলনের মাধ্যমেই, যাকে আমরা 'লেখা' বলি (অর্থাৎ প্রধানত

পুরুষদের লেখা) এখনও কোথাও বেরোয় নি। সংকলনটি বের হলে ইতিহাসে অপসৃয়মান এই দিকটির একটা সর্বভারতীয় চেহারা আমরা দেখতে পাব। এই প্রচেষ্টা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। স্বর্ণকুমারী, রামসুন্দরী দেবী থেকে নবনীতা, মালিনী পর্যন্ত এই সংকলন বাংলার ঐতিহাসিকদের কাছেও বিশেষ মূল্যবান হবে।[৬]

কলকাতায় আমরা মেয়েদের আদি ও অকৃত্রিম কণ্ঠস্বরে প্রথম অভ্যস্ত হই বন্ধুবর শ্রীনির্মাল্য আচার্যের সম্পাদনায় 'এখন' পত্রিকায় মুদ্রিত ঊনিশ শতকের অন্তঃপুরকারিণীদের আত্মজীবনীতে।[৭] পণ্ডিতা রমাবাঈ বা রোকেয়া বেগমের মতো লড়াকু মেয়েরা, যাঁরা ঊনিশ শতকের সমাজ সংস্কারদের হাত থেকে সর্বাজনী কেড়ে নিয়ে ব্রাহ্মণ্য ও পর্দাপ্রথার জঞ্জাল সাফ করতে নিজেরাই নেমে পড়েছিলেন তাঁদের কথা আমরা নিশ্চয়ই আবাব নতুন করে স্মরণ করব। কিন্তু পুরুষের প্রয়োজনে তৈরি অন্দরমহলের মধ্যে মেয়েরা যে তাঁদের ব্যক্তিত্ব, কাজ, অভিজ্ঞতা, প্রেম লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার সাহিত্যিক মূল্য বিচারের উপযোগী নন্দনতত্ত্ব কই? বিনোদিনী দাসীর শিল্পীসত্তা রামসুন্দরী দেবীর অক্ষর পরিচয়ের গল্প আমাদের সাহিত্যকে আবার নতুন করে চিনিয়ে দেবে। এই অভিনব সাহিতা প্রচেষ্টার জন্ম হয়েছিল হিন্দু যৌথ পরিবারের সার্বেকি কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে।

হিন্দু যৌথ পরিবারের অন্দরমহল বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ উপাদান হয়ে ওঠে। নব্য এবং প্রাচীনপন্থী দু'দলের কাছে যৌথ হিন্দু পরিবার ছিল মতাদর্শের রণক্ষেত্র। সাহিত্যের নারীবাদী আলোচনায় এই যৌথ হিন্দু পরিবারের প্রতীকীকরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমে আমি বাংলা সাহিত্যের মূল ধারা থেকে দুটি উদাহরণ দেব। প্রথমটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' থেকে নেওয়া। সমাজসংস্কারবিরোধী বলে এই উপন্যাসটির খ্যাতি আছে। হিন্দু যৌথ পরিবারের অন্দরমহলের প্রতীকী ব্যবহারে এই উপন্যাসে বঙ্কিম বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নগেন্দ্রের বাড়ির অন্দরমহল আমরা প্রথম দেখি কুন্দনন্দিনীর চোখ দিয়ে। প্রথম নব্যরীতিতে তৈরি পরিপাটি অন্দরমহল নগেন্দ্র এবং সূর্যমুখীর। কিন্তু 'সাবেক অন্দরমহল' এইরকম ঃ

> তাহা পুরাতন, কুনির্মিত, ঘরসকল অনুচ্চ, ক্ষুদ্র এবং অপরিষ্কৃত। এই পুরী বহুসংখ্যক আত্মীয়কুটুম্ব-কন্যা, মামী, মামীত ভগিনী, পিসী, পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীত ভাইয়ের মেয়ে, ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে

> কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায়, রাত্রি দিবা কলকল করিত। এবং অনুক্ষণ নানা প্রকার চীৎকার, হাস্য পরিহাস, কলহ কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন, "জল আন, কাপড় দে" "ভাত রাঁধিলে না" "ছেলে খায় নাই" "দুধ কই" ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত।[৮]

যে বঙ্কিম এর আগে তারাচরণের মতো একটি নিকৃষ্ট চরিত্রের মুখ দিয়ে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীমুক্তির বুলি দিয়ে এই বিষয়গুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন সেই বঙ্কিমই কিন্তু এই বর্ণনার মাধ্যমে দেখাচ্ছেন যে, পরিশুদ্ধ হিন্দুসমাজের সংহতির প্রতীক এই অন্দরমহল এখানে আদর্শচ্যুত। এই কলুষিত অন্দর-মহলের বর্ণনা নগেন্দ্রের গৃহে কুন্দর প্রবেশের মুহূর্তটি অশুভের সংকেত ঘোষণা করে। অন্যদিকে 'ঘরে বাইরে'তে রবীন্দ্রনাথ বিমলার মুখ দিয়েই অন্দরমহলের সমারোহ উপস্থাপিত করেছেন ঃ

> আমাদের অন্তঃপুরে যে-সমস্ত সাবেক দস্তুর চলিত ছিল আমার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ ঠেলতে পারতেন না। দিনে-দুপুরে যখন-তখন অবাধে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হতে পারত না। আমি জানতুম ঠিক কখন তিনি আসবেন, তাই যেমন-তেমন এলোমেলো হয়ে আমাদের মিলন ঘটতে পারত না। আমাদের মিল যেন কবিতার মিল, সে আসত ছন্দের ভিতর দিয়ে, যতির ভিতর দিয়ে। দিনের কাজ সেরে গা ধুয়ে, যত্ন করে চুল বেঁধে, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে, কোঁচানো সাড়িটি পরে, ছড়িয়ে-পড়া দেহমনকে সমস্ত সংসার থেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে এনে একজনের কাছে একটি বিশেষ সময়ের সোনার থালায় নিবেদন করে দিতুম। সেই সময়টুকু অল্প, কিন্তু অল্পের মধ্যে সে অসীম।[৯]

এই ঘর থেকে বাইরে বেরোনোর ব্যাপারে মায়াগণ্ডী টেনেছিলেন বিমলার দিদিশাশুড়ি। তিনি বেশ্যাবাড়িতে পড়ে থাকার চাইতে বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ভালো বলে অনেক হাল-ফ্যাসনের উপদ্রব সহ্য করেছিলেন। বিমলা কেবল তাঁর কথা ভেবেই ঘর থেকে বাইরে বেরোতে যায় নি।

> আমার দিদিশাশুড়ি তখন বেঁচে ছিলেন। তাঁর অমতে আমার স্বামী বিংশ শতাব্দীর প্রায় বিশ আনা দিয়েই ঘর ভর্তি করেছিলেন, তিনিও সয়েছিলেন ; রাজবাড়ির বউ যদি পর্দা ঘুচিয়ে বাইরে বেরোত তা হলেও তিনি সইতেন, তিনি নিশ্চয়ই

জানতেন এটাও একদিন ঘটবে, কিন্তু আমি ভাবতুম এটা এতই কি জরুরি যে তাঁকে কষ্ট দিতে যাব। বইয়ে পড়েছি আমরা খাঁচার পাখি, কিন্তু অন্যের কথা জানি নে, এই খাঁচার মধ্যে আমার যা ধরেছে যে বিশ্বেও তা ধরে না। অন্ততঃ তখন ত' সে রকমই ভাবতুম।[১০]

সাহিত্যের মূল ধারায় যৌথ পরিবারের অন্দরমহলের যে ছবি আমরা পাই মেয়েদের লেখাতে তার ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। উনিশ শতকের আত্মজীবনীর আলোচনাতে তো মেয়েরা বেশির ভাগই এই বড়ো পরিবারের থেকেই আত্মসমীক্ষার কাজ চালিয়েছেন।[১০] এছাড়া আমি বিশেষভাবে দুটি প্রখ্যাত নারীমুক্তিবাদী উপন্যাসে হিন্দু যৌথ পরিবারের ব্যবহারের কথা স্মরণ করব। প্রথমটি গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ি' এবং অন্যটি আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'। গিরিবালা দেবীর বিনু এবং আশাপূর্ণা দেবীর সত্যবতী—এরা দুজনেই বড় হয়েছে যৌথ পরিবারের সমারোহের মধ্যে, কিন্তু এর পিছনের সামাজিক শৃঙ্খলা এদের জীবনে শৃঙ্খলরূপে দেখা দিয়েছে। হিন্দু পরিবারের পরিশুদ্ধ আদর্শ দিয়েই এরা এর স্থাবরতার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করেছে—তার মধ্যেই ঘটেছে এদের আত্মবিকাশ। যৌথ পরিবারের স্নেহের নিগড় বিনুর পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে চায় স্বাধীনতা, বাপের বাড়ির অর্গলহীন জীবন, স্বামীর সঙ্গে লেখাপড়ার মারফৎ বাইরের জগতে স্বচ্ছন্দ বিচরণ। শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ারে অন্দরমহলের অর্গল খুলে যায়। সত্যবতীর বাবা হিন্দু যৌথ পরিবারের আদর্শায়িত কর্তা। কিন্তু এর মধ্যেও নারীত্বের অবমাননা সত্যবতীকে পীড়া দেয়। শেষ পর্যন্ত এই পরিবারের মধ্যে মেয়েদের দাসত্বের কদর্য চেহারাটি চোখে পড়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে। সুতরাং উনিশ শতকের পুনরুজ্জীবিত হিন্দু যৌথ পরিবারের আদর্শ সত্যবতীকে যতই উদ্বুদ্ধ করুক না কেন তার নারীসত্তার আত্মমর্যাদাবোধ বজায় রাখবার জন্য এর সঙ্গে তীব্র ও আপসহীন সংগ্রাম চালাতে হয়।

মেয়েদের লেখনীতে মেয়েদের সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষিত হতে হয়ত অনেক দেরি হয়েছে। মৃণালের বিদ্রোহী 'স্ত্রীর পত্র' রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে গর্জে উঠেছে বহু আগে। কিন্তু নারীমুক্তির চিহ্ন মেয়েদের লেখাতে ফুটে উঠেছে পরোক্ষভাবে, অন্দরমহলের সার্বিক শৃঙ্খলের মধ্যে। বহু অপরিচিত লেখনীতে এর প্রকাশ রয়েছে কিন্তু তার কোনও ইতিহাস আজ পর্যন্ত লেখা হয় নি। কিন্তু একে বাদ দিলে সাহিত্য ও ইতিহাসের মূল ধারাটিও সংকুচিত হয়ে পড়ে। আমাদের সমাজের আধুনিক পর্যায়ের ইতিহাস রচনার

কাজে মেয়েদের লেখা এবং মেয়েদের সম্পর্কে লেখা, এই দুইয়েরই বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া দরকার।

সমাজ-সংস্কার বা হিন্দু জাতীয়তাবাদী যে ইতিহাস সচরাচর লেখা হয়ে থাকে তাতে নারীচিন্তা খুব প্রবল হলেও পুরুষের ভূমিকাই সেখানে সক্রিয়, মেয়েরা মূল বিষয়মাত্র। সাহিত্যের আলোতে আমরা বুঝতে পারি যে মেয়েরা এই ইতিহাসের একটি সক্রিয় অংশ—এই সক্রিয়তা যেমন তাদের ঘর থেকে বাইরে টেনে আনতে পারে তেমনি অন্দরমহলের চৌহদ্দিও তাদের সৃজনীশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। ইতিহাসে মেয়েদের সক্রিয় ভূমিকা সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে কতটা দেখানো যাবে জানি না, মেয়েদের সাহিত্যচর্চায় এর বহুমুখী নিদর্শন পাওয়া যায়। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ বর্ণিত 'একান্ত নিজের ঘর' না পেয়েও কিন্তু ভারতীয় মেয়েরা সাহিত্যচর্চা করেছে অন্তঃপুরে চার দেওয়ালের মধ্যে। এই সাহিত্য ইতিহাসের জরুরী সাক্ষ্য বহন করে।

সূত্রনির্দেশ

১ তনিকা সরকার, "মিডিল ক্লাস ন্যাশানালইজম অ্যাণ্ড লিটারেচার: এ স্টাডি অফ শরৎচন্দ্রস্ পথের দাবী অ্যাণ্ড রবীন্দ্রনাথস্ চার অধ্যায়", দ্রঃ ডি. এন. পানিগ্রাহী (সম্পা.), ইকনমিকস্, সোসাইটি অ্যাণ্ড পলিটিকস্ ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া, নতুন দিল্লী, ১৯৮৫; এবং একই লেখিকার, "ন্যাশানালিস্ট আইকনগ্রাফি: ইমেজ অফ উইমেন ইন নাইনটিনথ সেঞ্চুরি লিটারেচার", ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২১ নভেম্বর, ১৯৮৭।

২ যশোধরা বাগচী, "পজিটিভিজম অ্যাণ্ড ন্যাশানালইজম: উয়োম্যানহুড অ্যাণ্ড ক্রাইসিস ইন ন্যাশানালিস্ট ফিক্‌শন: বঙ্কিমচন্দ্রস্ আনন্দমঠ", (প্রথম প্রকাশ, ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, পরে গ্রন্থভুক্ত), দ্রঃ এস. মারাঠে ও এম. মুখার্জী (সম্পা.) ন্যারেটিভ: ফর্মস্ অ্যাণ্ড ট্রানস্‌ফরমেশনস্, নতুন দিল্লী, ১৯৮৬। একই লেখিকার, "ফেমিনিজম অ্যাণ্ড ন্যাশানালইজম ইন টেগোরস্ ঘরে বাইরে", দ্রঃ কে. রাধা (সম্পা.) ফেমিনিজম্ অ্যাণ্ড লিটারেচার, ইনস্টিটুট অফ ইংলিশ, ত্রিভান্দ্রাম, ১৯৮৭।

৩ ১৯৪৯ সালে সিমোন দ্য বোভোয়া তার 'দ্য সেকেণ্ড সেক্স' বইয়ে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন 'দ্য মিথ অফ উইমেন ইন ফাইভ অথরস্' শীর্ষক অধ্যায়ে। দ্রঃ এইচ. এম. পারশলি (অনুবাদ ও সম্পা.), দ্য সেকেণ্ড

সেক্স, পেঙ্গুইন সং, ১৯৮৬ পুনর্মুদ্রণ, পৃ ২২৯-২৯২। কেটি মিলেট-এর সেক্সুয়াল পলিটিকস্ বইটির প্রথম দু'টো অংশে সাহিত্যের উল্লেখ আছে এবং তৃতীয় অংশটির নামকরণ করেছেন 'দ্য লিটেরারি রিফলেকশন'। দ্রঃ কেটি মিলেট, সেক্সুয়াল পলিটিকস্, ভিরাগো, ১৯৭২, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৬, পৃ ২৩৮-৩৬৩। জুলিয়েট মিচেল, উইমেন, দ্য লঙ্গেস্ট রেভোলিউশন (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬), ভিরাগো পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৪, পৃ ১২৯, ২১৮

৪ এস. এন. মুখার্জী, "উইমেনস্ স্পেস্ অ্যাণ্ড উইমেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য নভেল অফ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী", পৃ ৬৭-৬৮।

৫ দ্রষ্টব্য, গোলাম মুরশিদ, রিলাক্ট্যাণ্ট ডেবুতাঁত, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ১৯৮৩। তিনি অবশ্য শুধু মহিলা সাহিত্যিকদের এক তালিকা দিয়েছেন। মেরিডিথ বরথউইক, দ্য চেঞ্জিং রোল অফ উইমেন ইন বেঙ্গল, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪। বরঞ্চ 'লোকরহস্য' বইতে বঙ্কিমচন্দ্র মেয়েদের বাংলা উপন্যাসের পাঠিকারূপে অত্যন্ত সরসভাবে তুলে ধরেছেন। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর', বঙ্কিম রচনাবলী, ২য়, সাহিত্য সংসদ সং, পৃ ৪৪-৪৭

৬ ফেব্রুয়ারি মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্কুল অফ উইমেনস্ স্টাডিজ' কর্তৃক আয়োজিত আলোচনাচক্রে ডঃ সুজি থারু এই গবেষণার ভিত্তিতে বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় "এ ফেমিনিস্ট ক্রিটিকি অফ উইমেনস্ রাইটিং ইন ইণ্ডিয়া ১৮৫০-১৯৫০" (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)।

৭ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত যে ক'টি মহিলাদের আত্মজীবনী এক্ষণ পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। কয়েকটি, বিনোদিনী দাসী, "আমার কথা", এক্ষণ, ১৩৭১। বঙ্গাব্দ থেকে তিন সংখ্যায় প্রকাশিত ; প্রসন্নময়ী দেবী, "পূর্বকথা", ঐ, শারদীয়া, ১৩৮৬ ; কৈলাশকামিনী দেবী, "জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী", শারদীয়া, ঐ, ১৩৮৮ ; হেমন্তবালা দেবী, "নিজের কথা", শারদীয়া, ঐ, ১৩৮৯, "কেশবজননী সারদা সুন্দরী দেবীর আত্মকথা", ঐ, শারদীয়া, ১৩৯১; সুধীরা গুপ্তা, "আমার সেদিনের কথা" (সম্পা. শ্রবণী ঘোষ), ঐ, শারদীয়া, ১৩৯৪। এর মধ্যে পাঁচটি আত্মজীবনীর বিশেষ সাহিত্যিক বিচার করেছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। মীনাক্ষী মুখার্জী, "দ্য আনপারসিভড সেল্ফ : এ স্টাডি অফ নাইনটিনথ সেঞ্চুরি বায়োগ্রাফিস্" (যেমন লেখিকা লিখেছেন), দ্রঃ করুণা আহমেদ (সম্পা.), সোশালাইজেশন, এডুকেশন অ্যাণ্ড উইমেন, নতুন দিল্লী, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৮।

৮ বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সং, পৃ ২৬৯-৭০।

৯ রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সং, অষ্টম খণ্ড, পৃ ১৪৪।

১০ ঐ, পৃ ১৫১।

অবহেলিত কাজের মেয়েরা

বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবাংলায় গত এক থেকে দেড় দশকে সামগ্রিকভাবে সংগঠিত শিল্পের অগ্রগতি রুদ্ধ বললে কম বলা হয়—আসল চিত্রটি অবক্ষয়ের। পশ্চিমবাংলায় শ্রমিক নিয়োগের দিক থেকে দু'টি বড় শিল্প যথা—পাট ও সুতিবস্ত্র শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা লক্ষ্যণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। শিল্প শ্রমনীতির প্রথম বলি হয়েছে সংগঠিত শিল্পের মেয়ে শ্রমিকরা। শ্রমবাজারে নতুন আগন্তুক যুবক-যুবতীদের সংগঠিত শিল্পে স্থান পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সংগঠিত শিল্পে যখন এই অবস্থা তখন তারই পাশাপাশি প্রসারলাভ করছে ফ্যাক্টরী আইন বহির্ভূত অজস্র ছোট ছোট কারখানা। এই সকল কারখানাগুলির উপরে কোনরকম সামাজিক নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কাজের ব্যবস্থার মান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নতম মানবিক সীমার বাইরে।

বেশ কিছুকাল ধরেই ভারতে রপ্তানী বাণিজ্যে যে মুনাফা সংগ্রহ করছে তার মধ্যে চা বা পাটের মত পুরোনো পণ্য বাদ দিলে বাকি পণ্যগুলির মধ্যে একটি বড় অংশ সরবরাহ হচ্ছে এই অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে—যার পোষাকি নাম হ'ল 'ইনফরম্যাল সেক্টর'। আমাদের ধনিকগোষ্ঠী এবং কিছু অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য হল আমাদের মত দেশে শিল্পোন্নয়নের নাকি এইটিই স্বাভাবিক পথ। আমাদের দেশে বর্তমানে এবং আগামী কিছুকালের মধ্যে যুব-শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য এই ধরনের ব্যবস্থাই নাকি যুক্তিযুক্ত। এই নীতির অনুসরণে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে অজস্র নানা রকমের অসংগঠিত শিল্প সংস্থা।

রাস্তাঘাটে চোখ খোলা রেখে চললে দেখা যায় কোন বাড়ির গ্যারেজঘর, পোড়ো বাড়ি, অস্থায়ী টিনের চালা ও বস্তির মধ্যে কারখানাগুলি গজিয়ে উঠেছে—প্রত্যেকটি কারখানাতেই গুটিকয়েক পুরুষ ও মেয়ে শ্রমিক সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করছে। কোথাও সংখ্যায় পাঁচ ছয় জনের বেশি নয়। এদের বয়স দশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ রকমের কাজে যুক্ত আছে এরা। এদের মধ্যে মেয়ে এবং শিশুর সংখ্যাই বেশি। এই সকল

কারখানাতে তৈরী হয় সাইকেলের প্যাডেল, টায়ার, ওষুধের এ্যাম্পুল, টুনি বাল্বের গুচ্ছ, বাল্বের ফিলামেণ্ট, সিরামিকের জিনিস, জুতো ও চটির অংশ, চামড়ার নানা জিনিস, টেলারিং ইত্যাদি হরেক রকমের জিনিস।

এগুলি হচ্ছে অসংগঠিত শিল্প সংস্থা। কিন্তু সরকারী পরিসংখ্যানে এই কারখানাগুলির কোন সঠিক হিসেব নেই। আইন অনুযায়ী কারখানা হতে গেলে যতসংখ্যক লোক খাটাতে হয় এইসব কারখানার মজুর সংখ্যা তার কাছাকাছিও নয়। অর্থনীতির পরিসংখ্যানের আওতায় আসতে হলে যত টাকার পুঁজি খাটাতে হয় এইসব কারখানার পুঁজি তার ধারে-কাছে নয়। এই কারখানাগুলি সরকারী বে-সরকারী সব হিসেবেরই বাইরে।

কিন্তু এই হিসেবের বাইরের কারখানাগুলির সঙ্গে সুতো বাঁধা আছে সেইসব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের যাদের হিসেব চেম্বারের মিটিং-এ পাশ হয়, খবরের কাগজে ছাপা হয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিনে বেরোয়, লোকসভায় ওঠে। উদাহরণস্বরূপ দেশ-বিদেশ বিখ্যাত কোন একটি জিনিসের কারখানায় কথাই ধরা যাক। মন্দা বাজার শ্রমিকের দাবিদাওয়া বা সরকার কেন কর রেহাই দিচ্ছে না—এই সকল অজুহাত দেখিয়ে মালিকরা নিজেদের কারখানার শ্রমিকদের ছাঁটাই করল অথবা কারখানাই বন্ধ করে দিল। আর হিসেবের বাইরের এই সকল ছোট ছোট কারখানা থেকে উক্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের অংশগুলি কিনে নিয়ে জড়ো করে বা জুড়ে নিজেদের কারখানা বা কোম্পানীর ছাপ মেরে বাজারে ছাড়ল। (রেডিও, সাইকেল, বাটার জুতো ইত্যাদি) নিজেদের কারখানায় পুরো জিনিসটা তৈরী করতে যে খরচ পড়ত তা না করে হিসেব বহির্ভূত কারখানা থেকে বিভিন্ন অংশ কিনে নিয়ে সেগুলিকে কেবলমাত্র জুড়ে নিয়ে বানালে তার চেয়ে অনেক কম খরচ পড়ে আর মুনাফাও বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু শ্রমিকদের দাবিদাওয়া মেটাবার দায় থাকে না—সরকারকে দেয় করও বেশ খানিকটা ফাঁকি দেওয়া যায়।

অসংগঠিত শিল্প বলতে কি বোঝায় এবং অসংগঠিত শিল্পের সঙ্গে সংগঠিত শিল্পের সম্পর্ক কি সে বিষয়ে এখানে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়েও একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার—অসংগঠিত শিল্পের সব জিনিসই যে রপ্তানী বাজারে যাচ্ছে বা তারা বড় কারখানার কাজ করছে তা নয়—এদের আবার দেশের মধ্যে নিজেদের বাজারও আছে। এঁদের একদল ক্রেতা ঘরে এবং বাইরেও আছে। কম পুঁজি, সরকারী সুযোগ-সুবিধা পায় না—এমন সংস্থারাও রপ্তানী করছে। আবার বহুজাতিক সংস্থা বা একচেটিয়া পুঁজির

মালিকানা সংস্থাদেরও এরা যোগানদার। হয় রপ্তানী বাজার নয়তো দেশের মধ্যে একটু অবস্থাপন্নরা হল এদের ক্রেতা।

অসংগঠিত শিল্পগুলির মধ্যেও যে অবস্থার তারতম্য, ভাগ আছে সে সম্বন্ধে কোন বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়—তার জন্য আলাদা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও বিশ্লেষণ করা দরকার।

কলকাতার এবং সামগ্রিকভাবে অসংগঠিত নারী শ্রমবাহিনীর পূর্বের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকায় অসংগঠিত নারী শ্রমিকদের অনুপাত বৃদ্ধির তুলনা-মূলক প্রমাণ দাখিল করা সম্ভব না হলেও যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তার থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে মেয়েরা আগের তুলনায় অনেক বেশি রকমারি পেশায় ও কাজে যুক্ত হচ্ছে। কলকাতা ও আশেপাশের যে কোন বস্তি বা আধা বস্তি অঞ্চলে গেলেই বোঝা যাবে যে-কোন স্তরের উপার্জনে অংশ-গ্রহণকারী নারী শ্রমিকের সংখ্যা কত বেড়েছে।

মেয়ে ও শিশুরা যে ধরনের কাজ করছে তার মজুরীর হার শুধুমাত্র নিম্নমানই নয়—বিপুলসংখ্যক ক্ষেত্রে তাদের মজুরী ফুরণে (piece rate) বাঁধা। কাজের কোন নিরাপত্তা নেই, অনেক ক্ষেত্রেই বসে কাজ করার জায়গা এবং কাজের নিম্নতম যন্ত্রপাতিও মেয়েদের নিজেদেরই সংগ্রহ করতে হয়। অর্থাৎ নিয়োগকর্তার দিক থেকে শ্রমবাহিনীকে ব্যবহার করে মুনাফা করার জন্য যে নিম্নতম মূলধন নিয়োগ করতে হয় তাকে প্রায় কাঁচামাল সরবরাহে সীমাবদ্ধ রাখার একটি চতুর ব্যবস্থা সর্বত্র প্রসারিত হচ্ছে।

অসংগঠিত শ্রমজীবী মেয়েরা এখনও নিয়োগকর্তা ও শিল্পপতিদের এই অসামাজিক ও অমানবিক কারণগুলির জন্য কোন সংগঠিত শ্রমবাহিনীর চেহারা পায় নি। তাই শ্রমের বাজারে নিজেদের শ্রমের মূল্য সম্পর্কে এখনও সুস্পষ্ট ধারণা বা চেতনার সৃষ্টি হয় নি। অন্যদিকে এরা সামাজিকভাবেও এমনকি দিনে আট ঘণ্টার বেশি পরিশ্রম করেও পূর্ণাঙ্গ উপার্জনশীল হয়ে ওঠে নি। বেশির ভাগ মেয়েরাই পরিবারের সহযোগী আয়ের লোক (supplementary) হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মালিকরা এই অসংগঠিত শ্রমবাহিনীকে স্বাভাবিক মজুরীর বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে মেয়েদের রোজগারকে উপরি রোজগার হিসাবে দেখা ও দেখানোর মানসিকতাকে পুরোপুরি ব্যবহার করে অবিশ্বাস্য নিম্নমানের মজুরী চালু রাখতে পারছে।

উৎপাদিত পণ্যের দিক থেকে লক্ষ্যণীয় হল এই অসংগঠিত শিল্প সংস্থাগুলির বেশির ভাগই ব্যাপৃত আছে এমন জিনিসের উৎপাদনে যা সাধারণত ফ্যাক্টরী মারফৎ উৎপাদিত হওয়ার কথা। তাছাড়া এর অনেকগুলি

আবার আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্য। এই পণ্য উৎপাদনের উৎস ফ্যাক্টরী বহির্ভূত অসংগঠিত ইউনিটগুলি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারার কারণ অতি অল্প মূল্যে দরিদ্র অসংগঠিত শ্রমবাহিনীর রক্ত জল করা শ্রম (sweating labour)।

কল্পনাতীত কম মজুরী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফুরণে কাজ করার শর্তে শ্রম-বাজারে মেয়েদের নেমে পড়ার অন্যতম কারণ পরিবারের আয় প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম বলে শুধু বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা।

কাজটা যেহেতু ফুরণের, তাই কারখানায় বসে কাজ করা বাধ্যতামূলক নয়। ঘরে বসে পরিবারের সব লোক মিলে কাজের পরিমাণ (output) বেশি করার চেষ্টা করে এরা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কারখানা ঢুকে পড়েছে মেয়েদের রান্নাঘরে। এই মেয়েদের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মালিকপক্ষ ফুরণের হার অবিশ্বাস্যভাবে নামিয়ে দেয়। প্রথমত কারখানায় বসে কাজ করার কোন ব্যবস্থা নেই তার উপরে একই কারখানায় কারা কারা কাজ করছে সেটা পরস্পরের জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া একজন বেশি রেট দাবি করলে কম রেটে কাজ নেবার জন্য অনেক মেয়ে হাজির হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের দেশের অর্থনীতি যখন নাকি সাবালকত্বে পৌঁছেছে তখনই কাজের বাজারে মেয়েদের এইভাবে নেমে পড়ার সুযোগে মজুরের মেহনত নিয়ে হরি-লুটের কারবার চলছে। সেই মেহনত লুটছে খুঁচরো কারখানা বা সংস্থার বকলমে বড় বড় কারখানা ও কোম্পানীর মালিকেরা। লুটটা যাতে নিখুঁত হয় তাই এই খুচরো কারখানাগুলি খোলা হচ্ছে বড় কারখানাগুলিকে ঘিরে, বস্তি বা আধা বস্তি পাড়ার কাছাকাছি।

প্রায় বারো বছর আগে 'কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস'-এর উদ্যোগে 'কলকাতা অসংগঠিত নারী শ্রমিক' বিষয়ক একটি সমীক্ষার কাজে যুক্ত থেকে মেয়েদের কাজের জায়গায় ও বস্তি অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। সেই সুবাদে তাদের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ ও পরিচয় হয়। এই নিবন্ধে সেই সব মেয়েদের কিছুটা পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করব যাতে তাদের একটা নিজস্ব নাম ও চেহারা প্রকাশ পায়।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে শহরের অসংগঠিত মেয়েদের মতো গ্রামাঞ্চলে, জঙ্গলে, পাহাড়ে ও খনিতে কর্মরতা বহু অবহেলিত মেয়ে নানারকম কাজ ও পেশায় যুক্ত আছে—যুক্ত আছে গ্রামীণ শিল্প ও গৃহকর্মে—যাদের কাজ উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। যেহেতু গ্রাম এবং

শহরের কাজের ও পেশার প্রকৃতি এবং সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন তাই তাদের কথা পৃথকভাবে অন্য কোন সময় তুলে ধরার চেষ্টা করব।

রবার কাটা

আমরা যখন সমীক্ষার কাজে বেলেঘাটা অঞ্চলে যাই তখন ন্যাশানাল রবার ফ্যাক্টরীতে লক-আউট চলছিল। রাস্তার নাম হিউজ রোড। সময়টা বর্ষার শুরু। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির জল নর্দামা ছাপিয়ে রাস্তায় জমা হয়ে কোন কোন বস্তির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মোষের খাটাল, বস্তি ও ঝুপরি। তারই মাঝে মাঝে ছোট ছোট কারখানা। জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। পানীয় জলের দারুণ অভাব। রাস্তার কলে সারিবদ্ধ বালতি ও কলসীর লম্বা লাইন। জল নিয়ে ঝগড়া, মারামারি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। একটি কারখানা নজরে এল। সেখানে সাইকেলের প্যাডেল ও টায়ার তৈরি হচ্ছে। ছোট ছোট দু'খানা ঘরের একটাতে দু'জন পুরুষ শ্রমিক প্যাডেল ও টায়ার তৈরি করছে মেশিনের সাহায্যে। পাশের ঘরে বসে দু'জন মেয়ে বড় কাঁচি দিয়ে লম্বা সিট থেকে প্যাডেলগুলি কেটে আলাদা করছে আর টায়ারের ধারের বাড়তি রবার ছেঁটে ফেলছে।

কারখানার নাম 'লক্ষ্মীনারায়ণ রবার ইণ্ডাস্ট্রি'। এখানকার শ্রমিকরা দিনমজুরী পায়। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ডিউটি। পুরুষ শ্রমিকরা পায় দৈনিক ৭ টাকা, মেয়েরা পায় দৈনিক ৫ টাকা। সম্প্রতি খোঁজ নিয়ে জানা গেল ছেলেদের মজুরী দৈনিক ১২ টাকা থেকে ১৬ টাকা আর মেয়েদের ৮ থেকে ১০ টাকা।

মালিকের কাছ থেকে জানতে পারলাম টায়ার ও প্যাডেল দেশের ভিতরে এবং বাইরে চালান যায়। মালিকের রপ্তানীর সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই—সমস্ত লেনদেন চলে ফড়েদের (agent) মাধ্যমে। উৎপাদনের হার মোটামুটি ভাল। আরও মজুর নিয়োগ করে উৎপাদন কেন বাড়ানো হচ্ছে না জানতে চাওয়ায় বলে "আমি বেশি লাভ করতে চাই না—মোটামুটিভাবে চলে যাওয়ার মতন হলেই আমি খুশী—বেশি লোক নেওয়া মানে ঝামেলা বাড়ানো।"

ঐ কারখানার মেয়ে দু'টির কাছ থেকেই জানতে পারলাম এই কারখানার কাজ করে সামনের বস্তির অসংখ্য মেয়েরা ঘরে বসে। মালিককে না ঘাঁটিয়ে চলে এলাম কারখানা সংলগ্ন বস্তিতে। সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য নজরে এল। বস্তির একটি অংশে বাস করে ৮টি পরিবার—তারা প্রত্যেকেই রবার

কাটার কাজ করছে। মেয়েরা সবজি কাটার বঁটিতে শাক কাটার মত করে সাইকেলের প্যাডেল ও টায়ার কাটছে। একজনকে দেখলাম কাজের মাঝে মাঝে উনুনে চড়ানো ভাতটা নেড়ে দিচ্ছে। ১৪৪টা প্যাডেল কাটলে ৭৫ পয়সা আর ১৪৫টা টায়ার কাটলে ৫০ পয়সা মজুরী। (বর্তমানে এদের মজুরী খুব সামান্যই বেড়েছে) রবার কাটার জন্য কোন যন্ত্র বা কাঁচি দেওয়া হয় নি। সবজি কাটার বঁটিতে রবার কাটার ফলে বঁটির ধার কমে যায়—প্রতি সপ্তাহে বঁটিতে ধার দেওয়াতে লাগে ৫০ পয়সা। সেই খরচটুকুও মালিক বহন করে না।

এই মেয়েদের কারখানায় গিয়ে কাজ করার চেয়ে ঘরে বসে কাজ করাটা বেশি গ্রহণযোগ্য। ছেলেপুলেদের দেখাশোনা ও সংসারের আর পাঁচটা কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাজ করে কিছু উপার্জন করা যায়। তবে এদের বক্তব্য হল ফুরণের রেটটা যদি আর একটু বাড়ানো যেত তাহলে খানিকটা পোষাত আর সংসারেরও কিছুটা সুরাহা হত। ফুরণের রেট কেন বাড়াতে বলছে না জানতে চাইলে বিমলা বলে ওঠে—"আমরা বেশ কয়েকবার মালিককে অনুরোধ করেছি রেট বাড়াবার জন্য। মালিক সোজাসুজি বলেছে "পোষায় তো কর—নাহলে করো না। কাজের লোকের অভাব হবে না।—আমরা তারপর থেকে আর রেট বাড়াবার কথা বলতে সাহস পাই নি। কি জানি যদি এই কাজটুকুও হারাতে হয়।"

আর একটি ঘরে ঢুকে দেখি মেঝেতে সদ্যজাত বাচ্চাকে এক চটের উপর শুইয়ে এক অল্পবয়সী রুগ্ন মা রবার কাটছে। একখানাই খুপরির মত ঘরের ভেতরে ইটের উপর ইট চাপিয়ে চৌকি পেতে একতলা দোতলা করা হয়েছে। চৌকির উপরে এক বৃদ্ধা শুয়ে—জীবিত কি মৃত বোঝা যায় না। চৌকির নিচে একতলায় মলিন কাঁথায় দুই ছেলে শুয়ে আছে—তাদের গায়ে জ্বর।

পারুলের স্বামী একজন ন্যাশান্যাল রবার ফ্যাক্টরীর কর্মী ছিল। লক-আউট হবার পর ধাপার মাঠ থেকে সবজি কিনে শিয়ালদায় বিক্রী করে দিনে ৪/৫ টাকা রোজগার করে। তার থেকে ২ টাকা দিতে হয় মহাজনকে।

আগে পারুলদের দেশ ছিল মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলে, সামান্য ক্ষেত-জমি আর বাস্তুভিটা ছিল। স্বামী ক্ষেতমজুরিও করত। দেনার দায়ে সবকিছু বাঁধা পড়ে মহাজনের কাছে। ১৯৭২ সালে বাধ্য হয় কলকাতায় চলে আসতে। স্বামী ন্যাশানাল রবার ফ্যাক্টরীতে মাস গেলে ২০০/২৫০ টাকা পেত। ওভারটাইম করেও কিছু বেশি রোজগার হত। তখন মোটামুটি

সংসারটা চলে যেত। এখন আর চলে না। পারুল রক্তহীনতায় ভুগছে। এই শরীর নিয়েও রাত জেগে পারুল রবার কাটে।

ট্যানারির কাজ

বেলেঘাটার ট্যাংরা অঞ্চলের দক্ষিণে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৩০০ ট্যানারি আছে। অধিকাংশ ট্যানারির মালিকানা চীনাদের। আনুমানিক শ্রমিক সংখ্যা ১৮০০। তাদের মধ্যে ৩০০০ হল মেয়ে শ্রমিক। মেয়েদের সংখ্যাটা ওঠানামা করে—কারণ এরা কেউই স্থায়ী কর্মী নয়।

আগে হিন্দু মেয়েরা কখনো ট্যানারিতে কাজ করত না। মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কায় সংস্কারের শেকড়ে টান পড়েছে। হিন্দু মেয়েরাও ট্যানারির কাজে নেমে পড়েছে। তবে হিন্দু মেয়েরা ট্যানারির সবরকম কাজ করে না—চামড়া শুকিয়ে রং করার পর সেগুলি গুনীত করে গুছানো হচ্ছে ওদের কাজ।

এই ট্যানারির অধিকাংশই রেজিস্ট্রিকৃত। কিন্তু বছরের পর বছর কাজ করেও বেশ কিছু শ্রমিক—বিশেষ করে মেয়ে শ্রমিকরা অস্থায়ী কর্মী হিসেবেই রয়ে গেছে। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ডিউটি। দিনে ৩ টাকা করে মজুরী এদের। বর্তমানে ১০ টাকার বেশি না। অনেক মেয়ে ১৫ বছর কাজ করেও স্থায়ী হতে পারে নি। এদের দিয়ে টানা আট-দশ মাস কাজ করিয়ে তারপর বসিয়ে দেওয়া হয় স্থায়ী করার ভয়ে। এরা কেউ সবেতন ছুটি পায় না। প্রসবকালীনও কোন ছুটি নেই। অসুখ করলে বা কারখানায় ভিতরে কাজ করা কালীন কোন দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ বা চিকিৎসার সুযোগ পায় না। এরা অস্থায়ী কর্মী বলে ইউনিয়নেরও কোন মাথা-ব্যথা নেই।

একটা বড় ট্যানারিতে ঢুকলাম। বিশাল বিশাল চুল্লির উপরে সারিবদ্ধ বড় বড় পাত্রে কাঁচা চামড়া চুন ও কেমিক্যালের সাহায্যে সেদ্ধ করছে পুরুষ শ্রমিকরা। আর অন্যদিকে মেঝেতে বসে মেয়েরা সেদ্ধ করা চামড়া থেকে হাত দিয়ে টেনে টেনে লোম ও চর্বি চামড়া থেকে ছাড়াচ্ছে। জল ও চর্বিতে ঘরের মেঝে হড়হড়ে হয়ে গেছে। মেয়েদের হাতে দস্তানা থাকলেও পায়ে হাজা। তাদের কোন এ্যাপ্রন দেওয়া হয় না। ফলে সারাদিন ভেজা জামাকাপড়ে থাকতে হয়। এর ফলে সর্দিকাশি এদের নিত্য সঙ্গী।

আমরা মেয়েদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইলে সুপারভাইজার ফতিমা বিবিকে এগিয়ে দেয়। ফতিমা যখন কাছে এল গা দিয়ে দুর্গন্ধ

ছড়াচ্ছে। সমস্ত জামাকাপড় চপচপে ভেজা। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। তিন সন্তানের মধ্যে ছোটটি ১০ মাসের। এখনও বুকের দুধ ছাড়ে নি। ঘরে রুগ্ন স্বামী বাচ্চাদের দেখাশোনা করে। ফতিমার ১০ বছর বয়সে রহিমের সঙ্গে বিয়ে হয়। লক্ষ্মীকান্তপুরে কিছু জমিজমা ছিল। জ্ঞাতিভাইয়েরা রহিমকে বঞ্চিত করে সব কিছু আত্মসাৎ করেছে। ঝুপরির মধ্যে পাঁচটি প্রাণী মাথা গুঁজে থাকে। রহিমের কোন কাজ জোটে নি। মাঝে মাঝে রাস্তায় জঞ্জাল থেকে কাঁচ, লোহার টুকরো সংগ্রহ করে বিক্রী করে সামান্য কিছু পয়সা আয় করে। ফতিমার আয়েই সংসারে চলে।

রাতের শেষ প্রহরে মোরগের ডাকে ফতিমার ঘুম ভাঙে। স্বামীর কষ্ট লাঘব করার জন্য যতটা পারে সংসারের কাজ সেরে স্বামী ও ছেলেমেয়েদের চিনির জলে ভিজিয়ে রুটি খেতে দেয়—নিজেও খেয়ে নেয়। সব কাজ সারতে গিয়ে সময়ের টান পড়ে কচি বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াবার সময়। বেশির ভাগ দিনই বাচ্চাটাকে দুধ না খাইয়ে ছুটতে হয় কারখানার দিকে। রহিম সুস্থ থাকলে টিফিনের সময় বাচ্চাটাকে নিয়ে কারখানার গেটে হাজির হয়। ফতিমা তখন দুটো শুকনো রুটি চিবোয় আর বাচ্চাকে দুধ দেয়।

সুপারভাইজার আমাদের সামনে ঘুর ঘুর করছে দেখে ফতিমার ক্ষতি হতে পারে ভেবে চলে আসি।

শাদির চটি—জাহেরার শাদি

চামড়ার চটি, জুতো প্রধানত উৎপন্ন হয় কানপুর ও কলকাতায়। মোট জুতোর একটা বড় অংশ বিদেশে রপ্তানী হয়। কলকাতা শহরে ২০০০ চটি ও জুতো তৈরীর জায়গা আছে—তার মধ্যে কলকাতার তাঁতিবাগানে একটি। এখানে বস্তিবাড়ির প্রায় প্রতি ঘরেই চটি বা জুতোর অংশ তৈরী হয়। চটি শিল্পীদের অনেকেই মালিক—আবার মালিক এবং শ্রমিক।

কাঁচামালের একচেটিয়া কর্তৃত্ব রয়েছে কিছু সর্বভারতীয় গদিওয়ালাদের হাতে। বিভিন্ন স্তরে আছে ফোড়েরা (agent)। এই ফোড়েরাই সমস্ত ক্ষুদ্র উৎপাদকদের কাঁচামাল সরবরাহ করে বোঝার উপর শাকের আটির মতো আর এক প্রস্থ মুনাফা লুটে নেয় চটি শিল্পীদের কাছ থেকে। কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে এই সকল ক্ষুদ্র চটি শিল্পীদের কোন হাত নেই। এমনকি তাদের তৈরী চটির দাম নির্ধারণের ক্ষমতাও তাদের হাতে নেই। বাজারে কোন চটি কত দামে বিক্রী হবে তা ঠিক হয় পাইকারী ব্যবসায়ীদের দ্বারা। বাটা থেকে শুরু করে সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ীরা পাইকারদের কাছ

থেকে সমস্ত মাল কিনে নেয়। আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ চটি বেশির ভাগই এই সকল ছোট ছোট ঘরোয়া কারখানা থেকে তৈরী। ব্যবসায়ীরা নানা রকম খুঁত দেখিয়ে অতি কম দামে চটিগুলি কিনে নিয়ে কোম্পানীর ছাপ মেরে বাজারে চড়া দামে বিক্রী করে। দশ টাকার চটি কিনে বিশ বাইশ টাকায় বিক্রী করে। একজোড়া চটি বানাতে ৯ টাকা থেকে ১২ কি ১৩ টাকা খরচা। অনেক ছোট চটি শিল্পী এই ব্যবসা ছেড়ে অন্য কোন কাজের সন্ধান করছে। এখনও পর্যন্ত যেসব চটি শিল্পী টিমটিম করে বেঁচে আছে তার অন্যতম কারণ বিশেষ পার্বন, উৎসব ও বিয়ের মরশুমে নানা রকম নকশাওয়ালা চটির চাহিদা থাকায়। কিন্তু সেই চাহিদা তো সারা বছর থাকে না। ফলে ছোট চটি শিল্পীদের বড় বড় ব্যবসায়ীদের করুণার উপর নির্ভর করে বাঁচতে হয়।

কিভাবে সাহায্য করলে এই ছোট চটি শিল্পীরা ব্যবসা চালাতে পারবে জিজ্ঞাসা করলে সকলেই এক কথায় বলে "কাঁচামাল যোগান আর দরদাম ঠিক করার দায় যদি সরকার নিজের হাতে নেয় তাহলেই চটি শিল্পীরা টিঁকে থাকতে পারবে।"

তাঁতিবাগানের প্রায় প্রতিটি পরিবারের মেয়েরা চটির নানা অংশ তৈরী করে। মেসিনে চটির ফর্মাটা বেরিয়ে আসার পর খুচরো কাজ ও ফিনিস করার কাজ করে মেয়েরা। চামড়া দিয়ে বিনুনি করা, চটির উপরে নকশা কাটা, জরি, বোতাম ও চুমকি বসানোর কাজ করে ওরা। এই মেয়েদের বয়স বারো থেকে বাইশ বছর।

২১ বছরের জাহেরা খাতুনও একজন চটির কারিগর। অনেক ছোট থেকেই এ কাজ করছে। তাঁতিবাগানের বিশাল বস্তির মধ্যে জাহেরাদের দেড়খানা ঘরে বাস করে ১২ জন মানুষ। ঘরের এককোণে ৯০ বছরের অন্ধ বৃদ্ধা দাদিমা শুয়ে। ঘরের আর এককোণে কয়েকজন ছোট ছেলে-মেয়েদের পাঠশালা বসে গেছে। জাহেরা ওদের পড়িয়ে মাথাপিছু মাসে ৫ টাকা করে পায়। মাসে রোজগার হয় ৬০ টাকা। জাহেরা মাথা নিচু করে চটি তৈরী করছে আর মাঝে মাঝে বাচ্চাদের পড়া দেখিয়ে দিচ্ছে। একজোড়া চটি থেকে ২ টাকার বেশি আয় হয় না। পূজা-পার্বন ও ঈদের সময়ে জাহেরা রাত জেগে চটি তৈরি করে। জাহেরার বাপজান জুতোর কারখানায় পিসবোর্ড সাপ্লাই দিয়ে মাসে রোজগার করে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা। তাতে কি এতবড় সংসার চলে? জাহেরাই ঘাটতি পুরণ করে।

জাহেরার হাতের কাজ খুব সুন্দর বলে মেহনতের বাজারে তার খাতির আছে। ন্যায্য মজুরী না মিললেও অনেক অর্ডার পায়। অতিরিক্ত পরিশ্রম

করে প্রয়োজনীয় অর্থ তুলে নেয়। জাহেরার মা ক্ষোভের সঙ্গে বলে "মেয়েটার শাদি তো দিতে হবে—আর কতদিন ও আমাদের জন্য জীবনটাকে নষ্ট করবে?" এতক্ষণ জাহেরা মাথানিচু করে কাজ করে যাচ্ছিল—মার কথা শুনে মুখটা তুলে বলল—"আমি শাদি করব না আম্মা।"

নাইলনের ছাঁট বাছাই

বেলেঘাটায় চালপট্টি অঞ্চলে খালের পাড় ধরে নানা রকমের ছোট ছোট কলকারখানা। তার মধ্যে হাড্ডিকলই সংখ্যায় বেশি। আর আছে টুনিবাল্ব, এ্যাম্পুল, ইলাস্টিক টেপ, প্লাইউড, চায়ের প্যাকিং বাক্স, পাটের দড়ি ইত্যাদি বহু ছোট ও মাঝারি কারখানা। তার মধ্যে নজরে এলো "হ্যাণ্ড ডাইং এ্যাণ্ড ওয়াশিং কোম্পানী"র সাইনবোর্ডটা। একটা পোড়ো বাড়িকে লিজ নিয়ে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক কোম্পানীটা খুলেছেন। দোতলায় একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছেন।

একটা টিনের সেড দেওয়া বড় গুদামঘরে ও চত্বরে বসে কাজ করছে অনেক মেয়ে-পুরুষ শ্রমিক।

প্রথমে তো মালিক আমাদের কিছুতেই মেয়েদের সঙ্গে দেখা করাতে চান না, তারপর আমরা একটু কৌশল করে দেখার ব্যবস্থা করলাম। এতগুলি গরীব মেয়েকে যে উনি চাকরী দিয়ে কতবড় প্রশংসার কাজ করেছেন—এ কথা একটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলার পরে ভদ্রলোক একগাল হেসে আমাদের ঢুকতে দিলেন। দাতব্য চিকিৎসালয়টি যে এই মেয়েদের কল্যাণের জন্য খুলেছেন সে কথাও বলতে ছাড়লেন না।

এই ভদ্রলোকের ব্যবসা হচ্ছে বড় বড় সুতাকল থেকে পরিত্যক্ত নোংরা নাইলনের ছাঁট এবং কুচি কাপড় সংগ্রহ করে সেগুলিকে নানারকমভাবে সাফ-সুরৎ করে প্যাকিং করে মিলগুলিতে চালান দেওয়া। ঐগুলি থেকে নাকি ভাল মোটা কম্বল তৈরী করা যায়।

মোট শ্রমিক সংখ্যা—মেয়ে চল্লিশ, পুরুষ ত্রিশ। একটি স্কুল ফাইনাল পাশ কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে মাসিক ২০০ টাকায় সুপারভাইজার রয়েছে। বাকি মেয়েরা কাজ করে ফুরণে। ছেলেরা কাজ করে দিনমজুরিতে।

মেয়েদের কাজ হল সুতো ও নাইলন থেকে নোংরা বাছাই করে সেগুলি শাকের মত বঁটিতে কুচো করে কাটা, এবং তার গুণাগুণ বিচার করে বাছাই করে রাখা। আর ছেলেদের কাজ হল কুচোনো সুতোগুলি বড় বড় চৌ-বাচ্চায় ঢেলে পা দিয়ে দলাই-মলাই করে পরিষ্কার করা—তারপর সেগুলি

রোদে শুকিয়ে প্যাকিং করে মিলগুলিতে পাঠানো। মিলগুলির সাথে মালিকের চুক্তির ভিত্তিতে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির কলেবর দিনে দিনে বৃদ্ধি হতে থাকে।

যে গুদামঘরটিতে মেয়েরা বসে কাজ করে সেখানকার নোংরা ধুলো আর নাইলনের কুচির রেণুগুলি মিলেমিশে ঘরের হাওয়াকে ভারী, দূষিত করে তুলেছে। ঘরের মধ্যে ঢুকলেই দমবন্ধ হয়ে আসে। এতগুলি মেয়ে এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কাজ করে চলেছে। প্রতিদিন নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুস টেনে নিচ্ছে ধুলো আর ছাঁটের রেণু। অনেক মেয়েরই কিছুকালের মধ্যে কালরোগে ধরে, রক্তবমি করে। কোনরকম প্রতিষেধক তো দূরের কথা সাধারণ মাস্ক পর্যন্ত দেওয়া হয় না। অসুখ করলে চাকরী যায়। কতজন মরে তার হিসেব কে রাখে?

ছাঁট কুচি করে প্রতি কিলোতে মেয়েরা পায় ৪০ পয়সা। দিনে ৪/৫ কিলোর বেশি কাটা সম্ভব হয় না। কোন ছুটি নেই। অসুখ করে বেশিদিন কামাই করলে তার স্থান দখল করে আর একজন।

মালিকের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে পরিতৃপ্তির হাসি। বিরাট এক বক্তৃতা দিয়ে বললেন "কাজই মানুষকে বড় করে। কষ্ট করলেই না কেষ্ট মেলে!"

ভদ্রলোকের সত্যিই কেষ্ট মিলেছিল। কোম্পানীর আয় প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি কলকাতার বাইরের রাজ্যের মিলগুলির সঙ্গেও চুক্তি হয়েছিল। তার সাথে সাথে কোম্পানীর গুদামঘরের বাতাস আরও ভারী, আরও বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। বাঁচার জন্য কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল অনেককেই।

প্রথম কয়েক বছর চাকরী যাওয়ার ভয়ে কর্মীরা ইউনিয়ন গড়ে তুলতে সাহস পায় নি। তখন ইউনিয়ন গড়ে তোলার মতো কোন যোগ্য লোকও ছিল না। অন্যান্য কারখানার তুলনায় এখানে শ্রমিক সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় পরে একটি ইউনিয়নও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই ইউনিয়ন লড়েও কিছু ফল পায় নি। তাদের পিছনে দাঁড়াবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন বা রাজনৈতিক দল এগিয়ে আসে নি। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা গেল গত দু'বছর আগে কোন এক রহস্যজনক কারণে কোম্পানীটি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কেউ বলতে পারল না ঠিক কি কারণে আগুন লাগল। কেউ বলল কর্মীদের দাবি না মানায় তারাই আগুন লাগিয়েছে আবার কেউ বলল মালিক নিজেই পুড়িয়ে দিয়েছে।

সেলাইয়ের কাজ

দর্জি'র কাজ করুণা সাহাদের জাত-ব্যবসা। পূর্ববাংলায় থাকতে নিজেদের দর্জি'র দোকান ছিল। ১৯৬৪ সালে কলকাতায় আসে ওরা। স্বামী তখন বেঙ্গল পটারিতে একটা কাজ পায়। করুণা একাই সেলাইয়ের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। ১৪ বছর বয়সে করুণার বিয়ে হয়েছিল, বর্তমানে বয়স ৪৫। বড় দুই মেয়েকে আগেই বিয়ে দিয়েছে। ছোট দুই মেয়ে ও দুই ছেলেকে স্কুলে দিয়েছে। কলকাতায় আসার পরে থেকে স্বামীর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। ১৯৭৬ সালে স্বামী লিভার ক্যান্সারে মারা যায়। করুণা সামান্য পেনশন পায়। স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরার জন্য করুণাকে সমস্ত দিন অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। প্রথমদিকে করুণার মাথায় জেদ চেপে গিয়েছিল সংসারের অভাবের চাপে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ হতে দেবে না। তাই নিজের একটা সেলাই মেসিন থাকা সত্ত্বেও আর একটা সেলাই মেসিন মাসে ১২ টাকা দিয়ে ভাড়া নেয়। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে দিনে এক ঘন্টা করে তাদের দিয়ে সেলাই করিয়ে নেয়। পাইকারদের কাছ থেকে দিনেই ছাঁটকাপড় সংগ্রহ করে জিনিস তৈরী করে জমা দিতে থাকে। ভোর ৫টা থেকে করুণা দশভূজার মতো সংসারের সব কাজ দ্রুত সেরে নিয়ে সেলাই করতে বসে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যত্ন করে কাজ করার জন্য সে নিয়মিত অর্ডার পায়। প্রথম কয়েক বছর এক ডজন ব্লাউজ শুধু মেসিনে সেলাই করলে মজুরী ছিল ২·৪০ পয়সা। কুঁচি দেওয়া পেটিকোট এক ডজনে ১·২৫ পয়সা আর প্লেনকাটের পেটি-কোটের এক ডজনে ১·৫০ পয়সা। তখন আয় হত মাসে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা। এখনও করুণা সেলাইয়ের কাজ করে। মজুরী বেড়ে হয়েছে ব্লাউজ এক ডজনে ৫ টাকা, পেটিকোট এক ডজনে গড়ে ৩ থেকে ৩·৫০। এখন মাসে গড় আয় ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা। ছোট দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ছেলে বিয়ে করে আলাদা বাসায় থাকে এবং জামা-কাপড়ের ব্যবসা করে। ১৬ বছরের ছোটছেলে হায়ার সেকেণ্ডারি পড়ছে। মাকে মাঝে মাঝে পাইকারদের কাছ থেকে কাপড় এনে দেয় এবং তৈরী জামাকাপড় জমা দিয়ে আসে। মাকে সেলাইয়ের কাজে সাহায্য করতে পারে না পড়াশুনার কারণে। করুণার শক্তি কমে গেছে—এখন আর আগের মতো খাটতে পারে না। মাসে ১৫০ টাকা মাইনে দিয়ে একজন পার্টটাইম লোক রেখেছে সেলাইয়ের কাজে সাহায্য করার জন্য। কোনরকমে মা ও ছেলের সংসার চলে যাচ্ছে। করুণা একথা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে

"একদিন বড় বাসনা ছিল দর্জির ব্যবসা ভালভাবে দাঁড় করাব — ছেলে-মেয়েদের ভাল করে মানুষ করব—পরের কাজ না করে স্বাধীনভাবে নিজের দর্জির দোকান খুলব—আমার কোন আশাই পূর্ণ হল না দিদি, এখন এই ছেলেটাকে মানুষ করে তোলা ছাড়া আর কোন বাসনা নেই।"

ওষুধের এ্যাম্পুল

বেলেঘাটার গগন সরকার রোডে বস্তি অঞ্চলে ছোট ছোট এ্যাম্পুল তৈরীর কারখানার একটিতে কাজ করে উষারাণী মিত্র। বয়স ২৯ বছর। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। দেশ ছিল পূর্ববাংলায়। দেশ ভাগ হবার পর চলে আসে কলকাতায়। পড়াশুনা আর হয় নি। ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয় এক ছোট বইয়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে। ৮ বছরের মেয়ে স্কুলে পড়ে। ৬।৭ বছর হল স্বামীর ঘর করে না। স্বামী রোজই মদ খেয়ে উষাকে মারধোর করত। আর সহ্য করতে না পেরে একদিন মেয়ের হাত ধরে চলে আসে এই বস্তির একটি ঘরে। ২৫ টাকা ঘর ভাড়া দিতে হয়। প্রতিবেশির সাহায্যে এ্যাম্পুল কারখানায় কাজ পায়। মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে চলে আসে কারখানায়। বছরে ২/৩ মাস গ্যাস সাপ্লাইয়ের অভাবে কাজ থাকে না। কিন্তু রোজই হাজিরা দিতে হয়। মেয়ে ফেরে স্কুল থেকে বেলা সাড়ে ৪টায়। উষারাণী তখন বাড়ি ফেরার জন্য ছটফট করতে থাকে। স্বামীকে তো বিশ্বাস নেই—মেয়েটাকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যেতে পারে। স্বামী আর একটা বিয়ে করেছে—বৌটা নাকি বাজা। কোন ছেলেপুলে হয় নি। তাই স্বামীর খুব লোভ উষার মেয়ের উপর। ওকে নিয়ে যেতে পারলে বিনা পয়সার ঝি বানাতে পারবে। স্বামী যখন আর একটা বিয়ে করেছে তখন উষা আবার বিয়ে করছে না কেন জিজ্ঞাসা করলে বলে "সকলেই আমাকে বিয়ে করতে বলে—আমি রাজি নই। কি হবে বিয়ে করে? বিয়ে তো সেই আর একটা পুরুষ মানুষকেই করতে হবে। ওদের আমি বিশ্বাস করি না।" ওর স্বামী ডিভোর্স না করে আবার বিয়ে করেছে—সেটা যে বে-আইনী এবং উষা যে মেয়ের জন্য খোরপোষ দাবী করতে পারে—সেই ব্যাপারে আইনগত অধিকারের কথা জানে। কিন্তু উষা বলে "দরকার নেই অমন লোকের কাছ থেকে সাহায্য নেবার। সে একটা কেন দশটা বিয়ে করুক না—আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমি ভিক্ষে করে খাব—তবুও ঐ লোকের কাছে হাত পাততে যাব না।" মেয়ের ভবিষ্যৎ কি হবে জিজ্ঞাসা করলে বলে "মেয়েকে শেষ পর্যন্ত পড়াব। মেয়ে আমার খুব ভাল।

পড়াশুনায় খুব আগ্রহ আছে। ওর বিয়ে দেব না—চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে।”

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কারখানার ডিউটি। মোট ৪ জন মেয়ে এখানে কাজ করে ৪টা গ্যাস পাইপের সামনে বসে। কাঁচের লম্বা পাইপ থেকে সেপ করে নানা মাপের এ্যাম্পুল তৈরী করে ওরা। ৫ শিশি ও ১০ শিশি এ্যাম্পুল তৈরী করে মেয়েরা। দু'জন ছেলে-কর্মী আছে—তারা ২৫ শিশি এ্যাম্পুল বানায়। মেয়েরা ৫ শিশি হাজার এ্যাম্পুলে ৭ টাকা এবং ১০ শিশি হাজারে পায় ৯ টাকা। ছেলেরা ২৫ শিশি হাজারে পায় ১৬ টাকা। ঊষা দিনে ১৬ টাকা রোজগার করে। তাতে মা ও মেয়ের কোনরকমে চলে যায়।

১২ বছর বাদে আবার যখন ঐ অঞ্চলে যাই তখন শুনলাম ৬টা এ্যাম্পুল কারখানা অনিয়মিত গ্যাস সাপ্লাইয়ের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য একটা বস্তিতে গিয়ে দেখি একটা ঘরে এ্যাম্পুল তৈরী করছে তিনজন মেয়ে ও একজন বয়স্ক লোক। ৬/৭টি পাইপলাইন আছে—কিন্তু কাজ হচ্ছে তিনটিতে। মেয়েরা ৫ শিশি এ্যাম্পুল তৈরী করে বর্তমানে মজুরী পায় হাজারে ১২ টাকা ৫০ পয়সা। ১০ শিশি হাজারে পায় ১৫ টাকা। পুরুষ ও মেয়েদের ক্ষেত্রে একই মজুরী। এই কর্মীদের অভিযোগ অন্যান্য কারখানায় ৫ শিশিতে দেয় ১৫ টাকা আর ১০ শিশিতে পায় ১৮ টাকা। অন্য কারখানায় আর লোক নিচ্ছে না বলে ওরা কম মজুরীতে এখানে পড়ে আছে। কথায় কথায় জানতে পারি ১২ বছর আগে যে ঊষাকে অন্য একটি কারখানায় দেখেছিলাম সে এখন আর কাজ করতে পারে না। শরীর একদম ভেঙ্গে পড়েছে। ঊষার মেয়ে মাঝখানে পড়াশুনা বন্ধ করে বাধ্য হয়েছে কাজ নিতে। ঊষার মেয়ে এখন এশিয়া ল্যাম্পে কাজ করে মাসে ৩৬০ টাকা পায়। তার আয়েই মা ও মেয়ের পেট চলে। ঊষার মেয়ের বিয়ে হয় নি ঠিকই কিন্তু তার পড়াশুনা আর হয় নি। মায়ের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ায় মেয়েকে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে।

ছোট ও মাঝারি বাল্ব

বেলেঘাটার গগন সরকার রোড এবং চালপট্টিতে অনেকগুলি বাল্বের ছোট ছোট কারখানা আছে। স্থানীয় লোকেদের খবর অনুযায়ী প্রায় ৫০টি বাল্বের কারখানা ঐ অঞ্চলে আছে। আগের সমীক্ষায় দেখেছিলাম অল্প কয়েকটি মেয়ে বসে বাল্বের ফিলামেণ্ট ভরার কাজ করত। বর্তমানে দেখলাম

বাল্বের নানারকম কাজে যুক্ত রয়েছে মেয়েরা। পুরোনো বাল্ব সংগ্রহ করার পর সেগুলির কাঁচ ভাঙ্গার কাজ করানো হয় কারখানার বাইরে বস্তির অন্যান্য মেয়েদের দিয়ে—ফুরণে মজুরী দেওয়া হয়। এরা একাধিক কারখানার বাল্বের কাঁচ ভাঙ্গার কাজ করে ঘরে বসে। ফোড়েরা ওদের কাজের যোগান দেয়। বাল্ব ভাঙ্গার কাজ সবটাই করে মেয়েরা। এক হাজার বাল্ব ভাঙ্গলে মজুরী মেলে ৬ টাকা। একজন দিনে ৩ হাজার পর্যন্ত বাল্ব ভাঙ্গতে পারে। আর পালিশের কাজ করে ছেলেরা। এক হাজারে ২০ টাকা মজুরী। ২/৩ হাজারের বেশি একদিনে পালিশ করতে পারে না।

কারখানার ভিতরে গিয়ে দেখলাম অন্ধকার ঘরে ৪০ পাওয়ারের আলো লাগিয়ে ১৫ জন মেয়ে ও ১২ জন ছেলে কাজ করছে। মেয়েদের বয়স ১০ থেকে ১৮/২০। সারি সারি লাইন দিয়ে গ্যাসের পাইপলাইন। গ্যাসের আগুনের বরাবর মুখ নামিয়ে ফিলামেণ্ট লাগচ্ছে অল্পবয়সী মেয়েরা—আর তৈরী বাল্বকে পরিষ্কার করে টেস্টিং করছে ছেলেরা। মেয়েরাও টেস্টিং-এর কাজ করে। এখানেও ফুরণে মজুরী। তবে রোজকারটা রোজ দেওয়া হয় না। মাসিক হিসেব করে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণে থাকাকালীন ১০০ টাকা স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। ডিউটি ৯টা থেকে ৫টা। একজনের গড় উৎপাদন ৭০০ থেকে ৮০০। পুরোনো বাল্বকে ঘষেমেজে পরিষ্কার করে পালিশ করার কাজ করে ছেলেরা। প্যাকিং করার কাজও ছেলেরা করে। ২০০ টাকা থেকে মাসে ৪০০/৫০০ টাকা পর্যন্ত আয় হয়। সারা বছর কাজ থাকে না গ্যাস সাপ্লাইয়ের অভাবে। গ্যাস সাপ্লাই নিয়মিত করার জন্য মালিকপক্ষ শ্রম দপ্তরে অনেকবার আবেদন করেও কোন সাড়া পায় নি।

সবিতা দাসের বয়স ১৮ বছর। ৮ বছর সবিতা বাল্ব তৈরীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আগে অন্য কারখানায় একটু কম মজুরীতে কাজ করত—এই কারখানায় কাজ করছে গত দেড় বছর ধরে। সংসারে বাবা-মা ও পাঁচ ভাইবোন। সবিতা ক্লাশ ফোর পর্যন্ত পড়ে আর পড়াশুনা চালাতে পারে নি। বাবা কোলে বিস্কুটের কারখানায় কাজ করত—বর্তমানে বেকার। মা অনেককাল থেকেই অসুস্থ। বড়ভাই আর একটি ল্যাম্পের কারখানায় কাজ করে। সবিতা ছোটবেলা থেকে এই কাজ করতে করতে আজ একজন দক্ষ শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। খুব দ্রুত কাজ করতে পারে। ওর রোজগার ঐ কারখানার সব মেয়েদের থেকে বেশি। সবিতার খুব পড়াশুনার ইচ্ছা ছিল। সংসারের অভাব, অসুস্থ মার চিকিৎসা আর ছোট

ভাইবোনদের পড়াশুনার দায়িত্ব বহন করার জন্য নিজে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে কাজের লাইনে নেমে পড়েছে।

বস্তির আর একটি ঘরে গিয়ে দেখলাম কয়েকজন গিন্নিবান্নি ধরনের মহিলা বসে বসে টুনিবাল্বের গুচ্ছ তৈরী করছে। এই কাজ কারখানায় বসে করে না কেউ। ফোড়েরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ দিয়ে যায় আবার জিনিসগুলি নিয়ে যায়। এক গ্রোস (১৪৪) গুচ্ছ তৈরী করলে আগে মজুরী ছিল ১·৭৫ থেকে ২ টাকার মত। বর্তমানে ৩·৭৫ মজুরী দেওয়া হয়। বছরে ৩/৪ মাস বসে থাকতে হয়। কিন্তু যখনই এই কাজের জন্য লোকের দরকার পড়ে এইসব অভিজ্ঞ মেয়েদেরই সে কাজ দেওয়া হয়। নতুন যারা কাজ করতে আসে তাদের কয়েক মাস প্রশিক্ষণের নামে কিছু দেওয়া হয় না। সেই সময়টা মজুরী ফাঁকি দিয়ে ফোড়েরা অঙ্ক বাড়ায়। অথচ টুনিবাল্বের গুচ্ছ তৈরী করার জন্য দু-তিন দিনই যথেষ্ট। এটা এমন কিছু দক্ষতার কাজ নয়।

বাল্ব তৈরীর উপাদান আসে বিদেশ থেকে—বিশেষ করে জাপান হচ্ছে যোগানদার। এখানে কেবলমাত্র সোলডারিং হয়। কারখানা পরিচালকদের বক্তব্য—উপাদানগুলি যদি আমাদের দেশে তৈরী করা যায় তাহলে অনেক সস্তায় বাল্ব তৈরী করা যায়। বাইরে থেকে আনতে হয় বলে বেশি দাম পড়ে। বেলেঘাটার এই ছোট ছোট কারখানাগুলির মালিকরা "ক্যালকাটা ল্যাম্প ম্যানুফ্যাকচারিং এ্যাসোসিয়েশন, বেলেঘাটা" নামে একটি সংগঠন তৈরী করেছে। নিয়মিত গ্যাস সাপ্লাই এবং সস্তায় কাঁচামাল সরবরাহের দাবি জানিয়ে বারবার এ্যাসোসিয়েশন শ্রমমন্ত্রীকে আবেদন করেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকার পক্ষ থেকে কোন সাড়া-শব্দ নেই। মালিকদের ক্ষোভ—সরকারের এই গাফিলতি ও অবহেলার জন্য ছোট কারখানাগুলি মার খাচ্ছে।

মাছের হিমঘরে

অনেককাল যাবতই চিংড়ি মাছের আকাল। উৎকৃষ্ট গলদা বা বাগদা চিংড়ি বাজার থেকে উধাও। মাঝে মাঝে মাঝারি মাপের ঝড়্‌তি-পড়্‌তি চিংড়ি বাজারে উঁকি মারলে বিত্তবানেরা কড়কড়ে একশো টাকার নোট বার করে মুহূর্তের মধ্যে মাছের ঝুড়ি খালি করে দেন। উৎসব পার্বনে চিংড়ি মাছের দর হয় আকাশছোঁয়া।

চিংড়ি মাছের আকাল এবং এতো দাম হবার কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি মাছের পদমর্যাদা বেড়েছে। অন্যান্য অনেক জিনিসের মত চিংড়ি

মাছও বিদেশী মুদ্রা আমদানি করছে। বাছাই করা উৎকৃষ্ট চিংড়ি চালান যায় আমেরিকা, ইংলণ্ড, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলিতে।

কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল এই যে চিংড়ি মাছের আকাল তো নেই-ই বরং গত বেশ কয়েক বছর ধরে চিংড়ি মাছের চাষ আমাদের দেশে ব্যাপক-ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলির (হুগলী, সপ্তমুখী, মাতিয়া, বিদ্যাধরী ইত্যাদি) মোহনা চিংড়ি মাছ চাষের পক্ষে আদর্শ জায়গা। উড়িষ্যার পারাদ্বীপও চিংড়ি মাছ চাষ ও সংগ্রহের একটি অন্যতম ঘাঁটি। কাকদ্বীপে মৎস চাষের যে প্রকল্পটি আছে সেখানে আগে উৎপন্ন হত বছরে প্রতি হেক্টরে ৬০০ কিলোগ্রাম। বর্তমানে উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রতি হেক্টরে ২০০০ কিলোগ্রাম।

সরকার বা দেশ এই লাভের অংশ কতখানি পায় জানা নেই। তবে ব্যক্তিগত মালিকানায় মাছ রপ্তানির যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাদের লাভের অঙ্ক যে আকাশছোঁয়া সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই কলকাতা শহরেই যে ৭/৮টা মাছের হিমঘরের কথা জানা আছে তাদের প্রত্যেকটিই আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় বাজারে মাছ চালান দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার মুনাফা লুটছে।

দক্ষিণ কলকাতায় একটি সম্ভ্রান্ত অঞ্চলে একজন অবস্থাপন্ন এবং বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর নিজের বাড়ির একাংশে একটি মাছের হিমঘর প্রতিষ্ঠা করেন। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশাল উঠোন ও বাগানের মাথার উপরে এ্যাসবেসটাসের ছাউনি দিয়ে তৈরী হয়েছে মৎস সংরক্ষণ ও প্রসেসিং-এর জন্য সারি সারি ঘর। বাঁধান চত্বরে সরু লম্বা টানা টেবিলে সাজান বিভিন্ন মাপের ট্রে। মাছ সংগ্রহের জন্য ৩/৪টা লরী ও ট্রাক।

মাছের সাইজ ও গুণাগুণ বিচার করে বাছাই করার পর মাথাগুলি ছেঁটে ফেলে বিভিন্ন ট্রের মধ্যে গুণে রাখা হয়। ট্রেগুলিতে লেবেল লাগানোর পর হিমঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

উপরোক্ত কাজ করার জন্য প্রায় শ'খানেক শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে। কাজের ধরন অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মজুরী। বিভিন্ন জায়গা থেকে মাছ সংগ্রহ, মাছের গ্রেডিং, হিমঘরে রাখা, প্যাকিং করা এবং সবশেষে চালানের ব্যবস্থা করে ছেলেরা। এসব কাজ করার জন্য ২০/২৫ জন ছেলে কর্মী আছে তারা প্রত্যেকেই কেরালাবাসী। এদের স্থায়ী কর্মী হিসেবে ধরা হয়। মাসিক মাইনে ২৫০ টাকা ৫০০ টাকা পর্যন্ত। কোম্পানী রেজিস্ট্রীকৃত—সুতরাং স্থায়ী কর্মীরা সরকারি আইন অনুযায়ী

ছুটি-ছাটা এবং অন্যান্য সুবিধাগুলি পায়। আর একদল ছেলে শ্রমিক আছে তাদের কাজ হল মাছ সংরক্ষণের ঘর, ট্রেগুলি পরিস্কার করে জীবানুমুক্ত করা। এরা দৈনিক ৪ টাকা থেকে ৫ টাকা পায়। রবিবার এবং মাসে একদিন সবেতন ছুটি পায়। এদের সংখ্যা ২৫/৩০ জন। বাকি ৪০/৫০ জন মেয়ে-শ্রমিক কাজ করে ফ্লুরণে। এদের বয়েস ১৪ থেকে ৩০-এর মধ্যে। বেশির ভাগ মেয়েই অবিবাহিতা। অল্প কিছু বিবাহিতা, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা। এদের বেশির ভাগ আসে কলকাতার আশপাশের অঞ্চল থেকে।

মেয়ে শ্রমিকদের কাজ হচ্ছে গ্রেডিং-এর পর চিংড়ি মাছের মাথা কেটে পরিস্কার করে ধুয়ে মাপ অনুযায়ী বিভিন্ন ট্রেতে গুণতি করে সাজিয়ে রাখা। মেয়েদের কাজ দেখাশোনা করার জন্য মাসিক ২০০ টাকা বেতন দিয়ে একটি মেয়েকে রাখা হয়েছে। ফ্লুরণে মেয়েরা মজুরী পায় দৈনিক ২ টাকা থেকে ২.৫০ টাকা। ডিউটি সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ৮টা। বাঁধানো চত্বরে সারাক্ষণ মাছের জল পড়ে মেঝেটা পিছল হয়ে থাকে! সেখানে টানা টেবিলের সামনে লাইন করে দাঁড়িয়ে মেয়েদের কাজ করতে হয়। হাতে রবারের দস্তানা। পায়ে সকলেরই হাজা। রাত ৮টা থেকে ১০টা ওভারটাইম। সে সময়ে মজুরী ছাড়া ৫০ পয়সার টিফিন পাওয়া যায়। এদের কাজের কোন স্থায়ীত্ব নেই। বছরে দু'মাস—মার্চ-এপ্রিল মাছ সংগ্রহ কম হয় বলে ফ্লুরণের শ্রমিকদের বসিয়ে দেওয়া হয়। তখন তারা মজুরী পায় না। ওদের কোন ছুটি-ছাটাও নেই। প্রয়োজন হলে বিনা মজুরীতে ছুটি মেলে। এদের অনেকে ৫/৬ বছরেরও বেশি হল কাজ করছে। বছরে মজুরী বাড়ে ২৫ পয়সা থেকে ৫০ পয়সা।

প্রতিষ্ঠানটি রেজিস্ট্রীকৃত হওয়ায় সরকারের শ্রম আইনগুলি এখানেও প্রযোজ্য। কিন্তু শোনা যায় সরকারী আইন ফাঁকি দেবার জন্য একনম্বরি ও দু'নম্বরি খাতা আছে। একনম্বরি খাতায় শ্রমিকদের যে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য থাকে—দু'নম্বরি খাতায় তার চিহ্নও থাকে না। শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকার একটা বড় অংশ মালিক এভাবে আত্মসাৎ করেন। শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই মালিকের এই পদ্ধতি জানে না। মেয়ে শ্রমিকরা বেশির ভাগই নিরক্ষর। তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় কি উপায়ে তারা দিনের পর দিন বঞ্চিত হচ্ছে।

যুক্তফ্রণ্টের শাসনকালে এই সমস্ত অস্থায়ী কর্মীরা বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন করলে মালিক পুলিশের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেন। যুক্তফ্রণ্ট পতনের পরে মালিক পুনরায় প্রতিষ্ঠানটি চালু করে নতুন নতুন শ্রমিক

নিয়োগ করতে থাকেন। হেরেযাওয়া পুরোনো শ্রমিকেরা মালিকের হাতেপায়ে ধরে পুনরায় কাজে বহাল হয়। তাদের দারিদ্র্য, অসহায়তার সুযোগ নিয়ে মালিক তাদের দিয়ে আরও কম মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য করেন। এমনকি কাজ করাকালীন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসা তো দূরের কথা মজুরীটুকুও দেওয়া হয় না। একটাই বাঁচোয়া যে কাজটা চলে যায় না। কেউ সুস্থ হয়ে ফিরে আসলে কাজটা আবার পায়। শ্রমিকরা তাতেই কৃতজ্ঞ থাকে।

বিবাহিতা মেয়েদের সন্তানসম্ভবা হবার উপায় নেই—তাহলেই কাজ চলে যাবে। মাছের জলে পিছল চত্বরে কাজ করতে গিয়ে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে মালিক বিপদে পড়তে পারেন ভেবেই এই বিধিনিষেধ। একবার এরকম দুর্ঘটনা ঘটার পর থেকে এই নিয়ম চালু হয়েছে।

সুনীতির দিদি সুমতি এই প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে কাজ করত। এখানে কাজ করতে করতে বিয়ে হয়। একটানা ৫ বছর করার পর সুমতি অন্তঃস্বত্বা হয়। সবেতন প্রসূতি ছুটি চাইলে নাকচ করে দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে ভারি মাস পর্যন্ত কাজ করে। মালিকের বক্তব্য—"কাজ করার দরকার নেই—বাড়ি চলে যাক। যখন পারবে কাজ করবে।" সুমতি কি করে বাড়িতে থাকবে ? পেটের ভাত যোগাবে কে ? সুমতির স্বামী ওদের বস্তি বাড়িতেই থাকে। একটা ছোট কারখানায় দৈনিক ৩ টাকা মজুরীতে কাজ করে। বৃদ্ধ বাবা-মা আর ছোট ছোট চারটি ভাইবোন। ছোট বোন সুনীতির বয়স তখন সবে ১১ বছর। সমস্ত সংসারটাই সুমতি ও তার স্বামীর আয়ের উপরে নির্ভরশীল। সুমতি অতিরিক্ত খেটে মাসে ৭০/৮০ টাকা রোজগার করে। পেটে ৮ মাসের বাচ্চা। শরীরে পুষ্টি নেই, রক্ত নেই। একদিন মাছের ট্রে নিয়ে পা হড়কে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। ৬ মাস হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়। বাচ্চাটি পেটেই মারা যায়। কোমরের হাড় ভেঙ্গে দু' টুকরো হয়ে যায়। সুমতি আর কাজে যেতে পারে নি। ওখানে তো দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। মালিক কোনরকম ক্ষতিপূরণ দেন না। তবে দয়া করে সুমতির ছোট বোন ১১ বছরের সুনীতিকে কাজটা দেন। ১১ বছরের সুনীতি একজন শ্রমিকের মর্যাদা পায়।

তারপরে অস্থায়ী কর্মীরা মিলে ইউনিয়ন গড়ে তুলে কাজের নিরাপত্তা, মজুরী বৃদ্ধি, ছুটি, বোনাস ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দাবী জানিয়ে দীর্ঘকাল ধর্মঘট করলে মালিক শ্রমিকদের আংশিক দাবি মেনে

নেন। কিন্তু ফুরণের কাজের মেয়েদের কোন পরিবর্তন হয় না সামান্য কিছু পয়সা বৃদ্ধি ছাড়া।

গত কয়েক বছর হল প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। বহুদিন শ্রমিকরা ইউনিয়নের ব্যানারে অনশন, অবস্থান ধর্মঘট ও আন্দোলন করেও কোন ফল হয় না। বামফ্রন্টের আমলেই এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কি কারণে আন্দোলন ব্যর্থ হল এবং প্রতিষ্ঠানটি আর চালু হল না জানা যায় নি।

বিড়ি শ্রমিক

বিড়ি একটি পুরোনো ও বৃহৎ কুটির শিল্প। ভারতের সকল রাজ্যেই বিড়ি শিল্প আছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে। বিড়ি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনও অনেক পুরোনো।

বিড়ি শিল্পে বিপুলসংখ্যক মেয়ে ও শিশু শ্রমিক নিযুক্ত আছে। গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা কেন্দু পাতা সংগ্রহ করে ব্যবসায়ীদের কাছে অত্যন্ত কম দামে বিক্রী করে। কেন্দু পাতা মাপ মত কাটা, শুকোতে দেওয়া, তেল মাখানো এবং বস্তায় ভরে কারখানার পাঠাবার জন্য ট্রাক বোঝাই করার কাজও অনেক রাজ্যে মেয়েরা করে। তবে অধিকাংশ মেয়ে ও শিশুরা যুক্ত আছে বিড়ি বাঁধার কাজে। এদের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়ে বিড়ি তৈরী করে ঘরে বসে। পরিবারের সকলেই বিড়ি বাঁধার কাজে সাহায্য করে। এদের মজুরী ফুরণে। বিড়ি বাঁধার কাজে বেশ দক্ষতা লাগে। ৬/৭ মাস তার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে হয়।

এই কলকাতা শহরেই কয়েক লক্ষ বিড়ি শ্রমিক আছে। উৎপাদনের উপাদান বলতে একটা কাঁচি, কিছু কেন্দু পাতা, তামাক পাতা আর খানিকটা সুতো। এর জন্য বড় জায়গায় দরকার হয় না। যে কোন জায়গায় বসে বিড়ি তৈরী করা যায়। কিন্তু বিড়ি শিল্পের মালিকরা মুনাফা করে কোটি কোটি টাকা। বিড়ির আন্তর্জাতিক বাজারও আছে।

রাজাবাজারের একটা বস্তিতে প্রায় প্রতিটি পরিবারের মেয়ে ও শিশুরা বিড়ি বাঁধার কাজ করে। ছোটবেলা থেকেই এ কাজ করে আসছে ওরা। ওদের বাপ-ঠাকুর্দারাও বিড়ি শিল্পে যুক্ত ছিল। মেয়েরা যেহেতু মুস্লিম বলে বাড়ির বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারে না—এদের উপরে শোষণের চাপটা অনেক বেশি।

আয়েষার সঙ্গে কথা বলে জানলাম সে ছেলেবেলা থেকেই বিড়ি বাঁধে।

অনেক ফোড়েরা আয়েষাকে দিয়ে বিড়ি বানায়। কিন্তু আয়েষা একজন দক্ষ বিড়ি শ্রমিক হলে কি হবে—মজুরী মোটেও বেশি পায় না। কণ্ট্রাক্টর ও ফোড়েদের বক্তব্য হচ্ছে একজনকে বেশি মজুরী দিলে অন্যরাও দাবি করবে। তাই দক্ষ শ্রমিক হয়েও আয়েষা ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত হয়। রাতদিন মাথাগুঁজে বিড়ি বানায় আয়েষা। স্বামীও একজন বিড়ি শ্রমিক। দীর্ঘদিন অসুস্থ—সম্ভবত বুকের অসুখ হয়েছে। হাসপাতালে পাঠাবার সঙ্গতি নেই। একটি ছোটঘরে স্বামী-স্ত্রী ও তিনটি বাচ্চা কোনরকমে মাথা গুঁজে থাকে। আয়েষারও মাঝে মাঝে ঘুষঘুষে জ্বর হয়—কাশি তো লেগেই আছে।

১০/১২ বছর আগে পর্যন্ত এক হাজার বিড়ি বাঁধলে মজুরী মিলত ২ টাকা। আর বাচ্চারা পেত হাজারে ৭৫ পয়সা। এখন মজুরী বেড়ে হয়েছে মেয়েদের ৭ টাকা থেকে ৮ টাকা আর শিশুদের ৪ টাকা থেকে ৫ টাকা। শিশু বলে সে মজুরীটুকুও সর্বদা পায় না। সরকার দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরী এরা পায় না।

বিড়ি ও তামাক শিল্পে যুক্ত মেয়ে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার্থে দুটি সরকারি আইন আছে। এই আইনে বলা আছে নিয়োগকর্তাকে মেয়ে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী, শিশু রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, চিকিৎসা ও প্রসূতির যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। এমনকি ঘরে বসে যেসব মেয়েরা বিড়ি বাঁধার কাজ করে তাদের পক্ষেও এই আইন প্রযোজ্য।

কিন্তু বিভিন্ন রিপোর্ট ও তথ্য থেকে জানা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উৎপাদকরা বিড়ি উৎপাদন করছে চুক্তির মাধ্যমে। মালিকরা প্রত্যক্ষভাবে কাজ দেয় না। কণ্ট্রাক্টর বা দালালের মাধ্যমে কাজ করায়। সরকারের নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরী অগ্রাহ্য করে কন্ট্রাক্টরেরা তাদের নিজস্ব বিধান অনুযায়ী অত্যন্ত নিম্নমানের মজুরীর বিনিময়ে কাজ করায়। কম পরিমাণ কাঁচামাল দিয়ে বেশি পরিমাণ বিড়ি তৈরী করতে বলে। ফলে ঘাটতি বিড়ির জন্য কণ্ট্রাক্টরেরা মেয়েদের দৈনিক মজুরী থেকে তাদের সুবিধামত পয়সা কেটে নেয়। আবার তৈরী বিড়িতে খুঁত আছে বলে শতকরা ২ থেকে ২০ ভাগ বিড়ির মজুরী দেয় না। এভাবেই কণ্ট্রাক্টরেরা তাদের নিজস্ব মুনাফা বৃদ্ধি করে। সামগ্রিকভাবে সমস্ত মেয়ে ও শিশু বিড়ি শ্রমিকদের চেহারা সব জায়গায় একইরকম।

গৃহস্থবাড়ির কাজে (ঝি ও রাঁধুনী)

অসংগঠিত নারী শ্রমিকের একটা বড় অংশ হল বাড়ির কাজে যুক্ত মেয়েরা।

এরা শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি। ১০/১২ বছর আগে ঠিকে ঝিদের গড় মজুরী ছিল মাসে ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকা। বর্তমানে ঠিকে ঝিদের মাইনে ৪০ টাকা থেকে ৯০ টাকা। ঝি ও রাঁধুনির কাজ একসঙ্গে করতে হলে খাওয়াপরাসহ ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা গড় আয়।

সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলিতে বেশির ভাগই ঠিকে ঝি নিয়োগ করে। যতটা সম্ভব কম মজুরী দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে শক্ত কাজগুলি করিয়ে নেওয়া যায়, খেতে-পরতে দিতে হয় না—এটাই নিয়োগ-কারীর পক্ষে সুবিধাজনক। ঠিকে ঝিরাও কোন একটি বাড়িতে আটকে থাকতে চায় না—অনেক সময় দেখা যায় খাওয়াপরার বিনিময়েও রাজী হয় না। কারণ এমনিতে ৫/৬টা বাড়ির কাজ নিলে মাসে অনেকগুলি নগদ টাকা হাতে পায়। আর ৫/৬টা বাড়ি থেকেই যা জলখাবার পায় তাতে তার নিজের পরিবারের ছোট ছোট ভাইবোনদের খাবার জুটে যায়। পূজোর সময়ে ঐ ৫/৬টা বাড়ি থেকেই যে জামাকাপড় পাওয়া যায় তাতেও পরিবারের খানিকটা সুরাহা হয়। নিয়োগকারীর বাড়িতে বাড়তি লোকজন আসলে যেমন কাজের লোকেদের খাটুনি বাড়ে আবার তার জন্য বাড়তি বকশিশও পাওয়া যায়। সকালে কয়েক ঘণ্টা আর বিকেলে কয়েক ঘণ্টা কাজ করে এরা। দুপুরটা বিশ্রাম পায়—আর প্রয়োজন হলে বাড়তি রোজগারও করতে পারে টুকটাক কাজ করে। কাজেই ঠিকে ঝিরা কোন একটি জায়গায় বন্দী থেকে কাজ করতে চায় না। আর একটি সুবিধা ঠিকে ঝিদের আছে। তা হল এমনিতে তো কোন ছুটি পাওয়া যায় না—বারো মাসই কাজ করতে হয়। শরীর খারাপ হলে বা কোন সময়ে কাজে যেতে ইচ্ছে না হলে ডুব দেওয়া যায়। বাড়িতে থেকে কাজ করলে সে সুযোগটুকু পাওয়া যায় না।

বাড়ির কাজে যুক্ত মেয়েরা তাদের ছোট ছোট মেয়েদের ৭/৮ বছর বয়স হলেই সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি কাজে যায়—বাচ্চারা মায়ের কাজে হাত লাগায়। এভাবে শিশুদের মায়েরা শ্রমের বাজারে প্রবেশের প্রশিক্ষণ দেয়। গত কয়েক বছর ধরে ছোট ছোট মেয়েদের ঘরের কাজে নিয়োগ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মেয়েদের বয়েস ৯ বছর থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। সব সময়ের কাজের লোক হিসেবে গৃহস্থরা শিশুদেরই বেশি পছন্দ করে। তাদের কম মজুরী দেওয়া যায়, বেশি খাটানো যায়, প্রয়োজনে দুটো ধমকও দেওয়া যায়। একজন প্রাপ্তবয়স্কের চেয়ে এদের খোরাকিও কম। সুতরাং এই অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়েরা সর্বক্ষণের কাজের লোক হিসেবে—এমনকি ইদানীং ঠিকে ঝি হিসেবেও বাজার ছেয়ে ফেলেছে।

গৃহকাজে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের নিজ নিজ কর্মস্থলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য, তাদের ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য কোন ইউনিয়ন বা সংগঠন পশ্চিমবাংলায় গড়ে ওঠে নি। দিল্লী, বোম্বাই শহরে পুরোপুরি ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলেও গৃহকাজে যুক্ত লোকেদের কতকগুলি গ্রুপ বা সংস্থা আছে বলে শুনেছি। তারা সেই সংস্থার মাধ্যমে কাজের সময় ও পরিমাণ, ছুটিছাটা এবং ন্যূনতম মজুরী নিয়ে দর কষাকষি (bargain) করতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সরকার বা ট্রেড ইউনিয়নগুলি থেকে গৃহকাজে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষদের জন্য এখনও পর্যন্ত কোন নীতি-নির্ধারণ করা হয় নি।

গৃহকাজে যুক্ত মেয়ে ও শিশুরা প্রায় সকলেই নিরক্ষর। শ্রমের বাজারে নিজেদের কাজের মূল্যায়ন, সরকারের ন্যূনতম মজুরী ও আইন-কানুনের খবর রাখে না এরা। কাজের মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ এরা। এদের কাজের কোন মর্যাদা নেই—চিরকালই অত্যন্ত নিকৃষ্ট জীব হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এদের মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয় না। সম্প্রতি নিয়োগকারীদের মধ্যে অনেকেই তাদের ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এখন লক্ষ্য করা গেছে কাজের লোকেদের সঙ্গে অনেকেই সহৃদয় ব্যবহার করে, ভালমন্দ খেতে দেয়, প্রয়োজনে ছুটিছাটা দেয়, সিনেমা দেখা বা টি-ভি দেখার অনুমতি দেয়। কিছু মিষ্টি কথা ও ব্যবহারের আড়ালে বেশি করে খাটিয়ে নেবার প্রবণতা এখনও অনেকের মধ্যে রয়ে গেছে।

শুক্লা দাসের বয়স ১৪ বছর। একটি বাড়ির কাজে যুক্ত আছে দু'বছর যাবত। শুক্লার বাড়িতে বাবা আর ছোট দুটি বোন আছে। কয়েক বছর আগে মা যক্ষা রোগে মারা গেছে। বাবা একজন কারখানার ছাঁটাই কর্মী। শুক্লা একটি বাড়িতে ৫০ টাকা মাইনেতে দু'বছর ধরে কাজ করছে, দু'বেলা খাওয়া পায়। বাড়ির সব কাজই শুক্লা একা করে। ভোর ৫টায় ঘুম থেকে উঠে নিজের ঘরের কাজ সেরে ৬টা নাগাদ কাজের বাড়িতে যায়। সেখানে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতে হয়। নিয়োগকারী স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরী করে। ১০টার মধ্যে সমস্ত কাজ সেরে মালিকদের খাইয়ে কোনরকমে মুখে দুটি ভাত গুঁজে স্কুলে যায়। শুক্লা চিত্তরঞ্জন বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। যে ৫০ টাকা পায় তার পুরোটা ধরে বাবার হাতে তুলে দেয়। স্কুলে পড়ার কোন খরচ লাগে না। অত্যন্ত রুগ্ন চেহারা। সে কেন মালিককে মাইনে বাড়ানোর কথা বলে না জানতে চাইলে বলে—"ওরা লোক খুব ভাল। আমাকে খুব ভালবাসে, আমাকে ওদের সামনে চেয়ারে বসে টি-ভি দেখতে দেয়, যেখানে যখন বেড়াতে যায়

আমার জন্য জিনিস নিয়ে আসে, ভালমন্দ খেতে দেয়" ইত্যাদি প্রশংসা। ওর নাকি মাইনে বাড়ানোর কথা বলতে লজ্জা করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে শোষণটাও বেশ ভালভাবেই করা যায়।

কাজের মেয়েদের মধ্যে গৃহকাজে নিযুক্ত মেয়েদের মধ্যেও শোষক-শোষিতের সম্পর্ক আছে। যেসব মায়েরা তাদের ছোট ছোট সন্তানদের শ্রমের বাজারে ঠেলে দেয় তারা সেই সন্তানদের মজুরীটুকু পুরোপুরি আত্মসাৎ করে। কোন মেয়েকে পড়াশুনার সুযোগ দিলে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে অন্য আর একটি কাজে ঢুকিয়ে দেয়। দারিদ্র্য এর মূল কারণ সন্দেহ নেই—কিন্তু এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই মায়েরাও তাদের শিশু সন্তানদের উপরে শোষণ চালায়।

গৃহকাজে যুক্ত এইসব কিশোরীদের প্রতি নিয়োগকারীরাও তাদের কর্তব্য পালন করেন না। অথচ শহরের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির প্রতিদিন জীবনযাপনের মূল কাঠামোকে ধরে রেখেছে অসংখ্য কিশোরীরা। সারাদিন যে শিশুটি তার বাড়িতে কাজ করে, তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কুলে পৌঁছে দেয়, তাদের যত্ন-আত্তি করে—সেই শিশুটি যে নিরক্ষর থেকে যায় সে ব্যাপারে কারুর কোন মাথাব্যাথা নেই। তাকে দিয়ে ষোল আনা কাজ করিয়ে দিতে বিবেকদংশন হয় না। এদের জন্য একটু স্বাক্ষরতার প্রশ্ন কখনই মাথায় আসে না। প্রত্যেকটি পরিবার যদি কর্মরত শিশুদের সামান্য স্বাক্ষরতার দায়িত্ব নেন তাহলে একটা বিরাটসংখ্যক শিশুর (এক্ষেত্রে মেয়ে শিশুই বেশি) নিরক্ষরতা দূর হতে পারে।

গৃহকাজের বাজার অবশ্য মন্দা নয়। সেই অর্থে এই কাজের নিরাপত্তা আছে। কারণ গৃহকাজের জন্য লোকের চাহিদা আছে। বরং রকমারি পেশা ও কাজের সৃষ্টি হওয়ায় বাড়ির কাজের জন্য লোকের অভাব আছে। কাজের লোকেদের কোন নিজস্ব সংগঠন না থাকলেও বাজারে চাহিদা থাকায় ব্যক্তিগত স্তরে মজুরী নিয়ে দরকষাকষিও এরা করতে পারে এবং করে থাকে।

চা পাতা প্যাকিং

চা পাতা রপ্তানীর কারবার করে এমন প্রাইভেট সংস্থা ছড়িয়ে আছে সারা কলকাতায়—বাঙালী এবং মাড়োয়ারী—দুই-ই এই ব্যবসা করে। তবে বেশির ভাগই মাড়োয়ারী মালিকানা। চা পাতা ফাইনাল প্যাকিং করে চালান দেবার আগে কাজের অনেকগুলি স্তর আছে। চা পাতার গড়ন অনুযায়ী—অর্থাৎ বড় পাতা, মাঝারি পাতা ও গুঁড়ো পাতা—এই তিন রকম মাপের চা

বাছাই করা হয় বড়, মাঝারি ও ছোট মাপের চাল্‌নির সাহায্যে। এই কাজটা করে অন্য কোম্পানী—তারা চা রপ্তানী করে না। তাদের কাজ হচ্ছে চাহিদা অনুযায়ী রপ্তানীকারী কোম্পানীগুলিকে সেই চা সরবরাহ করা। এই কাজ অর্থাৎ চাল্‌নি দিয়ে চেলে বিভিন্ন মাপের চা পাতা বাছাই করে রাখার কাজ করানো হয় দক্ষিণ ভারতীয় আদিবাসী খুট্‌কো মেয়ে মজুরদের দিয়ে। এদের আনা-নেওয়া করার জন্য একজন করে পুরুষ সর্দারগোছের থাকে তাদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে এই মজুরদের নিয়োগ করা হয়। এই কাজের একটা বড় জায়গা হচ্ছে চৌরঙ্গী অঞ্চল। অত্যন্ত কম মজুরির বিনিময়ে এই কাজ করানো হয়।

বাছাই করা চা পাতাগুলি স্থানীয় রপ্তানীকারী কোম্পানীগুলিতে সরবরাহের পর কোম্পানীর মালিকরা চায়ের গুণাগুণ ও মাপ অনুযায়ী প্যাকিং করে বিদেশে চালান দেয়। এই প্যাকিং-এর কাজ করানো হয় বহিরাগত মজুরদের দিয়ে। বাইরের মজুরদের আনা হয় দালাল ও মজুরদের সর্দারের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে। দেখা যাচ্ছে চুক্তিরও চারটি স্তর আছে—কোম্পানী, দালাল, সর্দার ও মজুর। এই চার রকমের চুক্তির ভিত্তিতে শ্রমিকদের মজুরী ভাগ-বাটোয়ারা হয়।

সম্প্রতি বেহালা অঞ্চলে চা রপ্তানীকারী একটি মাড়োয়ারী কোম্পানীর কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তাদের কাছ থেকে জানা যায় চা পাতা প্যাকিং করে চালান দেবার আগে কাজের কয়েকটি ধাপ আছে—সেই কাজ করার জন্য বাইরের থেকে মজুরদের আনা হয়। চা ওজন করা, প্যাকিং-এর ছোট বড় প্যাকেট তৈরী, সেলোফেনে মোড়ানো, লেবেল লাগানো এবং প্যাকিং বাক্সে ভর্তি করা—এই সকল কাজই করে বাইরের মজুরেরা। কোন একজন মজুর একটি চায়ের প্যাকেটের কাজ সম্পূর্ণ করে না—প্রত্যেকেই আংশিক কাজ করে—যাকে ইংরেজীতে বলা হয় assembly line work.

বেহালার ঐ কোম্পানীর মালিক উপরোক্ত চুক্তির ভিত্তিতে প্রথমে কিছু পুরুষ শ্রমিক নিয়োগ করেন। মজুরীর শর্ত ১০০০ চায়ের প্যাকেটে ২০ টাকা মজুরী। আগেই বলা হয়েছে কাগজ দিয়ে প্যাকেট তৈরী থেকে শুরু করে শেষে লেবেল লাগানো—সব কাজই এর মধ্যে ধরা আছে। একদিন কাজ করার পর পুরুষ মজুরেরা বেঁকে বসে দিনে ৪০ টাকা মজুরী না দিলে তারা কাজ করবে না। কারণ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—এই সব কাজটা করতেই দিন চলে যায়। এক হাজারের বেশি মজুরী হয় না। আর মজুরীটাও

আবার ভাগ হয় দালাল, সর্দার ও মজুরদের মধ্যে। ফলে পুরুষ শ্রমিকরা কাজ করবে না বলে চলে যায়। তখন বাইরের মেয়ে মজুরদের আনা হয় হাজার প্যাকেটে ৩০ টাকা মজুরীর শর্তে। মেয়েরা সহজেই রাজি হয়ে যায়। প্যাকেটের মাপ অনুযায়ী দু'রকমের মজুরী আছে। ছোট প্যাকেটে বেশি মজুরী এবং বড় প্যাকেটে কম মজুরী। কিন্তু মেয়ে মজুরদের মজুরী দেওয়া হয় দুরকম প্যাকেটের মজুরীর গড় হিসেবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে সাধারণভাবে মেয়েদের নিয়োগ করা হয় পুরুষদের তুলনায় কম মজুরীর বিনিময়ে। তারপর কাজের বৈচিত্র্য অনুযায়ী যে মজুরী পাওনা হয় সেই প্রকৃত মজুরী না দিয়ে গড় হিসেবে মজুরী দেওয়া হয়। আবার মজুরদের সঙ্গে সর্দারের চুক্তি অনুযায়ী আর এক দফা মজুরীর অংশ যায় সর্দারের ভাগে। এভাবে মজুরদের তথাকথিত ন্যায্য পাওনা থেকেও দু-তিন ধাপে ভাগ বসায় মালিক, দালাল ও সর্দাররা। আর এই বঞ্চনার শিকার হয় অনায়াসে মেয়েরা।

শহরাঞ্চলে অসংগঠিত বিভাগে কর্মরত মেয়েদের অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল। এটা যেমন একটা ছবি তার সাথে সাথে আর একটি ঘটনাও ঘটছে তা হল মেয়েদের মধ্যে স্ব-নির্ভর হয়ে ওঠার ঝোঁক।

গত দশ বছরে সাধারণভাবে প্রায় সকল স্তরের মেয়েদের মধ্যেই অর্থনৈতিকভাবে স্ব-নির্ভর হবার ঝোঁক বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রম সম্বন্ধে মর্যাদাবোধের সৃষ্টি হয়েছে। যে সকল জীবিকায় যুক্ত হবার কথা কল্পনাও করা যেত না সে সকল কাজ বা পেশায় মেয়েরা ক্রমশ বেশি বেশি করে যুক্ত হচ্ছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ফেরি করা, চায়ের ও তেলেভাজার দোকান দেওয়া থেকে শুরু করে নানারকম পেশায় ও কাজে মেয়েরা নেমে পড়ছে। একেবারে গরীব মেয়েদের তো কোন কাজেই ভয় নেই—তাদের সারা শরীরে ও পোশাকে-আসাকে দারিদ্র্য ও অপুষ্টির চিহ্ন থাকলেও চোখেমুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ লক্ষ্যণীয়। দারিদ্র্যকে মোকাবিলা করছে সাহসের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। "না খেয়ে মরবো না—ভিক্ষে করেও বাঁচবো না—" এই যেন তাদের চোখের দৃষ্টির লিখন। প্রতিদিন রাস্তাঘাটে, লোকাল ট্রেনগুলিতে চলাফেরা করতে গিয়ে এই দৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। লড়াই করে জীবনটাকে, সংসারকে বাঁচাবার জন্য এরা মরিয়া হলেও কেন এতে দারিদ্র্য আজও এত গভীরে রয়ে গেছে, কেন সমাজে সম্পদের এত অসম বণ্টন সে সম্বন্ধে এই অগণিত খেটেখাওয়া

মানুষের—বিশেষ করে মেয়েদের কোন চেতনার সৃষ্টি হয় নি। সেজন্যই তারা নিজেদের সংগঠিত করতে পারে নি এবং এত দুর্দশা।

আমাদের দেশে এবং তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশেই যে ধনতন্ত্রের প্রচার ও বিকাশ ঘটছে তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল একদিকে মূলধন নিবিড় (capital intensive) অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত শিল্পের বিকাশ আর অন্যদিকে সস্তা, শ্রমনির্ভর কম পুঁজি ও কম যন্ত্রপাতির অসংগঠিত কারখানার প্রসার। আর অনেক সময়েই সংগঠিত শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের শোষণ করে।

অন্যদিকে সংগঠিত শিল্প বা সংস্থাগুলিতে যেমন নিজ নিজ কার্যস্থলে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আছে—অসংগঠিত শিল্পে বা বিভাগে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ নিয়ে লড়াই করার কোন সংগঠন নেই। তারা দিনের পর দিন শোষিত হয়েও নিজেদের সংগঠিত করতে পারছে না। এদিক থেকে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক দলগুলিও চরম উদাসীন। অসংগঠিত শিল্প সংস্থা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে ঘটনা আজ আর কারুর কাছেই অজানা নয়। অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন কোন গড়ে উঠছে না, সমস্যা বা জটিলতা কোথায় সে সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কোন সমীক্ষা করা হয় নি। এ সম্বন্ধে অবিলম্বে বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অত্যন্ত জরুরী কাজ।
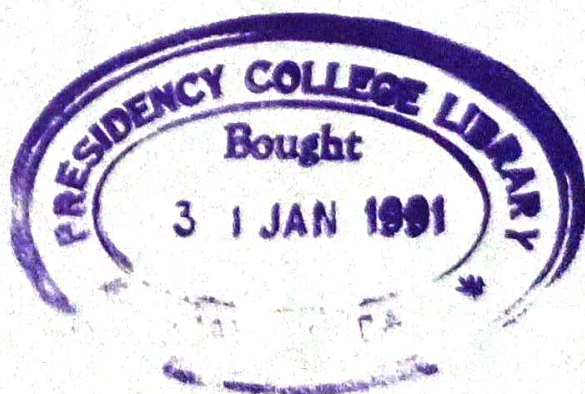
১৯৮৮র ৩রা এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের উদ্যোগে 'ভারত ইতিহাসে নারী' শীর্ষক আলোচনাচক্রে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভারতে, জাতীয় আন্দোলনে ও শ্রমিক আন্দোলনে, সাহিত্যে এবং অবহেলিত কর্মজীবনে মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, মূল্যবান আলোচনা করেন সুকুমারী ভট্টাচার্য, রীণা ভাদুড়ী, ভারতী রায়, মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, মালিনী ভট্টাচার্য, যশোধরা বাগচী ও বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রবন্ধসমষ্টি এখন বই আকারে প্রকাশিত হল।

ISBN 81-7074-053-3

কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী

২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২

মূল্য: ৪০ টাকা